নজরুল গল্প-সমগ্র

কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল গল্প-সমগ্র

কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল গল্প-সমগ্র

কাজী নজরুল ইসলাম

সাহিত্যম । ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১লা অগ্রহায়ণ : ১৩৭১

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্‌
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৭

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কুড়ি বছরের সাহিত্যিক জীবনে মাত্র তিনখানি গল্প-গ্রন্থে (ব্যথার দান-১৯২২, রিক্তের বেদন-১৯২৫, শিউলি মালা-১৯৩১) আঠারোটি ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। পৃথক পৃথক গ্রন্থে গল্পগুলি গ্রথিত হলেও তাঁর প্রতিটি গল্পের সুর যেন এক। সব গল্পের মূলেই রয়েছে অকথিত এক ব্যথার কাহিনী, প্রত্যেকটি গল্পই যেন আন্তরিক বেদনার রঙে রঙিন। তাই, তাঁর সেই একসুরের আঠারোটি গল্পকে একত্রে গেঁথে রাখার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো এই নজরুল গল্প-সমগ্র।

—সম্পাদক

গল্প-ক্রম

ব্যথার দান

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি! আঃ, মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা;···সেই ঘুমপাড়ানোর সরল ছড়া,—

'ঘুম-পাড়ানো মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো!'

আরও মনে পড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আব্দার।···সে মা আজ কোথায়?

দু'এক দিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশ্‌ত্‌ থেকে আব্দারে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই—মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে,—মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মার চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মাকে আমি ছোট করছি নে। ধরতে গেলে মা-ই বড়। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজে অকাজে এমন করে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চলেছি সেই পথ ধরে। লোকে ভাবছে, কী খামখেয়ালী পাগল আমি! কী কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি! কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আজ সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা করছে? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যে দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দু-ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মতো আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে-দিন হয়তো আমি থাকব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

আচ্ছা মা! তুমি তো মরে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে? আমি চিরদিনই বলেছি না—না—না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পারব না, কিন্তু তা তুমি শুনলে কই? সে-কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জান আর কি!.... এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্যে দায়ী কে? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা! কোথাও পালিয়েও টিকতে পারছি নে।...

আমি আজ বুঝতে পারছি মা যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্পশিকলটা নিজের হাতে আমায় পরিয়ে গিয়েছে! ঐ মালাই তো হয়েছে আমার জ্বালা! লোহার শিকল ছিন্ন করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দলে যাবার মতো নির্মম শক্তি তো নেই আমার। যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে, কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত করবে কে? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছি নে!

হতভাগিনী বেদৌরা! সে-কথা কি মনে পড়ে—সেই মায়ের শেষ দিন?—সেই নিদারুণ দিনটা? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা করছে—বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে,—জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হয়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে পড়ছে,—মার পূত-সে-শেষের-অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল! তোমার অযতনে থোওয়া কালো কোঁকড়ান কেশের রাশ আমাকে সুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু-জলে সিক্ত হয়ে আমার হাতে গলায়

জড়িয়ে গিয়েছে,—আমার হাতের ওপর কচি পাতার মতো তোমার কোমল হাত দুটি থুয়ে মা অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে আদেশ করছেন,—'দারা, প্রতিজ্ঞা কর, — বেদৌরাকে কখনো ছাড়বি নে।'

তার পর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারী হয়ে এল,—'এর আর কেউ নেই যে বাপ, এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমিই এত আদুরে আর অভিমানী করে ফেলেছি!'

সে কী ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কী নিশ্চিন্ত নির্ভরতা!

তার পরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু করে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা! ...মুখোমুখি বসে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হত, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্মন্তুদ! তা না হলে সাঁঝের মৌন আকাশ-তলে দু-জনে যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে বসতাম, তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমিষে শুকিয়ে গিয়ে দুটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভরে উঠত? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠত? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আসত?...

আজ সেটা খুব বেশী করেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা! কেননা এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আর বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম, সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন "পিয়া পিয়া" বলে ফরিয়াদ করে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ করতে আর কেউ কখনো পারবে না। দুনিয়ার যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী আনন্দময়!

আর সেই দিনের কথাটা? সে-দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতোই প্রাণে বেজেছিল। আমার আজও মনে পড়েছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে ফলে-ফুলে-পাতায়!....আর সবচেয়ে বেশী করে তরুণ-তরুণীদের বুকে!

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢল-ঢল করেছে পরীস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীদের মতো। নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মতো। রস-প্রচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের স্ফুরিত টুকটুকে অরুণ অধরের মতো। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুলবুলদের নওরোজের মেলা বসেছে। আড়ালে-আবডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল বধূর গলা-সাধার ধুম পড়ে গিয়েছে, কি করে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল করে রাখবে!....উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশ্-বু'র মাদকতায় আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢলে পড়েছিলে। "শিরাজ্ বুলবুল" এর দিওয়ান পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত করে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু-জনারই চোখ ছেপে অশ্রু বয়েই চলেছিল।

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকম বড় সুন্দর হয়েই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হয়ে গেল, ঠিক যেমন বিরাট বিপুল এক ঝঞ্ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা বিশৃঙ্খল হয়ে যায়! সে এলোমেলো পাতাগুলো আবার গুছিয়ে নিতে কী বেগই না পেতে হয়েছে আমায় বেদৌরা!... তা হোক্, তবু তো এই চমনে এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই। বাঙালী কবির গানের একটা চরণ মনে পড়ছে,—

'তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মন বিজন-জীবন-বিহারী!'

তারপর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা কি মনে পড়ছে? আমি শীরাজের বুলবুলের সেই গানটা আবৃত্তি করছিলাম,—

দেখনু সে-দিন ফুল বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়,
কাঁদছে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার পড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে!

কইনু, "হাঁ ভাই ভ্রমর! তুমি কাঁদচ সে কোন দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয় কমল-কলির বুকে?"
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু-ভরা চুমোয়
বললে ভ্রমর,—"ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়!
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে!"

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস করলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মতো একটা ঘর বাড়ি-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হতেই পারে না।....

আমার কান্না দেখে সে বললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দিওয়ান পড়ে পড়ে আমিও পাগলা হয়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে বললে যে, আমি তোমাকে যাদু করেছি।

তারপর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝরনাটার ধারে। যখন চেতন হল, তখনও বসন্ত-উৎসব তেমনি চলেছে, শুধু তুমিই নেই; দেখলুম, ক্রমেই তোমার আলতা-ছোবানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলি নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, আর রেশমী চুড়ির টুকরোগুলো বালি-ঢাকা পড়ছে।

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকতুম,—বেদৌরা!

....অনেকক্ষণ পরে পাথরের পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হতে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝ-পথেই মিশিয়ে যেত,—রা--আঃ—আঃ!

সারা বেলুচিস্তান আর আফগানিস্তানের পাহাড় জঙ্গলগুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝরনা-পারের কুটীরটির খোঁজ পেলুম না।

একদিন সকালে দেখলুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একজন পাগলা একা আসমান-মুখো হয়ে শুধু লাফ মারছে, আর সেই সঙ্গে হাত দুটো মুঠো করে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। আমার বড্ডো হাসি পেল। শেষে বললাম,— হাঁ, ভাই, উৎচিঙ্গে! তুমি কি তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধরছ?

সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর করে বলতে লাগল,—

'এপার থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলা গাছে,

হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা!'

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়! অত দুঃখেও আমি হো-হো করে হেসে বললুম,—'ভাই, তুমি কি কবি?'

সে খুব খুশী হয়ে চুল দুলিয়ে বললে,—'হাঁ হাঁ, ভাই।'

আমি বললুম,—'তা তোমার কবিতার মিল হল কই?'

সে বললে,—'তা নাই বা হল, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত পড়ল তো।'

এই বলেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত করে তুলে বললে,—'অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধরতে গেলে সে দূরে সরে গিয়ে বলে,—ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস—আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ! তবুও যে পাই নি বলে ধরতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল।'

এক নিমিষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হয়ে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, হাঁ, ঠিকই তো। যাকে ভিতরে, অন্তরের অন্তরে পেয়েছি, তাকে খামখা বাইরের পাওয়া যেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সে-দিন আমার পোড়ো-বাড়িতে শেষ কান্না কেঁদে বললুম,—'বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে—আমার বুকের প্রতি রক্ত-কণিকায়!'

তারপর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে গলিতে "কমলিওয়ালে" সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই। ভাবতুম, এমনি করে ঘুমে-ঘুরেই আমার জনম কাটবে, কিন্তু তা আর হল কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম। সেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে,....তাই আমায় জানিয়ে দিলে যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ!

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ!

আমি এসেই তোমায় দূর হতে দেখে চিনেছি। তবে তুমি আমায় দেখে

অমন করে ছুটে পালালে কেন? সে কী মাতালের মতো টলতে টলতে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লে ঐ খর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কী অসম্বৃত অশ্রু ঝরে পড়ছিল তোমার! আর কতই সে ব্যথিত অনুযোগ ভরে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে!

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা, তুমি কোথায়? ··

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কী ব্যথিত পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হয়ে গেল, এ অসীম আকাশের কান্না নয় তো?—না না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মতো বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো! দেখছ, সে কত ঠাণ্ডা!····

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি! তা হোক, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল। —আ মলো! এত হুঁ করে হুঁ করে বুক ফেটে কান্না আসছে কিসের? মানুষের মনের মতো আর বালাই নেই! ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো!—কি? তার দেখা পেয়েছি বলে এ কান্না?—তাতে আর হয়েছে কি?

সে যে ফিরে আসবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু এত দিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতীর লতা রিক্তকুসুম! ওগো এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব? যদি এলেই, তবে কেন দু-দিন আগেই এলে না? তা হলে তো তোমায় এমন করে এড়িয়ে চলতে হত না! সেই দিনই যে-দিন আমার ঐ চমনের শুকনো বাগানের ধারে তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম—সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতাম,—'এস প্রিয়, ফিরে এস!'

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই

যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দুটি ফোঁটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সে-দিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখাচোখি হল, তখন কত মিনতি-অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের চারটি চোখেরই সজল চাউনিতে!—হাঁ, আর কেমন "বেদৌরা" বলে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঐ খেজুরের কাঁটা-ঝোপটায় পড়ে গেল। তা দেখে পাষাণী-আমি কি করেই সে চোখ দু'টো জোর করো দু-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম।

পুরানো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠছে। সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুলবুলেরই মতো মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর! তারপর সেই জুয়াচোরের জোর করে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে,—অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ!—ওঃ, কি-ই না করেছে তাকে আবার পেতে! কই, তখনও তো সে এল না!

তাবপর ভিতরে বাইরে সে কী দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ এক তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে লাগল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মতো সয়ফুল-মুলক্ এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে—ভালবাসায় কী বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিনীর কড়ি মধ্যমের মতো! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্মম! এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হচ্ছে পৈশাচিক সুখ! এতে শুধু দীপক রাগিনীর মতো পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ এই দীপকের আগুন একবার জ্বলে উঠবেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে। সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মতো সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্বলবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই!

তাই তো যে-দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢলে চলে পড়ছিলাম, আর-একজন এসে আমায় যাচ্ঞা করলে, তখন আমার এই বাইরের প্রবৃত্তিটা

দমন করবার ক্ষমতাই যে রইল না। তখন যে আমি অন্ধ। ওগো দেবতা, সে-দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেউ যে এল না শাসন করতে তখন! হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হল! সেই দিনই আমি ভিখারিণী হয়ে পথে বসলাম। ওগো, আমার সেই অধঃপতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন-জমাট হয়ে বসেছিল, তখন এখনকার মতো এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করেনি। হয়তো একটি রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সে-দিন ছুটে পালাত! তা হলে দেখতে গা, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একছত্র সম্রাটের মতো বসে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হল, তা সে-দিনও বুঝতে পারি নি, আজও বুঝতে পারছি নে, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমি যদি বলি, আমার প্রেম—বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান প্রেম, যা সর্বদাই পবিত্র, তা তেমনি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাকবে, তার গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোন অত্যাচার অনাচারের এমন ক্ষমতা নেই—তা হলে কে বুঝবে? কেই বা আমায় ক্ষমা করবে? তবু আমি বলব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর; পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ—মা! কী অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে! ·····কী সব ভুল বকছিলাম এতক্ষণ। ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না?······

পাপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নদীর বান-ভাসির পর যেমন বান রেখে যায় একটা পলির আবরণ সারা নদীটার বুকে, তেমনি পাপ রেখে যায় সঙ্কোচের পুরু একটা পর্দা; সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা হয়তো অনেকেরই সারা জীবন ধরে থাকে। পাপী নিজেকে সামলে নিয়ে হাজার ভাল করে চললেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারাজীবন কাদা-লেপ্টা হয়ে লেগেই থাকবে! চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও যে ঢাকতে পারে না! এই পাপের অনুশোচনাটাও কত বিষাক্ত—তীক্ষ্ণ! ঠিক যেন একসঙ্গে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়।

আবার আমার মনে পড়েছে সেই আমার বিপথে টেনে নেওয়া শয়তান

সয়ফুল-মুল্‌কের কথা। সে-ই তো যত "নষ্ট গুড়ের খাজা"। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম!

আমরা নারী,—মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হয়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরও ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল-পানের তীব্র জ্বালায় ছটফট করছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হয়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে—সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে—সেই দিন—ঠিক সেই দিন সয়ফুল-মুল্‌ক্ সহসা কি রকম ছোট হয়ে গেল! একটা দুর্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত করে দিলে। সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত-চকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল, 'খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে যেন সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু করো খোদা!'

তারপর কেমন সে উন্মাদের মতো ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে,—'দেবী, ক্ষমা করো এ শয়তানকে! দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষণের ফলে তা আরো মহান উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু আমি?—আমি? ওঃ ওঃ ওঃ!' সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার সে-ছোটা থেমেছে কি না জানি নে।

কিন্তু এ কি! আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাঙানি দিচ্ছে শুধু একবার দেখে আসতে যে, তিনি তেমনি করেই সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন কি না।

না না,—এ প্রাণ-পোড়ানি আর সইতে পারি নে গো—আর সইতে পারি নে! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা করবই করব, একবার শেষ দেখা: তারপর বলব তাঁকে,—ওগো, তোমার বেদৌরা আর নেই,—সে মরেছে, মরেছে। তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে। তুমি তাকে বৃথা এমন করে খুঁজে বেড়াচ্ছ। বেদৌরা নেই—নেই—নেই। তারপর—তারপর? তারপরেও

তিনি আমায় চান, তা হলে কি বলব তাঁকে, কি করব তখন?—না, তখনও এমনি শক্ত কাঠ হয়ে বলব,—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না গো দেবতা, ছুঁয়ো না! আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা করো না। আঃ! মা গো! কী ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান-খান করে কেটে দিচ্ছে।

দারার কথা

গোলেস্তান

তুমি কি সেই গোলেস্তান? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন? তোমার ফুলে সে-সৌন্দর্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ী-উঠে-আসা পূতিগন্ধ! তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে করে দিয়েছে! তোমার মলয়-বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুকরো লুকিয়ে রয়েছে! তোমার সারা গায়ে যেন বেদনা!

কি করলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা! নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি,—এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে। আমি কখনই ভুলব না খোদা যে, তুমি নিশ্চয় মহান, আর তোমার-দেওয়া সুখ-দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না। ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কী শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মানছে কই? কেন ভাবছি, এ নিশ্চয়ই আঘাত। তৃষাতুর চাতক যখন "ফটিক জল—ফটিক জল" করে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ-হাসি হাসে তখন কেন মনে করি এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা?—কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না। আগে মনে করতুম, আমি কত বড়—কত উচ্চ। আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তিও বড় নই। আমারও মন তাদেরমতো অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নইলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা করতে পারলুম না।

কেন? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ। বাহিরটা তার নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র রয়েছে। অনেকে যে ভিতরটা অপবিত্র করে বাহিরটা পবিত্র রাখবার চেষ্টা করে, সেইটাই হচ্ছে বড় দোষ কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ-সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র রয়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা করতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখন অনেক ছোট। জোর করে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হতে পারে না। সে যে হৃদয় হতে নয়। নাঃ,আমাকে পুড়ে খাঁটি হতেহবে। খুব দূরে থেকে যদি মনটাকে ঠিক করতে পারি, তবেই আবার ফিরব, নইলে নয়। ওঃ, কী নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা শুনে আমি তো একেবারে নরককুণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে করেছিলুম, আমিও এমনি করে আমার সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তারপর নরকের দ্বার থেকে কেমন করে হাত ধরে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আনলে। সে বেশ শান্ত স্বরেই বললে,—'এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর।' ভাবলুম, তাই তো, অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে এ কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম? আমি আবার ফিরলুম।

তারপর বেদৌরাকে বলে এলুম—'বেদৌরা! যদি কোন দিন হৃদয় হতে ক্ষমা করবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির-বিদায়। মুখে জোর করে ক্ষমা করলুম বলে তোমায় গ্রহণ করে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ করে নিতে পারি নে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছে দিক।'

বেদৌরা অশ্রু-ভরা হাসি হেসে বললে,—'ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমায়! এ সংশয় দু-দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হয়ে দেখা দিয়েছে! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরনাটার ধারে বসে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় পরতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়!...'

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন্ পথে? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি?

সয়ফুল-মুল্‌কের কথা

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোন দিকে যোগ দিয়ে যত শীগগির পারি এই পাপ-জীবনের অবসান করে দিই। তারপর? তারপর আর কি? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তা হলে সে এই বলে শান্তি পায় যে, তার ওপর অবিচার করা হচ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কিন্তু শাস্তি না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা আর হল কই! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছে বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম।

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকে তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছ। পাপীর জীবনেরও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সলতে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয়।

কিন্তু সহসা এ কী দেখলুম! দারা কোথা থেকে এখানে এল? সেদিন তাকে অনেক করে জিজ্ঞেস করায় সে বললে,—'এর চেয়েও ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না তাই এ দলে এসেছি।'

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সে! আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন করেছি তো আমিই।

কী অচিন্ত্য অপূর্ব অসম সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা! সবাই ভাবছে এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন করে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি। এমন দিন নেই, যে-দিন একটা-না-একটা আঘাত আর চোট খেয়েছে সে। সে দিকে কিন্তু দৃষ্টিই নেই তার; সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মতো কঠোর হয়ে অন্যায়কে আক্রমণ করছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়? কী একরোখা জিদ! আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্যে নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত সুন্দর।

ক'দিন থেকে বোমা আর উড়োজাহাজ হয়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য করে কি করে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় করছে এই উন্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে!

আজ সে একজন সেনাপতি। কিন্তু এ কী অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে! রোজই জখম হচ্ছে, কিন্তু তাকে হাসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য? গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে; সেনাপতি হলেও সাধারণ সৈনিকের মতো তার হাতে গ্রেনেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বালতি, আর হাতে রিভলভার তো আছেই। রক্ত বইয়ে, লোককে হত্যা করে তার যে কী আনন্দ, সে আর কী বলব! সে বলছে, পরাধীন লোক যত কমে, ততই মঙ্গল।

আমি অবাক হচ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে যায় নি তো!

এ কি করলে খোদা! এ কি করলে! এত আঘাতের পরেও হতভাগা দারাকে অন্ধ আর বধির করে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই কিছু একটা হবে, তা আমি অনেক আগে থেকেই ভয় করছিলাম! আচ্ছা, করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারি নে বটে, কিন্তু এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দুটো বধির করে দিলে, আর আমার মতো পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি বলব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা লুকানো রয়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু, দেখাও! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তবে কি আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে? ওগো ন্যায়ের কর্তা! এই কি আমার দণ্ড,—এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি? ...

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়-পতাকাটা রাজ-অট্টালিকার শিরে থর-থর করে কাঁপছে। বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্তে যেন জান-মোচড়ান শ্রান্ত "ওয়ালট্‌জ"-রাগিণীর আর্ত-সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে। তূর্য-বাদকের স্বর ঘন-ঘন ভেঙে যাচ্ছে! আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন। অন্ধ বধির আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর করে সৈনিকদের সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু করে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে। আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন—তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হয়ে যাচ্ছিল,—'ভাই দারাবী! আমাদের মধ্যে "ভিক্টোরিয়া ক্রস", "মিলিটারী ক্রস" প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেননা আমরা নিজে-নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত করতে পারি নে। আমাদের বীরত্বের ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ; কিন্তু যারা তোমার মতো এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায় আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি।'

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তার অবাধ্য

অশ্রুফোঁটা কটি মুছে নিয়ে বললেন,—'তুমি অন্ধ হয়েছ, তুমি বধির হয়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কঠোর চিহ্ন। আমরা বলব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! অনাহূত তুমি বিশ্বের মঙ্গলকামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময়ে খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন,—হোক না কেন তা বাইরের চোখে নির্মম—তার বড় পুরস্কার মানুষ আমরা কি দেব ভাই? 'খোদা নিশ্চয়ই মহান এবং তিনি ভাল কাজের জন্যে লোকেদের পুরস্কৃত করেন'—এ যে তোমাদেরই পবিত্র কোরআনের বাণী। অতএব হে বীর সেনানী, হয়তো তোমার এই অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত রয়েছে। খোদা তোমায় শান্তি দিন!'

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখদুটি নিয়ে যতদূর সাধ্য সৈনিকগণকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল,—'বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার!'

আমিও অন্ধদারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম। আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা। দারা আমায় ক্ষমা করেছে, আমায় সখা বলে কোল দিয়েছে। এতদিনে না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে উঠল! এতদিনে না সত্যিকার ভালবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতোই অনন্ত উদার করে দিলে। রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা করেছ?'

সে কান্না-ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে,—

'ওগো প্রিয়তম, তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে আমার বুকে আঘাত করেছ, আমি তাই দিয়ে যে প্রেমের মহান মসজিদ তৈরি করেছি!'

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চেয়ে সরল আর কিছুই নেই দুনিয়ায়। দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অমনি সরল শিশু হয়ে পড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না! তা কিন্তু অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায়। আমি সে দিন হাসতে হাসতে বললাম,—'হাঁ ভাই, এই যে তুমি

অন্ধ আর বধির হয়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি?'

সে বললে,—'ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা করতে পেরেছি– এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হয়েছি বলেই তো,—এই বাইরের চোখ দুটোকে কানা করে আর শ্রবণ দুটোকে বধির করেই তো! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো। আর এই কালা কান দুটো দিয়ে কি শুনছি জানিস? শুধু তার কানে-কানে বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-ভরা মঞ্জীরের রুনু-ঝুনু বোল। আমি যে এই নিয়েই মশগুল!'—বলেই অভিভূত হয়ে সে গান ধরলে,—

'যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো!
আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো!'

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তার সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্তি ধরে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল। কিন্তু কত শান্ত স্নিগ্ধ বিরাট নির্ভরতা আর ত্যাগ এই গানে!

সবচেয়ে আমার বেশী আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে, বেদৌরাও আমাকে ক্ষমা করেছে, অথচ তার এ বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হতে ক্ষমা করে বলা।

খোদা, তুমি মহান! 'যার কেউ নেই তুমি তার আছ।' এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই।

আজ এই বিনা কাজের আনন্দ,—ওঃ, তা কত মধুর আর সুন্দর!

গোলেস্তান
নির্ঝরের অপর পার

তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন একেবারে প্রাণ খুলে হৃদয় হতে। এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন করে আমার প্রতীক্ষায় সকাল সাঁঝগুলি আনন্দেই কেটে গিয়েছে। আমার এই আশায় বসে থাকা দিনগুলি, বিরলে গাঁথা ফুলহারগুলি আর বেদনা-বারিসিক্ত বিরহ-গানগুলি তারই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে নিয়ে তার বিনিময়ে যা দিয়েছেন, সেই তো গো তাঁর আমায়-দেওয়া ব্যথার দান।

তিনি বললেন—'বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর প্রশান্ত চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস করে না, তারা মস্ত ভুল করে, আর তাদের মতো হতভাগ্য অশান্ত জীবনও কারুর নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস করতে যতই চেষ্টা করুক, তা কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিকক্ষণের জন্যে আড়াল করে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে। কোন্ ফাঁকে আর সে কেমন করে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলি হয়, তা মেঘও ভেবে পায় না, আর আমরাও জানতে চেষ্টা করি নে। তারপর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য হাসতে থাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে। কারণ তাতে তো সূর্যের কোন অনিষ্টই হয় না,—সে জানে, সে যেমন আছে তেমনি অটুট থাকবেই : ক্ষতি যা তোমার আমার—এই দুনিয়ার। তাই বলে কি বাদলের মেঘ আসবে না? সে

এসে আকাশ ছাইবে না? সে আসবেই, ওর যে স্বভাব; তাকে কেউ রুখতে পারবে না। তবে অত বাদলেও সূর্যকিরণ পেতে হলে মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে হয়। সেটা তেমন সোজা নয় আর তা দরকারও করে না। কামনাটা হচ্ছে ঠিক এই বাদলের মতো; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মতো একই ভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে।

'কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট করেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট করতে পারে নি। তা ছাড়া, ও না হলে যে তুমি আমাকে এত বেশী করে চিনতে না, এত বড় করে পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল করে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এগুলো থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।'

পুষ্পিত সেই গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে "পিয়া পিয়া" ক'রে বুলবুলগুলো উড়ে গেল।

তিনি আবার বললেন, 'দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসরশয্যা হবে। তারপর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নির্ঝরটার ও-পারে, আর আমি থাকবো এ পারে। এই দু'পারে থেকে আমাদের দু'জনেরই বিরহ-গীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরও বড়—আরও বড় করে পাব।'

সেই দিন থেকে আমি নির্ঝরটার এ পারে!

আমারও অশ্রু-ভরা দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে ওঠে, যখন মৌন বিষাদে নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারী চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিণী ও-পার হতে কাঁদতে কাঁদতে এ-পারে এসে বলে,—

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন!'

ভার্দুন ট্রেঞ্চ, ফ্রান্স

ওঃ! কী আগুন-বৃষ্টি! আর কী তার ভয়ানক শব্দ!—গুড়ুম্—দ্রুম—দ্রুম। আকাশের একটুও নীল্ দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা হলে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত! আর এমনি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া দ্রুম—দ্রুম শব্দ হত, তা হলে লোকের কানগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যেত। আজ শুধু আমাদের সিপাইদের সেই হোলি খেলার গানটা মনে পড়ছে,—

'আজু তলওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি,
জমা হো গেয়ে দুনিয়া কা সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তোপোঁও পিচকারী,
গোলা বারুদকা রঙ্গ বনি হেয়, লাগি হেয় ভারী লড়াঈ।'

বাস্তবিক এ গোলা-বারুদের রঙে আসমান জমিন লালে লাল হয়ে গেছে! সবচেয়ে বেশী লাল ঐ বুকে "বেয়নেট"-পরা হতভাগাদের বুকের রক্ত। লালে লাল! শুধু লাল আর লাল! এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মতো লাল হয়ে শুয়ে আছে।

ওঃ! সবচেয়ে বিশ্রী ঐ ধোঁওয়ার গন্ধটা! বাপ রে বাপ! ওর গন্ধে যেন বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের মারবার জন্যে এ-সব কী কুৎসিত নিষ্ঠুর উপায়! রাইফেলের গুলীর প্রাণহীন সীসাগুলো যখন হাড়ে এসে ঠেকে, তখন সেটা কী বিশ্রী রকম ফেটে চৌচির হয়ে দেহের ভিতরের মাংসগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

এত বুদ্ধি মানুষ অন্য কাজে লাগালে তারা ফেরেশ্‌তার কাছাকাছি একটা খুব বড় জাত হয়ে দাঁড়াত।

ওঃ ! কী বুক-ফাটা পিয়াস ! এই যে পাশের বন্ধু রাইফেলটা কাত্ করে কেলে ঘুমিয়ে পড়েছে. একে আর হাজার কামান একসঙ্গে গর্জে উঠলেও জাগাতে পারবে না—কোন সেনাপতিও আর তার হুকুম মানাতে পারবে না। এই সাত দিন ধরে একরোখা ট্রেঞ্চে কাদায় শুয়ে শুয়ে অনবরত গুলী ছোঁড়ার ক্লান্তির পর সে কী নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে এর প্রাণে ! তৃপ্তির কী স্নিগ্ধ স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে এর শুষ্ক শীতল ওষ্ঠপুটে !

যাক, যে ভয়ানক পিয়াস লেগেছে এখন আমার ! এখন ওর কোমর থেকে জলের বোতলটা খুলে একটু জল খেয়ে জানটা ঠাণ্ডা করি তো ! কাল থেকে আমার জল ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ এক ফোঁটা জল দেয় নি।—আঃ ! আঃ ! এই গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক্ জল. সে কত মিষ্টি ! অনবরত চালিয়ে চালিয়ে আমার "ল্যুইস্" গানটাও আর চলছে না। এখন আমার মৃত বন্ধুর ল্যুইস গানটা দিয়ে দিব্যি কাজ চলবে ! এর যদি মা কিংবা বোন কিংবা স্ত্রী থাকত আজ এখানে. তা হলে এর এই গোলার আঘাতে ভাঙা মাথার খুলিটা কোলে করে খুব এক চোট কেঁদে নিত ! যাক, খানিক পরে একটা বিশ-পঁচিশ মণের মস্ত ভারী গোলা হয়তো ট্রেঞ্চের সামনেটায় পড়ে আমাদের দু-জনাকেই গোর দিয়ে দেবে ! সে মন্দ হবে না।

হাঁ, আমার এত হাসি পাচ্ছে ঐ কান্নার কথা মনে হ'য়ে ! আরে ধোৎ, সবাই মরব, আমি মরব, তুইও মরবি। এত বড় একটা নিছক সত্যি একটা স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে কান্না কিসের ?

এই যে এত কষ্ট, এত মেহনত করছি, এত জখম হচ্ছি, তবুও সে কি একটা পৈশাচিক আনন্দ আমার বুক ছেয়ে ফেলেছে ! সে আনন্দটা এই কাঠ পেন্সিলটার সীসা দিয়ে এঁকে দেখাতে পারছি নে। মস্ত ঘন ব্যথার বুকেও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে, যেটা আমরা ভাল করে অনুভব করতে পারি নে। এই লেখা অভ্যেসটা কি খারাপ ! এত আগুনের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছি,—পায়ের নীচে দশ-বিশটা মড়া, মাথার ওপর উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফাটছে—থম—থম—থম, সামনে বিশ হাত দূরে বড় বড় গোলা ফাটছে—গুড়ুম গুড়ুম, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে "রাইফেল" আর "মেশিনগানে"-র গুলী—শোঁ শোঁ শোঁ,—তবুও এই সাতটা দিন মনের

কথাগুলো খাতার কাগজগুলোকে না জানাতে পেরে জানটাকে কী ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল ! আজ এই কটা কথা লিখে বুকটা বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে ! পাশের মরা বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি একটু আরাম করে নেওয়া যাক !
—ওঃ, কী আরাম !

এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দুটো মাখন-মাখা রুটি দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয় নি। এ দেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে। হা—হা—হা—হাঃ, রুটি দু'টো দেখছি শুকিয়ে দিব্যি "রোষ্ট" হয়ে আছে। দেখা যাক, রুটি শক্ত না আমার দাঁত শক্ত ! এই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যা আগুন জ্বলছে ! আচারটা কিন্তু বড় তাজা আছে, দেখছি !

ঐ তের-চৌদ্দ বছরের কচি মেয়েটা (আমাদের দেশে ও-রকম মেয়ে নিশ্চয়ই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী !) যখন আমার গলা ধরে চুমো খেয়ে বললে,—'দাদা, এ-লড়াইতে কিন্তু শত্তুরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে', তখন আমার মুখে সে কী একটা পবিত্র বেদনা-মাখা হাসি ফুটে উঠেছিল !

আঃ ! এতক্ষণে আকাশটা বেরোবার একটু ফাঁক পেয়েছে। রাশি রাশি জল-ভরা মেঘের ফাঁকে একটু নীল আসমান দেখা যাচ্ছে। সে কত সুন্দর ! ঠিক যেন অশ্রু-ভরা চোখের ঈষৎ একটু সুনীল রেখা !

থাক গে এখন, অন্য সময় বাকি কথাগুলো লেখা যাবে। মরা বন্ধুর আত্মা হয়তো আমার ওপর চটে উঠেছে এতক্ষণ। কি বন্ধু, একটু জল দেবো নাকি মুখে ?—ইস, হাঁ করে তাকাচ্ছেন দেখ ! না বন্ধু—না, তোমার পরপারের প্রিয়তমা হয়তো তোমার জন্যে শরবতের গেলাস-হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! আহা, সে-বেচারীকে বঞ্চিত করব না তার সেবার আনন্দ থেকে !

আজ কত কথাই মনে হচ্ছে—না—না, কিচ্ছু মনে হচ্ছে না, সব ঝুট। ফের লুইস গানটায় গুলী চালানো যাক।—আমার সাহায্যকারী কয় জন বেশ তোয়াজ করে ঘুমিয়ে নিলে তো দেখছি ! ঐ—ঐ, পাশে কাদের তালে তালে পা মিলিয়ে চলার শব্দ পাচ্ছি ! ঝপ ঝপ ঝপ—লেফ্‌ট রাইট

লেফ্‌ট ! ঐ মিলিয়ে চলার শব্দটা কী মধুর ! ও বুঝি আমাদের "রিলিভ" করতে আসছে অন্য পল্টন। উঃ ! এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলীতে !...."ব্যাণ্ডেজ"টা বেঁধে নিই নিজেই। "নার্স"গুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি নে। নারী যদি ভাল না বেসে সেবা করে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন ?

আঃ, যুদ্ধের এই খুনোখুনির কী মাদকতা-শক্তি ! মানুষ-মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা !

পাশে আমার চেয়ে অত বড় জোয়ানটা এলিয়ে পড়েছে, দেখছি। আমি দেখছি, শরীরের বলের চেয়ে মনের বলের শক্তি অনেক বেশী।

লুইস গানে এক মিনিটে প্রায় ছয় সাত শো করে গুলী ছাড়ছি ! যদি জানতে পারতুম, ওতে কত মানুষ মরছে ! তা হোক, এই দু'কোণের দু'টো লুইস গানই শত্রুদের জোরে আটকিয়ে রেখেছে কিন্তু ! কী চিৎকার করে মরছে শত্রুগুলো দলে দলে ! কী ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী !

সিঁন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স

এই দু'টো দিনের আটচল্লিশ ঘণ্টা খালি লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। এখন আবার ধড়া-চূড়ো পরে বেরুতে হবে খোদার সৃষ্টি নাশ করতে। এই মানুষ-মারা বিদ্যে লড়াইটা ঠিক আমার মতো পাথর-বুকো কাটখোট্টা লোকেরই মনের মতো জিনিস।

আজ সেই বিদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কী পরিষ্কার সুন্দর ফিটফাট বাড়িগুলো এদের ! মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশ হলে বলত মেয়েটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! কুড়ি-একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলামেশা তারা আদৌ পছন্দ করত না।

ভালবাসাটাকে কী কুৎসিত চক্ষে দেখছে আজ-কাল লোকেরা! মানুষ তো নয়, যেন শকুনি! দুনিয়ায় এত পাপ! মানুষ এত ছোট হল কি করে? তাদের মাথার ওপর অমন উদার অসীম নীল আকাশ, আর তারই নীচে মানুষ কী সঙ্কীর্ণ, কী ছোট!

আগুন, তুমি ঝর—ঝম ঝম ঝম! খোদার অভিশাপ, তুমি নেমে এস ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মতো হয়ে—ঝুপ ঝুপ ঝুপ! ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবাকে নিঃসাড় করে দিয়ে—ওম-ওম-ওম! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্য দিয়ে ফাটো—ঠিক মানুষের মগজের ওপরে—দ্রুম—দ্রুম—দ্রুম! আর সমস্ত দুনিয়াটা—সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙে পড়ো তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে।

এখন যে সাজে সেজেছি, ঠিক এই রকম সাজে যদি আমাদের দেশের একটা লোককে সাজিয়ে উলটে ফেলে দিই, তা হলে হাজার ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও সে আর উঠতে পারবে না। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে আমার এখনকার এই গদাই লশকরী চেহারা দেখে! আমার এক "কাজিল" বন্ধু বলছেন,—'কী নিমকিন চেহারা!'—আহা, কী উপমার ছিরি! কে নাকি বলেছিল,—'ষাঁড়টা দেখতে যেন ঠিক বাংলা মাছ!'

পারিসের পাশের ঘন বন

কাল হঠাৎ এই মস্ত জঙ্গলটায় আসতে হল! কেন এ রকম পিছিয়ে আসতে হল তার এতটুকুও জানতে পারলুম না! এ মিলিটারী লাইনের ঐটুকুই সৌন্দর্য! তোমার ওপর হুকুম হলো 'ঐ কাজটা কর!' 'কেন ও-রকম করব?' তার কৈফিয়ৎ চাইবার কোন অধিকার নেই তোমার। বাস্ হুকুম!

যদি বলি, 'মৃত্যু যে ঘনিয়ে আসছে!'—অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তার কড়া জবাব আসবে,—'যতক্ষণ তোমার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ কাজ করে যাও,

যদি চলতে চলতে তোমার ডান পায়ের ওপর মৃত্যু হয়, তবে বাম পা পর্যন্ত চল !’

এই হুকুম মানায়, এই জীবন-পণ আনুগত্যে কত যে নিবিড় মাধুরী ! কাজের এ কি কোমলতা ! যদি সমস্ত দুনিয়াটা এমনি একটা (এবং কেবল একটা) সামরিক শক্তির অধীন হয়ে যেত, তা হলে এই মাটির জমিনই এমন একটা সুন্দর স্থান হয়ে দাঁড়াত যাকে “জিন্নতুল বাকিয়া” (শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ) বললেও লোকে তৃপ্ত হত না।

কী শৃঙ্খলা এই ব্রিটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে কায়দা-কানুনে, তাই তারা আজ এত বড়। ওপর দিকে চাইতে গিয়ে আমাদের মাথার পাগড়ি পড়ে গেলেও তাদের মাথাটা দেখতে পাব না ! মোটামুটি বলতে গেলে তাদের এই দুনিয়া-জোড়া রাজত্বটা একটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চলছে, কেননা তার সেকেণ্ডের কাঁটা থেকে ঘণ্টার কাঁটা পর্যন্ত সব তাতে বড্ডো কড়া বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম। সেটা আবার রোজই “অয়েল্ড” হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।

আমরাই নিয়ে গেলুম জার্মানদের “হিন্ডেনবার্গ লাইন” পর্যন্ত খেদিয়ে, আবার আমাদেরই এতটা পিছিয়ে যেতে হল ! ঘড়িটা যে তৈরি করেছে, সে জানে কোন কাঁটার কোনখানে কি কাজ, কিন্তু কাঁটা কিছু বুঝতে পারে না। তবু তাকে কাজ করে যেতে হবে, কেননা, একটা স্প্রিং অনবরত তার পেছন থেকে তাকে গুঁতো মারছে।

এমনি একটা বিরাট কঠিন শৃঙ্খল, মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদের খুবই দরকার। আমাদের এই “নেঁড়ে” জাতটাকে এমনি খব পিঠমোড়া করে বেঁধে দোরস্ত না করলে এর ভবিষ্যতে আর উঠে দাঁড়াবার কোন ভরসাই নেই ! দেশের সবাই মোড়ল হলে কি আর কাজ চলে !

ওঃ এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি। এ যেন একটা ভূতুড়ে কাণ্ড। কোথায় কোন সুদূরে লড়াই হচ্ছে, আর এখানে কি করে এই রকম গোলা আসছে ?

হাতী যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটি মশা তার মগজে কামড়ে কি রকম “ঘায়েল” করে দেয় তাকে !

এখানে এই গাছপালার আড়ালে একটা স্নিগ্ধ ছায়ার অন্ধকারে বেশ থাকা যাচ্ছে, কিন্তু এমনি একটু অন্ধকারের জন্যে আমার জানটা বড্ডো বেশী আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল।

হায়! এই অন্ধকারে এলে কত কথাই মনে পড়ে আমার আবার!—নাঃ! যাই একবার গাছে চড়ে দেখি আশেপাশে কোথাও দুষমন লুকিয়ে আছে কি না।

আহা, গাছ থেকে ঐ দূরে বরফে-ঢাকা নদীটা কী সুন্দর! আবার ঐ গোলার ঘায়ে ভাঙা মস্ত বাড়িগুলো কী বিশ্রী হাঁ করে আছে! এই সব ভাঙা-গড়া দেখে আমার সেই ছোট্টবেলাকার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা খুব ঘটা করে ধুলো-বালির ঘর বানাতুম। তারপর খেলা শেষ হলে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম,—

‘হাতের সুখে বানালুম,
পায়ের সুখে ভাঙলুম!’

অনেক দূরে ঐ কামানের গোলাগুলী পড়ছে আর এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন আসমানের বুক থেকে তারাগুলো খসে খসে পড়ছে! ওঃ, কী বোঁ-বোঁ শব্দ! ঐ যে মস্ত উড়োজাহাজ কী ভয়ানক জোরে ঘুরছে উঠছে আর নামছে। ঠিক যেন একটা চিলে ঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে! ওটা আমাদেরই। জার্মানদের জেপেলিনগুলো দূরে থেকে দেখায় যেন একটা বড় শুঁয়োপোকা উড়ে যাচ্ছে।

যাক, আমার “হ্যাভার স্যাক্” থেকে একটু আচার বের করে খাওয়া যাক। সেই বিদেশিনী মেয়েটা আজ কত দূরে, কিন্তু তার ছোঁওয়া যেন এখনও লেগে রয়েছে এই ফলের আচারে!—দূর ছাই! যত সব বাজে কথা মনে হয় কেন? খামখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচলে কচলে দিয়ে যায়।

হা-হা—হা—হাঃ, বন্ধু আমার পাশের গাছটায় বসে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন, দেখছি। ঐ যে দিব্যি কোমরবন্ধটা দিয়ে নিজেকে একটা ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে বেঁধেছেন। একবার পড়েন যদি ঝুপ করে ঐ নীচের

জলটায়, তা হলে বেশ একটা রগড় হয় কিন্তু! পড়িস আল্লা করে—এই সড়াৎ দু—ম!…

দেবো নাকি তার কানের গোড়া দিয়ে সোঁ করে একটা পিস্তলের গুলী ছেড়ে? আহা-হা, না না, ঘুমুক বেচারা! আমার মতন পোড়া চোখ তো আর কারুর নেই যে ঘুম আসবে না, আর এমন পোড়া মনও কারুর নেই যে সারা দুনিয়ার কথা ভেবে মাথা ধরাবে!

রাত্রি হয়েছে,—অনেকটা হবে! ভোর পর্যন্ত এমনি করেই কুঁকড়ো অবতার হয়ে থাকতে হবে। বুড়ো কালে (অবশ্য, যদি ততদিন বেঁচে থাকি!) এই সব কথা আর খাটুনির স্মৃতি কী মধুর হয়ে দেখা দেবে!

মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জোছনা কেমন ছিটে-ফোঁটা হয়ে পড়ছে সারা বনটার বুকে। এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতা বাঘের মতো দেখাচ্ছে।

কালো ভারী জমাট মেঘগুলো আমার মাথার দু'-হাত ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় ভেসে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর তারই দু'-এক ফোঁটা শীতল জল আমার মাথায় পড়ছে টপ—টপ–টপ! কী করুণ শীতল সে জমাট মেঘের দু'-ফোঁটা জল! আঃ!

চাঁদটা একবার ঢাকা পড়ছে, আবার সাঁ করে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সেঁধিয়ে পড়ছে। এ যেন বাদশাহ্জাদার শীশমহলের সুন্দরীদের সাথে লুকোচুরি খেলা। কে ছুটছে? চাঁদ, না মেঘ? আমি বলব "মেঘ", একটি সরল ছোট্ট শিশু বলবে "চাঁদ"। কার কথা সত্যি?

আহা, কী সুন্দর আলোছায়া!

দূরে ওটা কি একটা পাখি অমন করে ডাকছে? এ দেশের পাখিগুলোর সুর কেমন একটা মধুর অলসতায় ভরা। শুনলে যেন নেশা ধরে।

এই আলোছায়ায় আমার কত কথাই না মনে পড়ছে। ওঃ, তার চিন্তাটা কী ব্যথায় ভরা!

আমার মনে পড়ছে, আমি বললুম,—'হেনা, তোমায় বড্ডো ভালবাসি।' সে—হেনা তার কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে,—'সোহ্রাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারি নি!'

সে-দিন জাফরানের ফুলে যেন "খুন-খোশ্‌-রোজ" খেলা হচ্ছিল বেলুচিস্তানের ময়দানে। আমি আনমনে আখরোটের ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে কাছের দেবদারু গাছ থেকে কতকগুলো ঝুমকো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম।

তাম্বুলী-সুরমা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা ঝরে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার মেহেদী-ছোবানো হাতের চেয়েও লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখটা।

একটা কাঁচা মনক্কার থোকা ছিঁড়ে নিয়ে অদূরে কেয়াঝোপের বুলবুলিটার দিকে ছুঁড়ে দিলুম। সে গান বন্ধ করে উড়ে গেল।

মানুষ যেটা ভাবে সবচেয়ে কাছে, সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে দূর। এ একটা মস্ত বড় প্রহেলিকা।

হেনা—হেনা !····আফসোস্‌।

হিণ্ডেনবার্গ লাইন

ওঃ ! আবার কোথা এসেছি। এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরীদের রাজ্যি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি নে! যুদ্ধের ট্রেঞ্চ যে একটা বড় শহরের মতো এ রকম ঘর-বাড়িওয়ালা হবে, তা কি কেউ অনুমান করতে পেরেছিল? জমিনের এত নীচে কী বিরাট কাণ্ড! এও একটা পৃথিবীর মস্ত বড় আশ্চর্য। দিব্যি বাংলার নওয়াবের মতো থাকা যাচ্ছে কিন্তু এখানে!···

এ শান্তির জন্যে তো আসি নি এখানে। আমি তো সুখ চাই নি! আমি চেয়েছি শুধু ক্লেশ শুধু ব্যথা শুধু আঘাত! এ আরামের জীবনে আমার পোষাবে না বাপ্‌! তা হলে আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে। এ যেন ঠিক "টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা"।

উঁহু—আমি কাজ চাই। নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই! এ কি অস্বস্তির আরাম!

আচ্ছা, আগুনে পুড়ে নাকি লোহাও ইস্পাত হয়ে যায়। মানুষ কি হয়? শুধু "ব্যাপটাইজড্‌"?

আবার মনটা ছাড়া পেয়ে আমার সেই আঙুর আর বেদনা গাছে ভরা ঘরটায় দৌড় মেরেছে! আবার মনে পড়েছে সেই কথা!···

'হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন জ্বলুক! আর হয়তো আসবো না। তবে আমার সম্বল কি? পাথেয় কই? আমি কি নিয়ে সেই অচিন দেশে থাকব?'

আমার হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দুটি কিশলয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল। সে স্পষ্টই বললে,—'এ তো তোমার জীবনের সার্থকতা নয় সোহ্‌রাব! এ তোমার রক্তের উষ্ণতা! এ কি মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছ! এখনও বোঝ! আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারি নি!'

সব খালি! সব শূন্য! খাঁ—খাঁ—খাঁ! একটা জোর দমকা বাতাস ঘন ঝাউ গাছে বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—আঃ—আঃ—আঃ!

যখন কোয়েটা থেকে আমাদের ১২৭ নম্বর বেলুচি রেজিমেণ্টের প্রথম "ব্যাট্যালিয়ান" যাত্রা করলে এই দেশে আসবার জন্যে তখন আমার বন্ধু একজন যুবক বাঙালী ডাক্তার সেই গাছের তলায় বসে গাচ্ছিল,—

'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে,
বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে।
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম-বনে,
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে'আসে বারে বার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!'

কী দুর্বল আমি ! সাধে কী আসতে চাইনি এখানে ! ওগো, এরকম নওয়াবী জীবনে আমার চলবে না !

আমার রেজিমেণ্টের লোকগুলো মনে করে আমার মতো এত মুক্ত, এত সুখী আর কেউ নেই। কারণ আমি বড্ডো বেশী হাসি। হায়, মেহেদী পাতার সবুজ বুকে যে কত "খুন" লুকানো থাকে, কে তার খবর নেয় !

আমি পিয়ানোতে "হোম হোম সুইট্ হোম" গৎটা বাজিয়ে সুন্দররূপে গাইলুম দেখে ফরাসীরা অবাক হয়ে গেছে, যেন আমরা মানুষই নয়, ওদের মত কোন কাজ করা যেন আমাদের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ! এ ভুল কিন্তু ভাঙাতেই হবে।

হিণ্ডেনবার্গ লাইন

কি করি, কাজ না থাকলেও আমায় কাজ খুঁজে নিতে হয় ! কাল রাত্তিতে প্রায় দু-মাইল শুধু হামাগুঁড়ি দিয়ে গিয়ে ওদের অনেক তার কেটে দিয়ে এসেছি। কেউ এতটুকু টের পায় নি।

আমাদের "কমাণ্ডিং অফিসার" সাহেব বলেছেন,—'তুম্ কো বাহাদুরী মিল যায়েগা।'

আজ আমি "হাবিলদার" হলুম।

এ মন্দ খেলা নয় তো !

আবার সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ! এই দু-বছরে কত বেশী সুন্দর হয়ে গেছে সে ! সে-দিন সে সোজাসুজি বললে যে, (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গীরূপে পেতে চায় ! আমি বললুম,—'না, তা হতেই পারে না।'

মনে মনে বললুম,—'অন্ধের লাঠি একবার হারায়। আবার? আর না ! যা ঘা খেয়েছি, তাই সামলানো দায় !'

বিদেশিনীর নীল চোখ দুটো যে কি রকম জলে ভরে উঠেছিল, আর বুকটা

তার কি রকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা আমার মতো পাষাণকেও কাঁদিয়েছিল!

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—'তবে আমাকে ভালবাসতে দেবে তো? অন্ততঃ ভাই-এর মতো....'

আমি বেওয়ারিশ মাল। অতএব খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললুম,—'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' তারপর তার ভাষায় "অডিএ" (বিদায়!) বলে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসে নি! আমার শুধু মনে হচ্ছে,—সে-জন ফিরে না আর যে গেছে চলে! .. ওঃ—

যা হোক, আজ গুর্খাদের পেয়ে বেশ থাকা গেছে কিন্তু। গুর্খাগুলো এখনও যেন এক-একটা শিশু। দুনিয়ার মানুষ যে এত সরল হতে পারে, তা আমার বিশ্বাসই ছিল না। এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই "গাড়োয়াল", এই দুটো জাতই আবার যুদ্ধের সময় কি রকম ভীষণ হয়ে ওঠে। তখন এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা "শেরে বব্বর"! এদের "খুক্‌রী" দেখলে এখনও জার্মানরা রাইফ‍্‌ল্ ছেড়ে পালায়। এই দুটো জাত যদি না থাকত, তাহলে আজ এত দূর এগুতে পারতুম না আমরা। তাদের মাত্র কয় জন আর বেঁচে আছে। রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট একেবারে সাবাড়! অথচ যে দু-চার জন বেঁচে আছে, তারাই কি রকম হাসছে খেলছে। যেন কিছুই হয় নি!

ওরা যে মস্ত একটা কাজ করেছে, এইটেই কেউ এখনও ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারে নি! আর ঐ অত লম্বা চওড়া শিখগুলো, তারা কি বিশ্বাসঘাতকতাই না করেছে! নিজের হাতে নিজে গুলী মেরে হাসপাতালে গিয়েছে।

বাহবা! ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ন মার্চ হচ্ছে। ফ্রান্সের মধুর ব্যাণ্ডের তালে তালে কি সুন্দর পা-গুলো পড়ছে আমাদের! লেফট্—রাইট্—লেফট্! ঝপ—ঝপ—ঝপ। এই হাজার লোকের পা এক সঙ্গেই উঠছে, এক সঙ্গেই পড়ছে। কী সুন্দর!

বেলুচিস্তান

কোয়েটার দ্রাক্ষাকুঞ্জস্থিত

আমার ছোট্ট কুটীর

এ কি হল ! আজ এই আখরোট আর নাশপাতির বাগানে বসে বসে তাই ভাবছি।

আমাদের সব ভারতীয় সৈন্য দেশে ফিরে এল, আমিও এলুম। কিন্তু সে দুটো বছর কি সুখেই কেটেছে !

আজ এই স্বচ্ছ নীল একটু-আগে বৃষ্টির-জলে-ধোওয়া আস্‌মানটি দেখছি, আর মনে পড়ছে সেই ফরাসী তরুণীটার ফাঁক ফাঁক নীল চোখ দুটি। পাহাড়ে ঐ চমরী মৃগ দেখে তার সেই থোকা-থোকা কোঁকড়ান রেশমী চুলগুলো মনে পড়ছে। আর ঐ যে পাকা আঙুর ঢল-ঢল করছে, অমনি স্বচ্ছ তার তার চোখের জল !

আমি "অফিসার" হয়ে "সর্দার বাহাদুর" খেতাব পেলুম ! সাহেব আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। হায়, কে বুঝবে আর কাকেই বা বোঝাব, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসি নি। সিন্ধুপারে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাই নি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে— নিজেকে চাপা দিতে। আবার এইখানটাতেই, যেখানে কখনও আসব না মনে করেছিলুম, আসতে হল। এ কি নাড়ীর টান !····

আমার কেউ নেই, কিছু নেই, তবু কেন রয়ে রয়ে মনে হচ্ছে,— না, এইখানেই সব আছে। এ কার মূঢ় অন্ধ সান্ত্বনা ?

কারুর কিচ্ছু করি নি, আমারও কেউ কিচ্ছু করে নি, তবে কেন এখানে আসছিলুম না ? সে একটা অব্যক্ত বেদনার অভিমান,—সেটা প্রকাশ করতে পারছি নে !

হেনা !—হেনা ! সাবাস্‌ ! কেউ কোথাও নেই, তবুও ও-ধার থেকে বাতাস ভেসে আসছে ও কি শব্দ,— না—না—না।

পাহাড় কেটে নির্ঝরটা তেমনি বইছে, কেবল যার মেহেদী-রাঙানো পদরেখা এখনও ওর পাথরের বুকে লেখা রয়েছে, সেই হেনা আর নেই। এখানে ছোটোখাটো কত জিনিস পড়ে রয়েছে, যাতে তার কোমল হাতের ছোঁওয়ার গন্ধ এখনও পাচ্ছি।

হেনা! হেনা! হেনা!...আবার প্রতিধ্বনি, না—না—না!

পেশোয়ার

পেয়েছি, পেয়েছি! আজ তার দেখা পেয়েছি। হেনা! হেনা! তোমাকে আজ দেখেছি এইখানে, এই পেশোয়ারে।

তবে কেন মিথ্যা দিয়ে এত বড় একটা সত্যকে এখনও ঢেকে রেখেছ? সে আমায় লুকিয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে।...কিছু বলেনি, শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে!...

এ রকম দেখায় যে অশ্রু প্রাণের শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে আজও বললে, সে আমায় ভালবাসতে পারে নি।...

ঐ "না" কথাটা বলবার সময়, সে কি করুণ একটা কান্না তার গলা থেকে বেরিয়ে ভোরের বাতাসটাকে ব্যথিয়ে তুলেছিল।

দুনিয়ার সব চেয়ে মস্ত হেঁয়ালী হচ্ছে—মেয়েদের মন।

কাবুল

ডাক্‌কা ক্যাম্প

যখন মানুষের মত মানুষ আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান্ শহীদ হয়েছেন শুনলুম, তখন আমার মনে হল এত দিনে হিন্দুকুশের চূড়াটা ভেঙে পড়ল! সুলেমান পর্বত জড়সুদ্ধ উথড়িয়ে গেল!

ভাবতে লাগলুম, আমার কি করা উচিত? দশ দিন ধরে ভাবলুম। বড্ডো শক্ত কথা।

নাঃ, আমীরের হয়ে যুদ্ধ করাই ঠিক মনে করলুম। কেন? এ "কেন"র উত্তর নেই। তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি, আমার এবার এ-যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না।

আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।

সেদিন ভোরে ডালিম ফুলের গায়ে কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল! ওঃ, সে যেন আমারই মত আরও অনেকের বুকের খুন-খারাবী।...

উদার আকাশটা কেঁদে কেঁদে একটুর জন্যে থেমেছে! তার চোখটা এখনও খুব ঘোলা, আবার সে কাঁদবে; কার সে বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর কোয়েলীটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করঞ্জ করে ফেলেছিল, আর তার "উহু-উহু" শব্দ প্রভাতের ভিজে বাতাসে টোল খাইয়ে দিচ্ছিল! শুকনো নদীটার ও-পারে বসে কে শানাইতে আশোয়ারী রাগিণী ভাঁজছিল। তার মীড়ে মীড়ে কত যে চাপা হৃদয়ের কান্না কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তা সবচেয়ে বেশী বুঝছিলুম আমি। মেহেদী ফুলের তীব্র গন্ধে আমাকে মাতাল করে তুলেছিল!

আমি বললুম,—'হেনা আমীরের হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর ফিরে আসব না। বাঁচলেও আসব না।'

সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে,—'সোহ্‌রাব্—প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি! আজ আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে "আশেক"কে কষ্ট দেব না।...'

আমি বুঝলাম, সে বীরাঙ্গনা—আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হয়েও আমি শুধু পরদেশীর জীবন যাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল।

ওঃ, রমণী তুমি! কি করে তবে নিজেকে এমন করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা?

কী অটল ধৈর্যশক্তি তোমার! কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হতে পারে!....

পাঁচ-পাঁচটা গুলী এখনও আমার দেহে ঢুকে রয়েছে! যতক্ষণ না সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েছিলুম, ততক্ষণ সৈন্যদের কী শক্ত করেই রেখেছিলুম।

খোদা, আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা করেছি, একে যদি শহীদ হওয়া বলে, তবে আমি "শহীদ" হয়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

আমি চলে এলুম। হেনা ছায়ার মতো আমার পিছু-পিছু ছুটল। এত ভালবাসা, পাহাড়-ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মতো এত প্রেম কি করে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা? ··

আমীর তাঁর ঘরে আমার আসন দিয়েছেন। আজ আমি তাঁর সেনাদলের একজন সর্দার।

আর হেনা? হেনা!—ঐ যে সে আমায় আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ····এখনও তার বুক কিসের ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখনও বাতাস ছাপিয়ে তার নিঃশ্বাসে উঠছে একটা মস্ত অতৃপ্তির বেদনা।

আহা, আমার অভাগাও বড্ডো বেশী জখম হয়েছে।—ঘুমিয়েছে, ঘুমুক! —না-না, দুই জনেই ঘুমুব। এত বড় তৃপ্তির ঘুম থেকে জাগিয়ে আর বেদনা দিও না খোদা!

হেনা! হেনা!—না—না—আঃ!

এক নিমেষের চেনা

বৃষ্টির ঝম-ঝমানি শুনতে শুনতে সহসা আমার মনে হল, আমার বেদনা এই বর্ষার সুরে বাঁধা।

সামনে আমার গভীর বন। সেই বনে ময়ূরে পেখম ধরেছে, মাথার ওপর বলাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোটা কদম ফুলে কার শিহরণ কাঁটা দিয়ে উঠছে, আর কিসের ঘন-মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হয়ে সারা বনের গা টলছে! ··

এটা শ্রাবণ মাস, না?—আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে।

সে হল আজ তিন বছরের কথা। আমার এই থাপ-ছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মতো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। কখনও তার একটি কথা মনে পড়ে, কখনও আধখানি ছোঁওয়া আমার দাগা-পাওয়া বুকে জাগে। মানসবনের যুঁই-কুঁড়ি আমার ফুটতে গিয়ে ফুটতে পায় না, শিউলির বোঁটা শিথিল হয়ে যায়। ওরই সাথে এই শাঙন-ঘন দেয়াগরজনে আর এক দিনের অমনি মেঘের ডাক মনে পড়ে, আর আঁখি আমার আপনি জলে ভরে ওঠে।

সে-দিন ছিল আজকার মতই শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী। পথহারা আমি ঘুরতে ঘুরতে যে-দিন প্রথম এই কালিঞ্জরে এসে পড়ি, সে-দিন এখানে কাজ্‌রী উৎসবের মহা ধুম পড়ে গেছে। আকাশভরা হালকা জলো মেঘ আমারই মত খাপছাড়া হয়ে যেন আকুল আকাশে কূল হারিয়ে ফিরছিল। তারই ঈষৎ ফাঁকে সুনীল গগনের এক ফালি নীলিমা যেন কোন্ অনন্ত-কান্নারত প্রেয়সীর কাজলমাখা কালো চোখের রেখার মত করুণ হয়ে জাগছিল! পথ চলার নিবিড় শ্রান্তি নিয়ে কালিঞ্জরের উপকণ্ঠের বাঁকে উপবনে পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। এই হঠাৎ-দেখাতেই কেন আমার মনে

হল, এ-মুখ যে আমার কত কালের চেনা—কোথায় যেন একে হারিয়েছিলাম। সেও আমার পানে চেয়ে আমার চাওয়ায় কি দেখতে পেলে সেই জানে,—তাই পথ চলতে চলতে তার হাতের কচি ধানের ছোট্ট গোছাটি মুখের ওপর আধ-আড়াল করে আমায় জিজ্ঞেস করলে,—পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাঁহা?

সে স্বর আমার বাইরে ভিতরে এক ব্যাকুল রোমাঞ্চ দিয়ে গেল, বুকের সমস্ত রক্ত আকুল আবেগে কেঁপে কেঁপে নৃত্য করে উঠল!

এ কোন্ চির-পরিচিত স্বর। এ কে ছলনা করে আমায়? পূবের হাওয়া আমার পাশ দিয়ে কেঁদে গেল—'হায় গৃহহীন, হায় পথহারা!' ঝড়ে-উড়া এক দল পলকা মেঘের মত মল্লারের সুরে পথের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে কাজ্‌রী গায়িকা রূপসীরা গেয়ে যাচ্ছিল,—ঘুঙ্‌ঘট-পট খোলো আরে সাঁবলিয়া।—ওগো শ্যামল, এখন তোমার ঘোমটা খুলে ফেল!

আমার কাছে তাকে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তরুণীরা আঁখির পলকে থমকে দাঁড়াল, তারপর চুল ছড়িয়ে বাহু দুলিয়ে আঁচল উড়িয়ে বলে উঠল,—'কাজরীয়া গে! ক্যা তোরি সাঁবলিয়া আ গয়ি?'

সে তাদের একপাশে সরে গিয়ে কাঁপা গলায় বললে,—'নহি রে সজ্‌নিয়া, নহি! য়ো পর্‌দেশী জোয়ান্‌....'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে উঠল,—'ক্যা তেরি দিল ছিন্‌ লিয়া?'

সে লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারল না, খামখা আমার দিকে অনুযোগ-তিরস্কার-ভরা বাঁকা চাউনি হেনে চলে গেল!

পথের ঐ বাঁক থেকেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তাদের ধানী রঙ-এর শাড়ির ঢেউ আর আশমানী রঙ-এর ওড়নার আকুল প্রান্ত। রয়ে রয়ে তাদের এলানো কেশপাশ বেয়ে কেমন মধুর এক সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছিল! অতগুলি সুন্দর মুখের মাঝ থেকে আমার মনে জগ-জগ করছিল শুধু ঐ কাজ রিয়ার ছোট্ট কালো মুখ,—যা শিল্পীর হাতের কালো-পাথর-কোঁদা দেবীমুখের মত নিটোল! বিজলী চমকের মত তার ঐ যে

একটি দুরন্ত চপল গতি, তারই মধুরতাটুকু আমার মনের মেঘে বারে-বারে তড়িৎ হেনে যাচ্ছিল।

পথের পাশের দোলনা-বাঁধা দেবদারু-তলায় দাঁড়িয়ে আমার শুধু এই কথাটিই মনে হতে লাগল, এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন করে মানুষ এত চির-পরিচিত হয়ে যেতে পারে।

·

অভিমানের দেখা-শোনা

তার পরের দিন আমলকী বনে দাঁড়িয়ে সেই আগেকার দিনের কথাটাই ভাবছিলাম,—আচ্ছা, এই যে আমার মানসী বঁধূ—একে কবে কোন্ পূরবীর কান্না-ভরা খেয়ার-পারে হারিয়ে এসেছিলাম? সকল স্মৃতি ওলট-পালট করেও তার দিনক্ষণ মনে আসি-আসি করেও যেন আসে না, অথচ মনের-মানুষ-আমার একে দেখেই কেমন করে চিনে ফেললে। তাই সে আমার আঁখির দীপ্তিতে ফুটে উঠে বলে উঠল,—এই তো আমার চির-জনমের চাওয়া তুমি! ওগো, এই তো আমার চির-সাধনার ধন তুমি!....

আর একবার আমার স্মৃতির অতল তলে ডুব দিলাম, এমন সময় ঝড়ের সুরে কাজ্‌রী গান গাইতে গাইতে রূপসী নাগরীরা আমার পাশ বেয়ে উধাও হয়ে গেল,

'চড়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হোরি।
রিম ঝিম রিম ঝিম পানি বরষৈ রহি রহি জিয়া ঘাববাবৈ রামা
বহৈ নয়নাসে নীর ময়েল্ ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি।'

[ঘোর ঘটা করে গগনে মেঘ করেছে, বাদল গরজন করছে, রিম-ঝিম রিম-ঝিম বৃষ্টি ঝরছে, থেকে থেকে জান আমার ঘাবড়িয়ে উঠছে, নয়ন বেয়ে আঁসু ঝরছে ওগো, চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল!]

বর্ষার মেঘ চলে গেল। মর্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুমরে ফিরতে লাগল,—'ময়েল ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি!'—ওগো প্রিয়, চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল! সে কোন্ অচেনার উদ্দেশে এ অবুজ-কান্না

তোমার, ওগো বিদেশিনী? সে কথা সেও জানে না, তার মনও জানে না…

আবার সেই সন্তাপহারী আমার চিরবাঞ্ছিত মেঘ গুরু-গরজনে ডেকে উঠল! বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে ময়ূরের কেকাধ্বনির সাথে চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন রণিয়ে রণিয়ে উঠেছিল,—দে জল, দে জল! হায়রে চিরদিনের শাশ্বত পিয়াসী!! তোর এ অনন্ত পিয়াসা কি সারা সাগরের জলেও মিটল না?

আমার কেমন আবছা এক কণা স্মৃতি মনের কানে বলছিল,—তুমি আগে এমনই চাতক ছিলে, তোমার পিপাসা মিটবার নয়!

ভেজা মাটির আর খস-খস-এর গুমোট-ভরা ভারী গন্ধে যেন দম আটকে যাচ্ছিল; ও-ধারে ফোটা কেয়া ফুলের, আধফোটা যুথির বেলীর কুঁড়ির, ঝরা শেফালী-বকুলের দিলমাতানো খোশ্‌বুর মাঝে মাঝে পদ্ম আর কদম্বের স্নিগ্ধ সুরভি মধুর আমেজ দিচ্ছিল! বর্ষার ব্যথা আমার দিকে গভীর মৌন চাওয়া চেয়ে শুধাচ্ছিল,—

'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।'

হায়, কি বলা যায়? কাকে বলা যায়? এ উতল-পাগল তার কিছুই জানে না, অথচ সে কি যেন বলতে চায়—কাকে যেন বুকের কাছে পেতে চায়! এই মেঘদূত তার কাছে তার পালিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার সন্ধান করে গেছে, তাই সেই চাওয়া-পাওয়া টুকুর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই সে মেঘদূতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে,—

'এস হে সজল ঘন বাদল-বরিষণে।'

আজ আর একবার মনে হল সে তার বিদায়ের দিনে বলেছিল,—আবার দেখা হবে, তখন হয়তো তুমি চিনতে পারবে না!

আজ সেই বিদায়-বাণী মনে পড়ে আমার বক্ষ কান্নায় ভরে উঠেছে! আমার পাশ দিয়ে কালো কাজ্‌রিয়া যখন তার চাউনি হেনে চলে গেল, তখন ঐ কথাটিই বারে বারে মনে পড়ছিল,—হয়তো তুমি চিনতে পারবে না!

তাই কাজ্‌রিয়াকে ডেকে বললাম,—এই তো তোমায় চিনতে পেরেছি তোমার এই চোখের চাওয়ায়!

কাজ্‌রিয়া চুল দিয়ে মুখ ঝেঁপে চলে গেল। তার ঐ না-চাওয়াই বলে গেল, সেও আমায় চিনতে পেরেছে।....

আবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। ঝঞ্ঝার উতরোলের মত দোল খেয়ে খেয়ে পাশের উপবন হতে তরুণী কণ্ঠের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসছিল—

মেঘবা ঘুম্‌ ঘুম্‌ বরষাবৈ ছাবৈ ছাবৈ বদরিয়া শাঙন মে!

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আকাশ বেয়ে হাজার পাগলা-ঝরা ঝরছে—ঝম ঝম ঝম! যেন আকাশের আঙিনায় হাজার হাজার দুষ্টু মেয়ে কাঁকরভরা মল বাজিয়ে ছুটোছুটি করছে! তপোবনে গিয়ে দেখলাম, সেই বৃষ্টিধারায় ভিজে ভিজে মহা উৎসাহে বিদেশিনী তরুণীরা দেবদারু ও বকুল শাখায় ঝুলানো দোলনায় দোল খেয়ে খেয়ে কাজ্‌রী গাইছে! ঝড়-বৃষ্টির সাথে সে কী মাতামাতি তাদের! আজ তাদের কোথাও বন্ধন নেই, ওদের প্রত্যেকেই যেন এক একটা পাগলিনী প্রকৃতি! কী সুন্দর সেই প্রকৃতির উদ্দাম চঞ্চলতার সনে মানব-মনের আদিম চির-যৌবনের বন্ধ-হারা গতি-রাগের মিলন!—শাঙন মেঘের জমাট সুরে আমার মনের বীণায় মূর্ছনা লাগল। আবার যৌবন-জোয়ারও অমনি ঢেউ খেলে উঠল। মনের পাগল অমনি করে দোদুল দোলায় দুলে সুন্দরীদের এলো চুলের মতই হাওয়ার বেগে মেঘের দিকে ছুটল,—হায়, কোথায়, কোন্‌ সুদূরে তার সীমারেখা!

হিন্দোলার কিশোরীরা গাচ্ছিল কাজল-মেঘের আর নীল আকাশের গান! নীচে শ্যামল দুর্বায় দাঁড়িয়ে বিনুনী-বেণী-দোলানো সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান! তাদের প্রাণে মেঘের কথার ছোঁওয়া লেগেছিল! মেঘের এই মহোৎসব দেখে আপনি আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল। দেখলাম সেই কালো কাজ্‌রিয়া—দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে এক নিমিষে দোলনায় উঠে কয়ে উঠলো,—সজ্‌নিয়া গে, ওহি সুন্দর পরদেশিয়া! তার সই মতিয়া দুলতে দুলতে বাদল-ধারায় এক রাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল,—হা রে কাজ্‌রিয়া তুহার সাঁবলিয়া!

কাজ্‌রিয়া মতিয়ার চুল ধরে টেনে ফেলে দিয়ে পাশের বকুল গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল!

আমি ভাবছিলাম, এমনি করেই বুঝি মেঘে আর মানুষে কথা কওয়া যায়! এমনি করেই বুঝি ও-পারের বিরহী যক্ষ মেঘকে দূতী করে তার বিচ্ছেদ-বিধুরা প্রিয়তমাকে বুকের ব্যথা জানাত! আমার ভেজা-মন তাই কালো মেঘকে বন্ধু বলে নিবিড় আলিঙ্গন করলে!

চমকে চেয়ে দেখলুম, সে কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে! তার গভীর অপলক দৃষ্টি মেঘ পেরিয়ে কোন্ অনন্তের দিগ্বলয়ে পৌঁছেছিল, সে-ই জানে। তার পাশে থেকে আমারও মনে হল ঐ দূর মেঘের কোলে দাঁড়িয়েছি শুধু সে আর আমি। কেউ কোথাও নেই, উপরে-নীচে আশে পাশে শুধু মেঘ আর মেঘ,—সেই অনন্ত মেঘের মাঝে সে মেঘের বরণ বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে তার মেঘলা দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে! ঐখানেই ঐ চেনা-শোনা জায়গাটিতেই যেন আমাদের প্রথম দেখাশুনা, ঐখানেই আবার আমাদের অভিমানের ছাড়াছাড়ি, এই কথাটা আমাদের দুই জনেরই মনের অচিন কোণে ফুটে উঠতেই আমরা একান্ত আপনার হয়ে গেলাম। যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হত না, ঝড়-বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নিমেষে চারিটি চোখের অনিমিখ চাউনিতে'তা কওয়া হয়ে গেল!....আমি বললাম,—কাজ্‌রি আমি অনেক জীবনের খোঁজার পর তোমায় পেয়েছি! এই মেঘের ঝরায় যে প্রাণের কথা প্রাণ দিয়ে সে শুনছিল, সহসা তাতে বাধা পেয়ে সে সচেতন হয়ে উঠল। চখা হরিণীর মতো ভীত ত্রস্ত চাওনি দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচমকা আর্ত আকুল স্বরে কেঁদে উঠল! আর দাঁড়াল না, হুঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলে! যেতে যেতে বলে গেল,—নহি রে সুন্দর পরদেশী, ম্যয় কারী কাজ্‌রিয়া হুঁ—ওগো সুন্দর বিদেশী, আমি কালো! আরও কি বলতে বলতে অভিমানে ক্ষোভে তার মুখে আর কথা ফুটল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

একটি পুরো বছর আর তার দেখা পাই নি!....

আজ শাওন রাতের মাতামাতিতে হৃদয় আমার কথায় আর ব্যথায় ভরে উঠেছে, আর তার সেই বিদায়-দিনের আরও অনেক কিছু মনে পড়ছে। আজ আমার শিয়রের ক্ষীণ দীপ-শিখাটিতে বাদল-বায়ের রেশ লেগে তাকে

কাঁপিয়ে তুলছে, আমার বিজন কক্ষটিতে সেই কাঁপুনি আমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে,—হায়, আজ তেমন করে আঘাত দেবারও আমার কেউ নেই! প্রিয়তমের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত নিবিড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝবে? যার নিজের বুকে বেদনা বাজে নি, সে পরের বেদনা বুঝবে না, বুঝবে না!

সে বলেছিল,—দেখ বিদেশী পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজ্‌রিয়া বলে উপহাস করে। তাদের সে আঘাত আমি সইতে —উপেক্ষা করতে পারি, আমার সে সহ্যশক্তি আছে,—কিন্তু ওগো নিঠুর! তুমি কেন আমায় ভালবাসি বলে উপহাস করছ? ওগো সুন্দর শ্যামল! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে আঘাত করছ? এ অপমানের দুর্বার লজ্জা রাখি কোথায়? জানি, আমি কালো কুৎসিত, তাই বলে ওগো পরদেশী, তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এমন করে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করবার? ছি-ছি; আমায় ভালবাসতে নেই—ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে পারবে না! এমন করে আর আমার দুর্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না শ্যামল, দিও না! ও তো আমার অপমান নয়, ও যে আমার ভালবাসার অপমান; তা কেউ সইতে পারে না। বিদায় শ্যামল, বিদায়!

আমি মনে মনে বললাম,—ওগো অভিমানিনি! অভিমানের গাঢ় বিক্ষোভ তোমায় অন্ধ করেছে, তাই তুমি সকল কথা বুঝেও বুঝছ না। আমিও যে তোমার মতই কালো! তুমি তো নিজ মুখেই আমায় শ্যামল বলেছ, অথচ সুন্দর বলছ কেন? তোমার চোখে তুমি আমায় যেমন সুন্দর দেখেছ, আমার চোখে আমিও তেমনি তোমার সৌন্দর্য দেখেছি। তোমার ঐ কালো রূপেই আমার চির-আকাঙ্ক্ষিতাকে খুঁজে পেয়েছি যেন সে কোন্ অনাদি যুগের অনন্ত অন্বেষণের পর। আর যদি অধিকারই না থাকে, তবে তুমি কারুর আঘাতে বেদনা পেলে না, অথচ আমার স্নেহ সইতে পারলে না কেন? আমারই উপরে বা তোমার কি দাবী পেয়েছ, যার জোরে সবারই আঘাত-বেদনাকে উপেক্ষা করতে পার, শুধু আমাকেই পার না? আমার বক্ষ দলিত করে কি করে আমায় এমন ছেড়ে যেতে পারছ? যার ভালবাসায়

বিশ্বাস নেই, তার ওপর তো অভিমান করা চলে না ! যাকে বুঝি, আর আমার দাবী আছে যে, আমার অভিমান এ সহ্য করবে, তারই ওপর অভিমান আসে, তারই ওপর রাগ করা যায়। আমার যে তখন মস্ত বিশ্বাস থাকে, সে আমার এ অহেতুক অভিমানের আব্দার সহ্য করবেই, কেননা সে যে আমায় ভালবাসে ! ··

সে কোনো কথা বুঝল না, চলে গেল। এ তীব্র অভিমান যে তার কার ওপর, সে নিজেই বলতে পারত না, তবে কতকটা যেন তার এই কালো রূপের স্রষ্টার ওপর। আর বুক-ভরা অভিমান আহত পক্ষী-শাবকের মত যেন সেই দুর্বোধ রূপ-স্রষ্টার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছিল,—ওগো, আমাকেই কি সারা দুনিয়ার মাঝে এমন করে কালো কুৎসিত করে সৃষ্টি করতে হয় ? তোমার কুম্ভ-ভরা রূপের একটি রেণু এ-অভাগীকে দিলে কি তোমার ভরা-কুম্ভ খালি হয়ে যেত ? যদি কালো করেই সৃষ্টি করলে, তবে ঐ অন্ধকারের মাঝে আলোর মত ভালবাসা দিলে কেন ? আবার অন্যেরে দিয়ে ভাল-বাসিয়ে লজ্জিত কর কেন ? ·· হায়, সে যে কখনও বোঝে নি যে, সত্য-সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে—দেহে নয়, অন্তরে !

আমি সে-দিনই একটা নতুন জিনিস দেখেছিলাম যে, যতদিন সে কারুর ভালবাসা পায় নি, ততদিন তার সারা জনমের চাপা অভিমান এমন বিক্ষুব্ধও হয়ে ওঠে নি ; কিন্তু যেই সে বুঝলে কেউ তাকে ভালবেসেছে, অমনি তার কান্না-ভরা অভিমান ঐ স্নেহের আহ্বানে দুর্জয় বেগে হাহাকার করে গর্জন করে উঠল ! এই ফেনিয়ে-ওঠা অভিমানের জন্যই সে যাকে ভালবাসে, তাকে এড়িয়ে গেল। একক ভালবাসায় যে প্রিয়তমাকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ ! এ বেদনা আনন্দের মাধুরী আমার মতো আর কেউ বোঝেনি। হায়, আমার মনের এত কথা বুঝি মনেই মরে গেল ! এ জীবনে আর তা বলা হবে না।

তার পর-বছরের কথা।

কাজ্‌রিয়ার সঙ্গে আবার আমার দেখা হ'লো মির্জাপুরের পাহাড়ের বুকে বিরগী নামক উপত্যকায়। সে-দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া। সে-দিনও

মেঘে আঁধারে কোলাকুলি করছিল! সে-দিন ছিল কাজ্‌রী উৎসবের শেষ দিন! সে-দিন বাদল মেঘ ধানের ক্ষেতে তার শেষ বিদায়-বাণী শোনাচ্ছিল, আর নবীন ধানও তার মঞ্জরী দুলিয়ে কেঁপে-কেঁপে বাদলকে তার শেষ অভিনন্দন জানাচ্ছিল। হায়, এদের কেউ জানে না, আবার কোন মাঠে কোন তালী-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন করে দেখা-শোনা হবে! আজ সুন্দরীদের চোখের কাজল মলিন, তাদের সুরে কেমন একটা ব্যথিত ক্লান্তি, সুন্দর ছোট্ট মুখগুলি রোদের তাপে শালের কচি পাতার মত ম্লান—এলানো! কাল যে এই সারা-বছরের চাওয়া বাদল-উৎসবের বিসর্জন, এইটাই তাদের এত আনন্দকে বারে-বারে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছিল। কে জানে তাদের এই সখীদের এমনি করে পর-বছর আবার দেখা হবে কিনা! হয়তো এরই মাঝের কত চেনা মুখ কোথায় মিশিয়ে যাবে, সারা দুনিয়া খুঁজেও সে-মুখ আর দেখতে পাবে না!

দোলনার সোনালী রঙ-এর ডোরকে উজ্জ্বলতর করে বারে বারে ছুরি-হানার মত বিজুরী চমকে যাচ্ছিল! কাজ্‌রী ছুটে এসে আমার ডান হাতটি তার দু-হাতের কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে বুকের উপর রাখলে, তারপর বললে,—ওগো পরদেশী শ্যামল, তোমায় আমি চিনেছি! তুমি সত্য। তুমি আমায় ভালবাস! নিশ্চয় ভালবাস সত্যি ভালবাস।

দেখলাম, তার শীর্ণ চোখের উজ্জ্বল চাউনিতে গভীর ভালবাসার ছল-ছল জ্যোতি শরৎ-প্রভাতের জল-মাখা রোদ্দুরের মতো করুণ হাসি হেসেছে! আহ্‌, এত দিনের বিরহের কঠোর তপস্যায় সে তার সত্যকে চিনতে পেরেছে! তার ছিন্ন মলিন তনুলতার দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার চোখের জল সামলানো দায় হয়ে উঠলো! এক বিন্দু অসম্বরণীয় অবাধ্য অশ্রু তার পাণ্ডুর কপোলে ঝরে পড়তেই সে আমার পানে আর্ত-দৃষ্টি হেনে ঐখানেই বসে পড়লো! বকুল-শাখা আর শিউলি পাতা তার মাথায় ফুল-পাতা ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল! মতিয়া বললে, এবারও সে অনেক আশা করে আগের বছরের মতোই শ্রাবণ-পঞ্চমীর ভোরে কাজ্‌রী গেয়ে যমুনা-সিনানে গিয়ে সেখানকার মাটি দিয়ে ধানের অঙ্কুর উদগম করেছিল। সেই অঙ্কুরগুলি সে নিবিড় যতনে তাঁর ছিন্ন ভেজা ওড়না দিয়ে আজও ঢেকে রেখেছে। সে রোজই

বলত,—মতিয়া রে, এবার আমার পরদেশী বঁধু আসবে। ঐ যে শুনতে পাচ্ছি তার পথিক-গান।

আজ ভাদ্র-তৃতীয়াতে "নবীন ধানের মঞ্জরী" নিয়ে কতকগুলি সে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে, আর কয়েকটি শিষ এনেছে আমাকে উপহার দিতে!

আমি তার হাতে নাড়া দিয়ে বললাম,—কাজ্‌রী, আজ আমায় ছেড়ে যেও না।

শুষ্ক অধর-কোণে তার আধ টুকরো ম্লান হাসি ফুটতে ফুটতে মিলিয়ে গেল। সে অতিকষ্টে তার আঁচল থেকে বহু যত্নে রক্ষিত ধানের সবুজ শিষ ক'টি বের করে একবার তার দুটি জল-ভরা চোখের পূর্ণ চাওয়া দিয়ে আমার পানে চেয়ে দেখলে, তারপর আমার স্কন্ধদেশে ক্লান্ত বাহু দু'টি থুয়ে আমার কর্ণে শিষগুলি পরিয়ে দিলে। একটা গভীর তৃপ্তির দীঘল শ্বাসের সঙ্গে পবিত্র একরাশ হাসি তার চোখে-মুখে হেসে উঠল! দেখে বোধ হল, এমন প্রাণ-ভরা সার্থক হাসি সে যেন আর জন্মে হাসে নি!

আবার একটু পরেই কি মনে হ'য়ে তার সারা মুখ ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে উঠল। সহসা চিৎকার করে সে কয়ে উঠল,—না, শ্যামল, না,—আমাকে যেতেই হবে। তোমার এই বুক-ভরা ভালবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে আমায় বিদায় নিতে দাও!

কোলের উপর তার শ্রান্ত মাথা লুটিয়ে পড়ল। চির-জনমের কামনার ধনকে আমার বুকের ওপরে টেনে নিলাম। আকুল ঝঞ্ঝা উন্মাদ বৃষ্টিকে ডেকে এনে আমায় ঘিরে আর্তনাদ করে উঠল,—ওহ্! ওহ্! ওহ্।

আমার মনে হয়, চাওয়ার অনেক বেশী পাওয়ার গর্বই তাকে বাঁচতে দিলে না! সে মরণ-ত্যাগী হয়ে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চলে গেল। এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আর এক পথে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে!....কালো মানুষ বড্ডো চাপা অভিমানী। তাদের কালো রূপের জন্য তারা মনে করে, তাদের কেউ ভালবাসতে পারে না। কেউ ভালবাসছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

এ-বছরও তেমনি শাঙন এসেছে। আজও আমার সেই প্রথম-দিনে-শোনা কাজ্‌রী গানটি মনে পড়েছে,—ওগো শ্যামল, তোমার ঘোমটা খোল! হায় রে পরদেশী সাঁবলিয়া! তোমার এ অবগুণ্ঠন আর জীবনে খুলল না, খুলবে না!....

আজ যখন আমার ক্লান্ত আঁখির সামনে আকাশ-ভাঙা ঢেউ ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, পূরবী-বায় হু-হু করে সারা বিশ্বের বিরহ কান্না কেঁদে যাচ্ছে, নীরেট আঁধার ছিঁড়ে ঝড়ের মুখে উগ্র মল্লারের তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে,—ওগো, সামনে আমার পথ নেই—পথ নেই! অনন্ত বৃষ্টির আকুল ধারা বইছে।—এমন সময় কোথায় ছিলে ওগো প্রিয়তম আমার! এ বছরের মেঘ-বাদলে এমন করে আমায় যে দেখা দিয়ে গেলে, আমার প্রাণে যে কথা কয়ে গেলে! হারানো প্রেয়সী আমার! তোমার কানে-কানে-বলা গোপন গুঞ্জন আমি এই বাদলে শুনেছি, শুনেছি।

এই তোমার টাটকা-ভাঙা রসাঞ্জনের মতো উজ্জ্বল নীল গাঢ় কান্তি! ওগো, এই তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ সজল রূপ আমার চোখে অঞ্জন বুলিয়ে গেল! ওগো আমার বারে-বারে হারানো মেঘের দেশের চপল প্রিয়! এবার তোমায় অশ্রুর ডোরে বেঁধেছি! এবার তুমি যাবে কোথা? লোহার শিকলে বারে-বারে কেটেছ তুমি মুক্ত-বনের দুষ্ট-পাখি,—তাই এবার তোমায় অশ্রুর বাঁধনে বেঁধেছি, তাকে ছেদন করা যায় না। ঐ ঘন নীল মেঘের বুকে, এই সবুজ কচি দূর্বায়, ভেজা ধানের গাছের রসে তোমায় পেয়েছি। ওগো শ্যামলী! তোমার এ শ্যাম শোভা লুকাবে কোথায়? ঐ সুনীল আকাশ, এই সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্ত—এতেই যে তোমার বিলি দেওয়া চিরন্তন শ্যামরূপ লুটিয়ে পড়ছে। তাই আজই এ শ্রাবণ-প্রান্তে ধানের মাঝে বসে গাইছি,—

'আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !'

যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখনও বৃষ্টির ধারা বাঁধ-ছাড়া অযুত পাগলা-ঝরার মত ঝরে ঝরে পড়ছে—ঝন্ ঝম্ ঝম্ ! এত জলও ছিল আজিকার মেঘে ! আকাশ-সাগর যেন উলটে পড়েছে, এ বাদল-বরিষণের আর বিরাম নেই, বিরাম নেই !....

বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে দেখলাম, আঁখির আগে আমার নীলোৎপলপ্রভ মানস-সরোবরে ফুটে রয়েছে সরোবর-ভরা নীল-পদ্ম !

আজ্‌হারের কথা

আফ্রিকা

সাহারার মরুস্থান-সন্নিহিত ক্যাম্প

ঘুম ভাঙলো। ঘুমের ঘোর তবু ভাঙলো না……নিশি আমার ভোর হল, সে স্বপ্নও ভাঙলো—আর তার সঙ্গে ভাঙলো আমার বুক!

কিন্তু এই যে তার শাশ্বত চিরন্তন স্মৃতি, তার আর ইতি নেই। না-না, মরুর বুকে ক্ষীণ একটু ঝরণা-ধারার মত এই অম্লান স্মৃতিটুকুই তো রয়েছে আমার শূন্য বক্ষ স্নিগ্ধ-সান্ত্বনায় ভরে! বয়ে যাও ওগো আমার ঊষর মরুর ঝরণা-ধারা বয়ে যাও এমনি করে বিশাল সে এক তৃপ্ত শূন্যতায় তোমার দীঘল রেখায় শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়া রেখে! দুর্বল তোমার এই পূত-ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছে বিরাট কোন এক মরু ভূ প্রান্তরকে, তা তুমি নিজেও জান না,—তবু বয়ে যাও ওগো ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণীর নির্মল ধারা, বয়ে যাও!

নিশি-ভোরটা নাকি বিশ্ববাসী সবার কাছেই মধুর, তাই এ-সময়কার টোড়ি রাগিণীর কল-উচ্ছ্বাসে জাগ্রত নিখিল অখিলের পবিত্র আনন্দ-সরসী-সলিলে ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মত যেন সঞ্চরণ করে বেড়ায়,—কিন্তু আমার নিশি ভোর না হলেই ছিল ভাল। এ আলো আমি আর সইতে পারছি নে,—এ যে আমার চোখ ঝলসিয়ে দিলে! একি অকল্যাণময় প্রভাত আমার!

ভোর হল। বনে বনে বিহগের ব্যাকুল কূজন বনান্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনির রেশ রেখে এল! সবুজ শাখীর শাখায় শাখায় পাতার কোলে ফুল ফুটল! মলয় এল বুলবুলির সাথে শিস দিতে দিতে। ভ্রমর এল পরিমল আর পরাগ মেখে শ্যামার গজল-গানের সাথে হাওয়ার দাদ্‌রা তালের তালে তালে নাচতে-নাচতে। কোয়েল দোয়েল পাপিয়া সব মিলে সমস্বরে গান ধরলে,—

'ওহে সুন্দর মরি মরি!
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি!'

অচিন কার কণ্ঠ-ভরা ভৈরবীর মীড় মোচড় খেয়ে উঠল—'জাগো পুরবাসী!' সুষুপ্ত বিশ্ব গা-মোড়া দিয়ে তারই জাগরণের নাড়া দিলে,—

'তুমি সুন্দর, তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।'

—পড়ে রইলুম কেবল আমি উদাস আনমনে, আমার এই অবসাদভরা বিষণ্ণ-দেহ ধরার বুকে নিতান্ত সঙ্কুচিত গোপন ক'রে—হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুদ্ধ অশ্রুর মতো। অথচ এই যে এক বিন্দু অশ্রুর খবর, তা উষা-বালা নিজেই জানে না, গত নিশি খওয়াবের খামখেয়ালীতে কখন সে কার বিচ্ছেদ-ব্যথা কল্পনা করে কেঁদেছে, আর তারই এক রতি স্মৃতি তার পাণ্ডুর কপোলে পূত ম্লানিমার ঈষৎ আঁচড় কেটে রেখেছে!

ঘুমের ঘোর টুটলেই শোর ওঠে,—ঐ গো ভোর হল! জোর বাতাসে সেই কথাটি নিভৃত সব কিছুর কানে-কানে গুঞ্জরিত হয়। সবাই জাগে—ওঠে—কাজে লাগে। আমার কিন্তু ঘুমের ঘোর টুটেও উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখনও আফসোসের আঁসু আমার বইছে আর বইছে।

সব দোরই খুলল, কিন্তু এ উপুড়-কথা গোরের দোর খুলবে কি করে?—না, তা খোলাও অন্যায়, কারণ এ গোরের বুকে আছে শুধু গোর-ভরা কঙ্কাল আর বুক-ভরা বেদনা, যা শুধু গোরের বুকেই থেকেছে আর থাকবে। দাও ভাই তাকে পড়ে থাকতে দাও এমনি নীরবে মাটি কামড়ে, আর ঐ পথ বেয়ে যেতে-যেতে যদি ব্যথা পাও, তবে শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলো, আর কিচ্ছু না।

আচ্ছা, আমি এই যে আমার কথাগুলো লিখে রাখছি সবাইকে লুকিয়ে, এ কি আমার ভাল হচ্ছে? নাঃ, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে,—এ ভাল, না মন্দ। হাঁ, আর এই যে আমার লেখার ওপর কুয়াশার মতো তরল একটা আবরণ রেখে যাচ্ছি, এটাও ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়?

তাই বলছি এখন যেমন আমি অনেকেরই কাছে আশ্চর্য একটা প্রহেলিকা, আমি চাই চিরটা দিনই এমনি করে নিজেকে লুকিয়ে থাকতে আমার সত্যিকার ব্যথার উৎসে পাথর চাপা দিয়ে আর তারই চারি পাশে আব-ছায়ার জাল বুনে ছাপিয়ে থাকতে, বুকের বেদনা আমার গানের মুখর

কলতানে ডুবিয়ে দিতে। কেননা, যখন লোকে ভাববে আর হাসবে যে, ছি। সৈনিকেরও এমন একটা দুর্বলতা থাকতে পারে!
না-না, এখন থেকে আমার বুক সে চিন্তাটার লজ্জায় ভরে উঠছে। আমার এই ছোট কথা ক'টি যদি এমনি এক করুণ আবছায়ার অন্তরালেই রেখে যাই, তা'হলে হয়তো কারুর তা বুঝবার মাথা-ব্যথা হবে না। আর কোন অকেজো লোক তা বুঝবার চেষ্টা করলেও আমায় তেমন দুষতে পারবে না!
দূর ছাই, যত সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা! কারই বা গরজ পড়েছে আমার এ লেখা দেখবার? তবু যে লিখছি? মানুষ মাত্রেই চায় তার বেদনায় সহানুভূতি, তা নইলে তার জীবন-ভরা ব্যথার ভার নেহাত অসহ্য হয়ে পড়ে যে! দরদী বন্ধুর কাছে তার দুঃখের কথা কয়ে আর তার একটু সজল সহানুভূতি আকর্ষণ করে যেন তার ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু হয়। তা ছাড়া, যতই চেষ্টা করুক, আগ্নেয়গিরি তার বুক-ভরা আগুনের তরঙ্গ যখন নিতান্ত সামলাতে না পেরে ফুঁপিয়ে ওঠে, তখন কি অত বড় শক্ত পাথরের পাহাড়ও তা চাপা দিয়ে আটকে রাখতে পারে? কখনই না। বরং সেটা আটকাতে যাবার প্রাণপণ আয়াসের দরুন পাহাড়ের বুকের পাষাণ-শিলাকে চুরমার করে উড়িয়ে দিয়ে আগুনের যে হল্‌কা ছোটে, সে দুর্নিবার স্রোতকে থামায় কে?....
হাঁ, তবু ভাববার বিষয় যে, সে দুর্দম দুর্বার বাষ্পোচ্ছ্বাসটা আগ্নেয়গিরির বুক থেকে নির্গম হয়ে যাবার পরই সে কেমন নিষ্পন্দ শান্ত হয়ে পড়ে! তখন তাকে দেখলে বোধ হয়, মৌন এই পাষাণস্তূপের যেন বিশ্বের কারুর কাছে কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলবার কইবার নেই! শুধু এক পাহাড় ধীর প্রশান্ত নির্বিকার শান্তি! আঃ, সেই বেশ!
আচ্ছা, বাইরে আমি এতটা নিষ্করুণ নির্মম হলেও আমার যে এই মরু-ময়দানের শুকনো বালির নীচে ফল্গুধারার মতো অন্তরের-বেদনা, তার জন্যে করুণায় একটি আঁখিও কি সিক্ত হয় না? এতই অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আমার! হয়তো থাকতেও পারে। তবু চাইনে যে-না, ভাই, না, প্রত্যাখ্যান আর বিদ্রুপের ভয় ও বেদনা যে বড় নিদারুণ! তাই আমার

অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর করতে চাই নে—চাই নে। হয়তো তাতে সে কোন এক পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করা হবে। সে তো আমি সইতে পারব না! অথচ একটু সান্ত্বনাও যে এ নিরাশ নীরস জীবনে খুবই কামনার জিনিস হয়ে পড়েছে। এখন আমার সান্ত্বনা হচ্ছে এই লিখেই এমনি করে আমার এই গোপন খাতাটির শাদা বুকে তারই সেই বেদনাতুর মূর্তিটিরই প্রতিচ্ছবি আবছায়ায় এঁকে। আমার শাদা খাতার এই কালো কথাগুলি আর গানের স্নিগ্ধ-কল্লোল এই দুটি জিনিসই আগুন-ভরা জীবনে সান্ত্বনা-ক্ষীর ঢেলে দিচ্ছে আর দেবে!....

আমার আজ দুনিয়ার কারুর ওপর অভিমান নেই, আমার সমস্ত মান-অভিমান এখন তোমারই ওপর খোদা! তুমিই তো আমায় এমন করে রিক্ত করেছ, তুমিই যে আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয়কে ঝড়ো-হওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে আমার ঘর করে তুলেছ,—এখন পরে হলে চলবে না - এড়িয়ে যেতেও পারবে না। এখন তুমি না সইলে এ দুরন্তের আব্দার-অত্যাচার কে সইবে বল? ওগো আমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব!

হাঁ, এখনই লিখে থুই, নইলে কে জানে কোন দিন দুশমনের শেলের একটা তীব্র আঘাত ক্ষণিকের জন্যে বুকে অনুভব করে চিরদিনের মতো নিথর-নিঝুম হয়ে পড়ব—এই মহাসমর-সাগরে ছোট্ট এক বুদ্বুদের মতোই মাথা তুলে উঠেছি, আবার হয়তো এক পলকেই আমার ক্ষুদ্র বুকের সমস্ত আশা-উৎসাহ ব্যথা-বেদনা থেমে গিয়ে ঐ বুদ্বুটির মতোই কোথায় মিলিয়ে যাব! কেউ "আহা" বলবে না—কেউ "উহু" করবে না! আমার কাছে সেই মৃত্যুর চিন্তাটা কেমন একরকম প্রশান্ত মধুর!

আর একটা কথা,—আমাকে কিন্তু বাইরে এখানকার মতোই এমনি রণদুর্দম, কর্তব্যের সময় এমনিই মায়া-মমতাহীন ক্রূর সেনানী, যুদ্ধে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের চেয়েও দুর্বিনীত দুর্বার নর-রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত দানবের মতোই থাকতে হবে! কলের মানুষের মতো আমার অধীন সৈনিকগণ যেন আমার হুকুম মানতে শেখে। আমার দায়িত্বজ্ঞানে আমার কাজে কলঙ্ক বা শৈথিল্যের যেন

এতটুকু আঁচড় না পড়ে! সৈনিকের যে এর বড় বদনাম নেই। তারপর কর্তব্য-অবসানেই আমি তাদের সেই চিরহাস্য-প্রফুল্ল গীতি-মুখর স্নেহময় ভাই। তখন আমার অগ্নি-উদ্গারী নয়নেই যেন স্নেহের সুরধনী ক্ষরে, বজ্র-নির্ঘোষের মতো এই কাঠখোট্টা স্বরই যেন করুণা আর স্নেহ-ক্ষীর হয়ে ঝরে, আমার কণ্ঠ-ভরা গানে তাদের চিত্তের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়! আমার অন্তর আর বাহির যেন এমন একটা অস্বচ্ছ আবরণে চির-আবৃত থাকে যে, কেউ আমার সত্যিকার কান্নারত মূর্তিটি দেখতে না পায়, হাজার চেষ্টাতেও না।

খোদা, আমার অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত তপ্তশ্বাস যেন আনন্দ-পূরবীর মুখর তানে চিরদিনই এমনই ঢাকা পড়ে যায়, শুধু এইটুকুই এখন তোমার কাছে চাইবার আছে। আর যদি এই অজানার অচিন ব্যথায় কোন অবুঝ হিয়া ব্যথিয়ে ওঠে, তবে সে যেন মনে-মনে আমার প্রার্থনায় যোগ দিয়ে বলে,—'আহা, তাই হোক!' কেননা, এমনিতর স্নেহ-কাঙাল যারা—যাদের মৃত্যুতে এক ফোঁটা আঁসু ফেলবারও কেউ নেই এ দুনিয়ায়, যারা কারুর দয়া চায় না, অথচ এক বিন্দু স্নেহ-সহানুভূতির জন্যে উদ্বেগ-উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে,—তাদের দেবার এর বেশী কিছু নেই, আর থাকলেও তারা তা চায়ও না। এই একটু স্নিগ্ধ বাণীই গুহার ম্লান বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোর মতো তাদের সান্ত্বনা দেয়।

সে ছিল এমনি এক চাঁদনী চর্চিত যামিনী, যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হয়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খোশ্‌বুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুল মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনী-গন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত-অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভরে তুলেছিল।

সে মঞ্জীর-মুখর চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে। তার বাম করে ছিল চয়িত-ফুলের ঝাঁপি। কবরী-ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হয়ে তারই বুকে ঝরে-ঝরে পড়ছিল; ঠিক পুষ্প পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মতো। কপোল-চুম্বিত তার চূর্ণকুন্তল হতে বিক্ষিপ্ত কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস

ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল,—ওগো, ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে। উল্লাস-হিল্লোল শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠল! আমার কপাল ঘামে ভরে উঠল, বক্ষ দুর-দুর করে কাঁপিয়ে গেল সে কোন বিবশ শঙ্কা! ঘন ঘন শ্বাস পড়ে আমার হাতের কামিনী-গুচ্ছটির নলগুলি খসে খসে পড়তে লাগল। আমার বোধ হল, এ কোন ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতির রূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখতে পেলুম, বেতস লতার মতো সে আমার সামনে অবনত-মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চলে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত-জড়িত স্বরে বললুম,—কে তুমি? তার আয়ত আঁখির এক অনিমিখ চাউনি দিয়ে আমার পানে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। শুক্ল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দুটি বড় বড় চোখে চোখ-ভরা জল।....এক পলকে পরীর নূপুরের রুণু-ঝুনু শিঞ্জিনী চমকে যেন কি বলে উঠল। আনন্দছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুলল না। অসম্বৃত আর লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল সম্বৃত হল। শিথিলবসনার ফুল্ল কপোল লাজ-শোণিমা বিদীর্ণ-প্রায় দাড়িম্বের মতো হিঙ্গুল হয়ে ফুটল। সমীরের থামার সাথে সাথে যেন উল্লসিত-সরসী-সলিলের কল-কল্লোল নিথর হয়ে থামল, আর তারই বুকে একরাশ পাতার কোলে দুটি রক্ত-পদ্ম ফুটে উঠল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর মতো ভীতি মলিন-নয়নে করুণার সঞ্চার করলে। বার-বার সংযত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে কইলে—তুমি—আপনি কখন এলেন?

আমি বললুম,—আজ এসেছি। তুমি বেশ ভাল আছ পরী?

সে একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে কইলে,—হাঁ, আজ এখানে মা আর আমাদের বাড়ির সকলে বেড়াতে এসেছেন। এ বাগানটা ভাইজান নতুন করে করলেন কিনা। ঐ যে তাঁরা পুকুরটার পাড়ে বসে গল্প করছেন।

আমার নেশা অনেকটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বললুম,—ওঃ, আজ প্রায় দু'বছর পরে আমাদের দেখা, নয় পরী? তোমাকে যেন একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, কোন অসুখ করেনি তো?

সে তার ব্যথিত দুটি আঁখির আর্ত-দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে,—না।····

তার পরেই যেন তার কি কথা মনে পড়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কয়ে উঠল,—আপনি! এখানে কেন আর? যান!····

এক নিমেষে, এমন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন দপ করে নিভে গেল! একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় সমস্ত দেহ আমার অনেকক্ষণের জন্যে নিঃসাড় হয়ে রইল। কখন যে মাথা ঘুরে পড়ে পাশের বেঞ্চিটার হাতায় লেগে আমার বাম চোখের কাছে অনেকটা কেটে গিয়ে তা দিয়ে ঝর-ঝর করে খুন ঝরছিল, আর পরী তার আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমি কিছুই জানতে পারি না। যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন পরী আমার আঘাতটাকে জল চুঁইয়ে দিচ্ছে, আর সেই চোঁয়ানো জলের চেয়েও বেগে তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু চুঁয়ে পড়ছে ····এতক্ষণে আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত করে গুমরে উঠল। বিদ্যুৎবেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে বললুম,—বড় ভুল হয়েছে পরী, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন কি সামলে নিলে, তার পরে আনমনে চিবুক-ছোঁওয়া তার একটা পীত গোলাবের পাপড়ি নখ দিয়ে টুঁওতে টুঁওতে অভিভূতের মতো কি বলে উঠল।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, বললুম,—তবে যাই পরী!

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠল—আহ্, তাই যাও!

কিন্তু জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মতোই যেন তার চরণ অবশ হয়ে উঠেছিল, তাই কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত বদনে সে পাথরের মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। যখন দেখলুম, হেমন্তে শিশির-পাতের মতো তার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, তখন অতি কষ্টে আমার এক বুক দীর্ঘশ্বাস চেপে চলে এলুম। তখন তীক্ষ্ণ ক্লেশের চোখা বাণ আমার বাইরে ভিতরে এক অসহনীয় ব্যথার সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল, এই চাঁদিমাগর্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে শাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠছে, আর তাই সে শুধু সিক্ত চোখে মৌন মুখে আকাশ-ভরা তারার দিকে

তাকিয়ে ভাবছে আকাশের মতো আমারও মর্ম ভেদ করে এমনি কোটি-কোটি আগুন-ভরা তারা জ্বলছে,—উষ্ণতায় সে-গুলো মার্তণ্ডের চেয়েও উত্তপ্ত। স্থির সৌদামিনীর মতো সে-গুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্বলছে—ধু-ধু-ধু!

এটাও একবার কিন্তু মনে হয়েছিল সে-দিন যে, আহ্, কি হতভাগা আমি! যা পেয়েছিলাম, তাতেই সন্তুষ্ট থাকলুম না কেন?

দূরে থেকে ঐ একটু অনুরাগ-সঞ্চিত সলাজ চাউনি,—নানান কাজের অনর্থক ব্যস্ততার আড়ালে দু-তিন বার দৃষ্টি-বিনিময়, হঠাৎ একটি শিহরণ-ভরা পরশ,—যাই-যাই করেও না-যেতে পারার সলজ্জ কুণ্ঠা, মুখর হাসি ওষ্ঠ-অধরের নিষ্পেষণে চাপতে গিয়ে চোখের তারায় ফুটে ওঠা, আর সেই শরমে কর্ণমূলটি আরক্ত হয়ে ওঠা—এই সব ছোটখাটো পাওয়া আর টুকরো-টুকরো আনন্দের গাঢ় অনুভূতি আমার প্রাণে যে এক নিবিড় মাধুরীর মাদকতা ঢেলে নেশায় মশগুল করে রেখেছিল, তার চেয়েও বেশী আমি তো আর পেতে চাইনি, তবে কেন সে আমায় এত অপমান করলে?

আমি তাকে ভালবেসে আসছি, সে যে কবে থেকে তার কোন দিনক্ষণ মনে নেই; বড় প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছি তাকে, কিন্তু কোনদিন কামনা করি নি। আগেও মনে হত আর আজও হয় যে, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থই হয়ে গেল, তবু প্রাণ ধরে কোনদিনই তো তাকে কামনা করতে পারি নি। বরং যখনই ঐ বিশ্রী কথাটা—মিলন আর পাওয়ার এবড়ো-খেবড়ো দিকটা, একটুখানির জন্যে মনের কোণে উঁকি মেরে গিয়েছে, তখনই যেন লজ্জায় আর বিতৃষ্ণায় আমার বুক এলিয়ে পড়েছে। এত ভুবন-ভরা ভালবাসা আমার কি শেষে দু-দিনেই বাসী হয়ে পড়তে দেব?—ছি ছি! না না!

সে-দিন মনে হয়েছিল যে-ভালবাসা দু'জনের দেহকে দু-দিক থেকে আকর্ষণ করে মিলিয়ে দেয়, সে তো ভালবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা! হয়তো এই মোহটাই শেষে ভালবাসায় পরিণত হতে পারত এমনি দূরে-দূরেই থেকে, কিন্তু এক নিমেষের মিলনেই সে পবিত্র ভালবাসা

কেমন বিশ্রী কদর্যতায় ভরে গেল। প্রেমের মিলন তো এত সহজে এমন বিশ্রী হয় না। তাই জীবন আমার ব্যর্থ হবে জেনেও আমি প্রাণ থাকতে তার সঙ্গে মিলি নি। জীবন-ভরা দুঃখ আর ক্লেশ-যাতনা-অপমানের পসরা মাথা পেতে নিয়েছি, তবু আমি ভুলেও ভাবতে পারিনি যে, এমনি নির্লজ্জের মতো এসে এই আঁধার-পথের মামুলী মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি। আমি জানি, এমনি করেই তাকে এমন করে পাব, যে-পাওয়া সকলে পায় না। কেউ বলে না দিলেও আমার বিশ্বাস আছে যে, আজ যাকে ব্যর্থ বলে মনে করছি, আমার জীবনে সেই ব্যর্থতাই একদিন সার্থকতায় পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে উঠবে তাকে ভালবাসি বলেই তাকে এমন করে এড়িয়ে এলুম, এই কথাটা বুঝতে না পেরেই কি সে আমায় এমন করে প্রত্যাখ্যান করলে! হায়! প্রাণ-প্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চলবার ধৈর্য আর শক্তি পেতে যে আমি কত বেশী বেদনা আর কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি বুঝবে না পরী—বুঝবে না! তবু কিন্তু বড় কষ্ট রয়ে গেল যে, হয়তো তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পারলে না। তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় যত বেদনা দিয়েছি, তার চেয়ে কত বেশী ব্যথা যে আমাকে চাপতে হয়েছে, কত বড় কষ্ট যে নীরবে সইতে হয়েছে, তা যদি তুমি জানতে পারতে পরী, তা হলে সে-দিন এই কথাটা মনে করে আমায় এত বড় আঘাত করতে পারতে না!····

আমি জানি প্রিয়, সে-দিন তোমার আসবেই আসবে, যে-দিন আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সকল কথা সকল আশা অন্ততঃ তোমার কাছে লুকানো থাকবে না। এ তুমি নিজেই আপনা-আপনি বুঝতে পারবে, কাউকে তা বলে দিতে বা বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু সে-দিন কি আমি আর এ-জীবনে জানতে পারব প্রিয়, তুমি আমায় ভুল বোঝনি? তা যদি না জানতে পারি, তবে আফসোস প্রিয়, আফসোস!····এই নাও, আমার সব ঘুলিয়ে গেল দেখছি! এ যেন ঠিক ঘুমের ঘোরে হাজার রকমের স্বপ্ন দেখার মতো! কোনটার সঙ্গে কোনটারই সামঞ্জস্য নেই, অথচ অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রানী সবগুলিকে একটি ক্ষীণ সূতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে। আমার সব কথাগুলো যেন ঠিক লাখো ফুলের এলোমেলো মালা।

আবার আমার মনে হচ্ছে আমার পক্ষে তার কাছে ও-রকম করে কথা কওয়া বা দেখা দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নি। কেননা, সে নিশ্চয় মনে করেছিল যে, আমি আমার মিথ্যা অহঙ্কারকে কেন্দ্র করে তার কাছে ত্যাগের গর্ব দেখাতে গিয়েছিলুম, আর তাই হয়তো যখন এই কথাটা তার হঠাৎ মনে হল, অমনি কেমন একটা বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠল আর সে আমায় ও-রকম নির্দয়তা না দেখিয়েই পারলে না। আর একটা কথা, কেউ একটু সামান্য প্রশ্রয় দিলেই আমাদের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু হতভাগ্যরা এতটা বাড়াবাড়ি করে তোলে যে, সে তখন এই দুর্ভাগাদের চেতন করিয়ে দিতে বাধ্য হয়, আর আমরা সেইটাকে হয়তো অপমানের আঘাত বলেই মনে করি। এটা তো আমাদেরই দোষ।

অন্তরের গোপন কথা অন্তরেই না রাখতে পেরে বাইরে প্রকাশ করে দেওয়ার যে দুর্বার লজ্জা আর অক্ষমনীয় অপমান, তা হতে আমায় রক্ষা কর খোদা, রক্ষা কর! এর যা শাস্তি, তা বড় নির্মম নিষ্করুণ হয়েই আমার মাথার ওপর চাপাও।

কিন্তু ঘুমের ঘোর আমার এখনও কাটে নি। মন এমন একটা জিনিস বা মনের এমন একটা দুর্বলতা আছে যে, সে সহজে কোন জিনিসের শক্ত দিকটা দেখতে চায় না। বুঝলেও অবুঝের মতো সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কে যেন মনের মুণ্ডুটা ধরে ঐ নিষ্করুণ নীরস দিকটাই দেখতে বাধ্য করায়; সে বোধহয়, মনেরই পেছনে প্রচ্ছন্ন একটা দুর্নিবার শক্তি।

দেখেছ মজা! আমার মন এটা নিশ্চয়ই জেনে বসেছে যে, সে আমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে। তবে সে-দিন যে সে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে! সে বড় দুঃখে গো, বড় দুঃখে। তার মতো অভিমানীর আত্মমর্যাদাকে ডিঙিয়ে চলার সামর্থ্য নেই। তাই বড় কষ্টে তাকে এত শক্ত হতে হয়েছিল। নইলে ঐ নিষ্ঠুর কথাটা বলবার পরই কেন হু-হু করে অশ্রুর হড়পা-বান বয়ে গেল তার চোখের বুকের সব আবরণ ভাসিয়ে দিয়ে! সব মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু ঐটা—এত বড় একটা সত্য তো মিথ্যা হতে পারে না। অন্ধ, তুমি সেই সময় যদি তার মর্মন্তুদ বেদনা বুঝতে পারতে, তার

এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে, তাহলে আজ ঐ মিথ্যা দুঃখটা, তোমায় এত কষ্ট দিত না! সে যদি এত বেশী অভিমানিনী না হ'ত, তাহলে সাধারণ রমণীর মতো অনায়াসে তোমার পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে কেঁদে উঠত,—ওগো অকরুণ দেবতা! খুব করেছ! খুব উদারতা দেখিয়েছ! আর এ-হতভাগিনীকে জ্বালিও না! এতই দেবত্ব দেখাতে চাও যদি, তবে এস না।

কিন্তু তাহলে তো "আমার প্রিয় মহান্!" এই কথাটির গৌরবে আমার রিক্ত বুক এমন করে ভরে উঠতে পারত না!—ভালই করেছ খোদা, তুমি ভালই করেছ! প্রতিদিনের মতো আজ তাই বড় প্রাণ হতেই বলছি,—তুমি চির মঙ্গলময়! আবার বলছি,—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!'

এ আর এক দিনের কথা।...পরী তার তে-তলার দালানের কামরায় বসে নিশীথ-রাতের সুষুপ্তিকে ব্যথিয়ে আনমনে গাচ্ছিল,—দিগ্‌বালারা আজ জাগল না। নব-ফাল্গুনে মেঘ করেছে। মুখর ময়ূরের কলকণ্ঠের সাথে মাঝে-মাঝে আকুল মেঘের ঝমঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম ঝিম ঝিম!....

নিত্যকার নৃত্যমুখর প্রভাত এখন রোজই স্তব্ধ হয়ে শুধু ভাবে আর ভাবে। বর্ষণ-পুলকিত পুষ্প-আকুলিত এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে বসে আমার মনে হয়, আমার প্রিয়তমাকে আমি হারিয়েছি, আবার মনে হয়, না, বড় বুক ভরেই পেয়েছি গো, তাকে পেয়েছি! আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে। এ ভোরে বারিও ঝরবে, বারি-বিধৌত ফুলও ঝরবে, আবার শিশুর মুখে অনাবিল হাসির মতো শান্ত কিরণও ঝরবে। ওগো আমার বসন্ত-বর্ষার বাসর-নিশি, তুমি আর যেও না—হায়, যেও না।

আবার বিজন কুটীরে সেই গান আমার বিনিদ্র কানে যেন এক রোদনভরা প্রতিধ্বনি তুলছিল। আমি ভাবছিলুম যে, হায়, মাঝে আর তিনটি দিন বাকি। তারপর এই পনর বছরের চেনা-গলার মিঠা আওয়াজ আর শুনতে পাব না, এই আমার বিশ বছরের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিতান্ত আপনার মানুষটিকে হারাতে হবে। কিন্তু হয়তো সারা জনম ধরে এরই রেশ আমার

প্রাণে বীণার ঝঙ্কার তুলবে।....এই তিনটি দিনই মাত্র তাকে আমার বলে ভাবতে পারব, তারপরে আমার কাছে তার চিন্তাটা যেমন দূষণীয়, তার কাছেও আমার চিন্তাটা সেই রকম অমার্জনীয় অপরাধ হবে। আর এক জনের হয়ে সে কোন দূর-দেশে চলে যাবে, আমিও চলে যাব সে কোন বাঁধনহারার দেশ পেরিয়ে। তারপর দীর্ঘবিধুর-মধুর অলঙ্ঘনীয় একটা ব্যবধান!...এই সব কথা মনে পড়তেই আমি বৃষ্টিধারার ঝমঝমানির সাথে গলার সুর বেঁধে গাইলুম, ওগো প্রিয়তম, এস আমরা দু-জনেই পিয়াসী চাতক-চাতকীর মতো কালো মেঘের কাছে শান্ত বৃষ্টিধারা চাই। আমরা চাঁদের সুধা নেব না প্রিয়! আমার তো চকোর-চকোরী নেই। চাতক-মিথুন আমরা চাইব শুধু বর্ষণের পূত আকুল ধারা! এস প্রেয়সী আমার, এই আমাদের ফাল্গুনের মেঘ-বাদলের দিনে আমরা উভয়ে উভয়কে স্মরণ করি আর চলে যাই। এই বসন্ত-বর্ষার নিশিথিনীর মতোই আমার মনের মাঝে এস তোমার গুঞ্জরণ-ভরা ব্যথিত চরণ ফেলে। ...তারপরে দূরে দাঁড়িয়ে সজল চারিটি চোখের চাউনির নীরব ভাষায় বলি,—'বিদায়!'

সে আমার গান শুনেছিল কি না জানি নে। কিন্তু সে সময় মেঘের ঝরা থেমেছিল, আর তার বাতায়ন চিরে ম্লান একটু দীপশিখা আমার বিজন কুটীরে কাঁপতে কাঁপতে নেমেছিল।....

তারপর ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগলছাড়া পাগল মেঘের ঐ এক-রোখা শব্দ—রিম—ঝিম—রিম।....

বিসর্জনের দিন। নহবৎখানায় তারই বিসর্জনের বাজনা বাজছে! সান্ত্বনা আর অশান্ত এক-বুক বেদনা—এই দুটো মিলে আমায় এমন অভিভূত করে ফেলেছে যে, অতি কষ্টে আমার এ শান্ত দেহটাকে খাড়া করে রেখেছি। আর—আর একটু পরেই যেন খুঁটি দিয়ে খাড়া-করা এই জীর্ণ ঘরটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়বে।

বাইরে বেরিয়ে এলুম। সেখানেও ঐ একই একটা অসোয়াস্তি আর অরুন্তুদ যন্ত্রণা! নিদাঘ সাঁঝের ধূসর আকাশ ব্যথায় উদাস-পাণ্ডুর হয়ে ধরার বুক

আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, আর অলক্ষ্যে ক্রমেই সে বেদনার গুমোট কালো-জমাট হয়ে আসছিল। আমের মুকুলের সাথে পাশের গোরস্থান থেকে গুলঞ্চের মালঞ্চ যে করুণ সুগন্ধের আমেজ দিচ্ছিল, তাতে আমি কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পরছিলুম না। ওঃ! সে কী দুর্জয় অহেতুক কান্নার বেগ! এই রোদনের সাথে একটা ক্লান্তিভরা স্নিগ্ধতাও যেন ফেনিয়ে আমার ওষ্ঠ পর্যন্ত ছেপে উঠছিল!

পরীর বিয়ে হল।····দৃষ্টি বিনিময় হল। সম্প্রদান হল। তারপরেই আমি আর এই কথাটা গোপন রাখতে পারলুম না যে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলে যে, আমাদের মতো আত্মীয়-স্বজনহীন ভবঘুরে হতভাগাদের জন্যেই বিশেষ করে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি! আমিও মনে-মনে বললুম,—তথাস্তু! ··দু-একজন বন্ধু মামুলি ধরনের লৌকিকতা দেখিয়ে এক-আধটু দুঃখ প্রকাশও করলেন।

সে-দিন কেঁদেছিল শুধু আমার দূর-সম্পর্কের একটি ছোট বোন! তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে বললে,—যাও ভাইজান। হয়তো আর তোমায় ফিরে পাব না। কিন্তু তবু তুমি এত বড় একটা কাজে যাচ্ছ যে, সেটায় বাধা দেওয়াও মস্ত পাপ আর স্বার্থপরতা। এমন একটা কাজে জীবন উৎসর্গ করতে গেলে দেশের কোন বোনই যে তার ভাইকে বাধা দিতে পারে না। আমাদের দেশে বীরাঙ্গনা না থাকলেও বীর-ভাইদের বোন হওয়ার মতো সৌভাগ্যবতী অনেক রমণী আছেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজের ভাইকে বীর-সাজে সাজিয়ে দেশরক্ষা করতে পাঠাতে পারেন। ভুলে যেও না ভাইজান যে, রণদুর্মদ মুসলমান জাতির উষ্ণ রক্ত আমাদেরও দেহে রয়েছে। আমরাও আসছি সেই একই উৎস হতে। এ রক্ত তো শীতল হবার নয়।··

আমি আমার এই মুখরা বোনটিকে বড় বেশী স্নেহ করতুম। তাই তার সে-দিনকার এই সব কথার গৌরবে আমার বুক ভরে উঠেছিল। আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখতে গিয়ে দেখলুম, ততক্ষণে আমার ছোট বোনের চোখ দুটি জলে ভাসছে। তাকে আর কখনও কাঁদতে দেখি নি। একটু প্রকৃতিস্থ

হয়ে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে আমায় বললে,—তোমাকে বাধা দিতে কেউ নেই বলে তুমি হয়তো অন্তরে বড় কষ্ট পাচ্ছ ভাইজান, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো যে, আমার মতো আজ অনেকেই তোমার কথা ভেবে লুকিয়ে কাঁদছে। হাঁ, একটা কথা। একবার আমার সই পরীদের বাড়ি যাও। এ শেষ-দেখায় কোন লজ্জা-শরম করো না ভাই। পরী বড় অস্থির হয়ে পড়েছে, তার অন্তিম অনুরোধ, একবার তাকে দেখা দাও।··

হায় রে সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনীগণ! তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী, অথচ ভারে-ভারে পবিত্র স্নেহ ঘরে-ঘরে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস! বড় দুঃখ, তোদের সহজে কেউ চেনে না। যে হতভাগার বোন নেই, সে-ই বোঝে তার দুঃখ-কষ্ট কত বড়। মুখে অনেক সময় তোদের কষ্ট দেবার ভান করলেও তোরা বোধ হয় সহজেই বুঝিস যে, আমাদেরও বুকে তোদেরই মতো অনাবিল একটি স্নেহ-প্রীতির প্রশান্ত ধারা বয়ে যাচ্ছে, তাই তোরা মুখ টিপে হাসিস। আবার কাজের সময় কেমন করে এত বড় তোদের স্নেহবেষ্টনীকে ধূলিসাৎ করে দিস।···

আমার এই বড় গৌরবের, বড় স্নেহের বোনটিকে আশীর্বাদ করবার ভাষা পাই নি সে-দিন। তার আনত মস্তকে শুধু দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমার প্রাণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিল।

খুব সহজেই পরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। এই নির্বিকার তৃপ্তিতে আমার নিজেরই বিস্ময় এল। কি করে এমন হয়?····

পরী নব-বধূর বেশে এসে যখন আমার পা ছুঁয়ে সালাম করলে, তখন বরষার স্রোতস্বিনীর চেয়েও দুর্বার অশ্রুর বন্যা তার চোখ দিয়ে গলে পড়ছে। মুহূর্তের জন্যে দুর্জয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে আমার বুকটা যেন খান-খান হয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। প্রাণপণে আমি আমার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত স্বরকে সহজ সরল করে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠে বললুম,—চির-আয়ুষ্মতী হও! সুখী হও!

সে শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহিমময়ী রানীর মতোই চলে গেল।

যখন আমার ভাঙা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে শেষ-চাওয়া

চেয়ে নিলুম, তখন মনে হল যেন সজ্‌নে ফুলের হাতছানিতে আমার পল্লী-মাতা আমায় ইশারায় বিদায় দিলে! একবার নদীপারের শিমুলগাছটার দিকে চেয়ে মনে হল যেন তার ডালে-ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো রয়েছে!....সে-দিন ছল-ছল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা তেমনি মায়ের বুকের শুভ্র ক্ষীরধারার মতোই বয়ে যাচ্ছিল।

স্বপ্নের মতো বিহ্বলতায় ভরা সে কোন্ সুরপুর হতে আধ-ঘুমে গীত আধখানা গানের প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনা আমার কানে এল,—

'অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে!'

শান্তির মতো শুভ্র এক-বুক পবিত্রতা নিয়ে অজানার দিকে তখন পাড়ি দিলুম। আর একটিবার আমার শূন্য ঘরটার দিকে অশ্রুভরা দৃটি ফিরিয়ে আকুল কণ্ঠে কয়ে উঠলুম,—'জয় অজানার জয়!'

ময়ূরেশ্বর
বীরভূম

সব ছাপিয়ে আমার মনে পড়ছে তাঁরই গাওয়া অনেক আগের একটা গানের সান্ত্বনা,--

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া,
দিনের পর দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হতেই তাদের যাওয়া-আসা ;
কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া।
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে,
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে ;
সেই যে আমার জোড়-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা,
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা
এক পলকের পুলক যত, এক নিমিষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া।'

আমার আজ সেই কথাটাই বারে-বারে মনে হচ্ছে যে, যাকে হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা-কণা করে কুড়িয়ে পেলুম, সেই আমার জীবনের হারে গাঁথা রইল। আর সেই আমার জোড়া দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা নিয়ে আজ আমার দুখের থালা সাজিয়ে বসে আছি,—ওঃ, সে বড় আশায়!—এ কোন্ সেদিনের আশায় আর কার প্রতীক্ষায়?

তিনি যখন আমায় আশীর্বাদ করতে এলেন, তখন একবার মনে হল বুঝি

এইবার আমার সকল বাঁধন টুটল! ওঃ খোদা! আমাদের বুকে তুমি রাশি-রাশি ব্যথা আর দুঃখ বোঝাই করে রেখেছ, তা সহ্য করতে তেমনি ধৈর্য শক্তি যদি আমাদের না দিতে, তাহলে আমাদের লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকত না—অপমানের চূড়ান্ত হত! সে-দিত আমি নিজেকে সংযত করতে না পারলে আমার নারাত্বের মাথায় যে পদাঘাত পড়ত, তাতে আমি হয়তো আর এই আজকের মতো মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারতাম না। তুমি হৃদয়ে বল দিয়েছ প্রভু, তাই অসঙ্কোচে এমন একটা গৌরব অনুভব করতে পারছি আজ, হোক-না কেন সে গৌরব বড় কষ্টের।

আমার ভালবাসাই হয়তো তাঁর কর্তব্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সুখের জন্যে, তাঁর তৃপ্তির জন্যে আমি কেন তবে সে-পথ হতে সরে দাঁড়াব না? আমার সর্বস্বের বিনিময়েও যে তাঁকে সুখী করতে পেরেছি, এই তো আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।

এই তাঁর চিন্তাটা যে আজ হতে জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, সেইটাই আমায় সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। বাইরের শাসন আর ভিতরের শাসন এই দুটোয় মস্ত টানাটানি পড়ে গিয়েছে এখন। সমাজ, ধর্ম আমার মনকে মুখ ভাঙিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলছে,—সে চিন্তাটা তোমার ভয়ানক অন্যায়. অমার্জনীয় পাপ।

মনও বেশ প্রশান্ত হাসি হেসে বলছে,—আমি মিথ্যাকে মানবো কেন? যা অন্তরে সত্য, সেটাই আসল, সেটাকে এড়িয়ে চললেই পাপ। গভীর সমাজ-তত্ত্বের সাথে গভীর সত্যের কথাটাও একবার ভেবে দেখো।

বাস্তবিক, অন্তরের গভীর সত্যকে বরণ করে নিতে গিয়ে সমাজ আর ধর্মকে আঘাত করা হয় বলে মনে করি, তাহলে সেটা আমাদেরই ভুল। কারণ, আমরা সমাজ আর ধর্মের অন্তর্নিহীত আদত সত্যকে উপেক্ষা করে তাদের বাইরের খোলসটাকে আঁকড়ে ধরে মনে করি, আমাদের মতো সত্যবিশ্বাসী আর নেই। আমাদের এ অন্ধবিশ্বাস যে মিথ্যা, তা সবচেয়ে বেশী করে জানি আমরা নিজেরাই। তবু সেটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না, উলটে হাজার 'ফ্যাচ্যাং'-এর দলিল নজির পেশ করব। কিন্তু তাই যদি হয়,

তাহলে অন্তরের সত্যকে উপেক্ষা করে এই যে আর একজনকে আমার স্বামী বলে নিজ-মুখে মেনে নিলাম, তার কি হবে?

মনও যেন তখন বিরক্তি-বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠে বলে,—হাঁ, একটা বড় কাজ করছ বলে এই যে এত বড় সত্যের অবমাননা করলে, তার শাস্তি খুব কঠোর নির্দয়ভাবে পেতে হবে। এখন যে তাকে আর চিন্তা করতেও পাবে না, এইটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!

মনের এই অভিমান-ভরা উক্তিতে আমি না কেঁদে থাকতে পারি নে। আমারও কেন মনে হয় যে, আমি ইচ্ছে করেই তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু বুক-ভরা অভিমান আমার তাঁর বিরুদ্ধে এখনও জমে রয়েছে। প্রিয়ের বিরুদ্ধে এ অভিমান আমার জন্মে-জন্মে সঞ্চিত রইল।

কাল ছিল আমার ফুলশয্যা। এই বাসর রাত্রিটি অনেক নারীর জীবনে মাত্র একটি নিশির জন্যেই সুখদ হয়ে আসে। এর বিনোদ স্মৃতিটা প্রভাতের শুকতারার চেয়েও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে দুঃখবেদনাক্লিষ্ট নারীর জীবনে অনেকখানি আনন্দের আলো বিকীর্ণ করে।

কিন্তু এমন সুখ-নিশিতেও কি জানি কেন কিছুতেই আমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করতে পারছিলুম না। আমার স্বামী আমার হাত ধরে তুলে আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—কেন কাঁদছ পরী?—ব্যথায় তাঁর স্বর আহত হয়ে উঠল।

আমি বড় কষ্টে উপাধানে তেমনি করে নিজের এই নির্লজ্জ চোখ দুটোকে লুকিয়ে মনে মনে বললুম,—বুকে বড় বেদনা! আমার হাতে তাঁর তপ্ত অশ্রু টস টস করে ঝরে পড়তে লাগল। পুরুষমানুষ যে কত কষ্টে এমন করে কাঁদতে পারে, তা বুঝে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হবার উপক্রম হল। একটু পরেই তিনি বেশ স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে যেন আমার মনের কথাটি টেনে নিয়ে বললেন,—তোমার বেদনা তো আমি জানি পরী! তোমার এ বুকজোড়া বেদনা কি দিয়ে আরাম করতে পারব বল?

এক নিমেষে আমার লুপ্ত জ্ঞান যেন ফিরে এল। আমি সোজা হয়ে বসে বললুম—আপনি সব জানেন?

তিনি করুণ হাসি হেসে বললেন,—তুমি বোধ হয় জাননা যে, আজ্‌হার আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমরা বরাবর দু'জনে একসঙ্গেই পড়েছি। সে যাবার আগে আমায় সব বলেছে। তাকে আমি বরাবরই চিনি,—সে মিথ্যা বলে না, সে শিশুর মতই সরল। তবু সকল কথা জেনেও মনে হচ্ছে, আমি তাকে সুখী করতে গিয়েও কি যেন মস্ত অন্যায় করেছি। এখন ভাবছি যে, তাকে সুখী তো করতেই পারি নি, উলটে তার দুঃখ-কষ্টকে হয়তো আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। সে হতভাগা বোধ হয় শান্তিতেও মরতে পারবে না। এই আমার জীবনে প্রথম আর শেষ অন্যায়। সে আমার পা ধরে মুক্তি চেয়েছিল। তখন কিন্তু বুঝি নি, সে কোন মুক্তি!—আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি পরী, কিন্তু এতে আত্মতৃপ্তির চেয়ে আত্মগ্লানিই বেশী করে পেলুম, কেননা আমার অবস্থাটা এখন ঠিক সেই রকমের হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায় অথচ কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না!....

আজ্‌হার প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এই কথাটা তার জীবনে আর দ্বিতীয়বার মুখ দিয়ে বেরুবে না, আর তার সত্যে আমার বিশ্বাসও আছে। সে তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছে! বল পরী, তুমি কিসে সুখী হবে?

আমি তাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললুম,—তুমি আমায় এক বিন্দু ছেড়ে থেকো না, তোমার এই পায়ে এমন করে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দিও! আমার বড় কষ্ট!

অনেকক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে থেকে তিনি আমায় বুকে তুলে নিয়ে বললেন,—না পরী, পায়ে কেন, এই বুকে করে রাখব! এমন রত্ন সে হতভাগা কি করে জান্ ধরে আমায় বিলিয়ে দিতে পারল, তাই ভাবছি! বলেই হেসে উঠলেন।

এক মুহূর্ত এই সোজা লোকটির সরলতায় আমার বুক বেদনায় আর শ্রদ্ধায় আলোড়িত হয়ে উঠল। তবু মনে মনে না বলে পারলুম না যে, এমন করে বিলিয়ে দিতে গেলে যে, বড্ডো বেশী ভালবাসতে হয় আগে, এ ক্ষমতা কি যার-তার থাকে? আবার কি মনে করে তিনি আমায় বলে উঠলেন,—যা

হয়ে গেছে, তার জন্যে খামখা লজ্জিত হয়ো না পরী। বীর সে, দেশের কাজে গিয়েছে; তাকে আর ডেকো না! মনে কর, যা হয়ে গেছে, তা শুধু ঘুমের ঘোরে! বলেই তিনি আবার মাথাটা জোর করে তুলে স্বুর করে গাইতে লাগলেন,—

'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির,
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রু-নীর।'

এ কি রহস্য খোদা!....এ দেবতাকে যেন কোনদিন প্রতারণা না করি, এই শক্তি দাও; হৃদয়ে এমনি বল দাও; এখন শুধু শিশুর মতো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। শান্তি দাও খোদা, শান্তি দাও এঁকে—তাঁকে, আর এমনি ব্যথিত বিশ্বাসীকে।

আহা! ভালবাসা দিয়ে যারা ভালবাসা পায় না, তাদের জীবন বড় দুঃখের বড় যাতনার। আবার এই জন্যে সেটা এত যাতনার যে, এ না-ভালবাসার দরুন কাউকে অভিযোগ করবারও নেই। জোর করে তো আর কাউকে ভালবাসানো যায় না।

আমি কি আবার ভালবাসতে পারব গো? কি করে ভুলব? যে বিদায় নিয়ে এমন করে জয়ী হয়ে চলে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভোলা যায় না। তিনি যদি আমার সামনে থেকে অন্য কোন দিকে জীবনটা সার্থক করে তুলতেন, তাহলে হয়তো তাঁকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে। হায়! তাকে কি ভোলা যায়? নারীর ভালবাসা কি এত ছোট? ঐ যে এখনও আমার স্বামী তেমনি হাসিমুখে গাচ্ছেন,—

'ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর।'

সাঁঝের আঁধারে পথ চলতে-চলতে আমার মনে হল, এই দিনশেষে যে হতভাগার ঘরে একটি প্রিয় তরুণ মুখ তার 'কালো চোখের করুণ কামনা' নিয়ে সন্ধ্যাদ্বীপটি জ্বেলে পথের পানে চেয়ে থাকে না, তার মতো অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আর নেই।

আমারই বেদনা-রাগে রঞ্জিত হয়ে গগনের পশ্চিম-দুয়ারে জ্বালা সন্ধ্যাতারা আমার মুখে তার অশ্রুভরা ছল-ছল চোখ দিয়ে দিয়ে ঐ কথাটিতে সায় দিলে। ঝিল্লি-তান-মুখরিত মাঠের মৌন পথ বেয়ে যেতে-যেতে শ্রান্ত চিন্তা কয়ে গেল,—তোমার ব্যথা বোঝে শুধু ঐ এক সাঁঝের তারা!

যদি কোন ব্যথাতুর একটি পল্লী হতে আর একটি পল্লীতে যেতে এমনি সাঁঝে একা শূন্য মাঠের সরু রাস্তা ধরে চলতে থাকে—আর তার সামনে এক টুকরো টাটকা কাটা কল্‌জের মতো এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে ওঠে, তবে সেই বুঝবে কত বুক-ফাটা ব্যথা সে-সময় তার মনে হয়ে তাকে নিপীড়িত করতে থাকে।

এই মলিন মাঠের শূন্য বুকে কিছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু কোথায় সান্ধ্য নীড়ে বসে একটি 'ধুলো-ফুরফুরি' শিস্ দিয়ে-দিয়ে বাউল গান গাইছে, আর তারই সূক্ষ্ম রেশ রেশমী সূতোর মতো উড়ে এসে আমার আনমনা-মনে ছোঁওয়া দিচ্ছে। একটি দুটি করে আসমানের আঙিনায় তারা এসে জুট্‌ছে, আমার মনের মাঝেও তাই অনেক দিনের অনেক সুপ্ত কথার, অনেক লুপ্ত স্মৃতির একটির পর একটির উদয় হচ্ছে।....

আমার এই একই কথা, একই ব্যথা যে কত দিক দিয়ে কত রকমে মনে পড়ছে, তার আর সংখ্যা নেই। তবু বারে-বারে ও-কথাটি ও-ব্যথাটি জাগবেই। মন আমার এ বেদনার নিবিড় মাধুর্যকে আর এড়িয়ে যেতে পারলে না। সাপ যেমন মানিক ছেড়ে তার সেই মানিকটুকুর আলোর

বাইরে যেতে পারে না, আমারও হয়েছে তাই। আমার বুকের মানিক বেদনাটুকুর অহেতুক অভিমানের মায়া এড়িয়ে যেতে পারলাম না।
অনেক দূরে হাটের-ফেরতা কোন ব্যথিতা পল্লী-বধূ মেঠোসুরে মাঠের বিজন পথে গেয়ে যাচ্ছিল,—

'পরের জন্যে কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?'

আমি মনে-মনে বললাম,—হয় রে অভাগী, আপন হয়; তবে অনেকে সেটা বুঝতে পারে না। বুকের ধনকে ছেড়ে গেলেই লোকে ভুল বুঝে বলে,—'পর কি কখন হয় আপন?' আর একজনও ঠিক এমনি করে আমায় ছেড়ে গেছে, সে বেদনা ভুলবার নয়।
পথের বিরহিণীর ঐ প্রাণের গান আমায় মনে করিয়ে দিলে অমনি আর একজন অভিমানিনীর কথা। সেই দিল্-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মত আমার হিয়ার যমুনায় বারে-বারে ভেসে উঠছে।
তাতে-আমাতে পরিচয় তো শুধু ছেলেবেলা থেকে নয়- তারও অনেক আগে থেকে। সেই চির-পরিচয়ের দিন তারও মনে নেই, আমারও মনে মনে নেই। আমাদের পাড়াতেই তাদের বাড়ি।
তাকে আমার বিশেষ করে দরকার হ'ত সেই সময়, যখন কাউকে মারবার জন্যে আমার হাত দুটো ভয়ানক নিশ-পিশ করে উঠত। এ-মারারও আবার বিশেষত্ব ছিল; যখন মারবার কারণ থাকত, তখন তাকে মারতাম না; কিন্তু বিনা-কারণে মারাটাই ছিল আমার ক্ষ্যাপা-খেয়াল! আমার এ-পিটুনী খাওয়াটাকে সে পছন্দ করত কি না জানি নে, তবে দু-দিন না মারলে সে আমার কাছে এসে হেসে বলত,- কই ভাই, এ দু-দিন যে আমায় মার নি?
আমি কষ্ট পেয়ে বলতাম, - না রে মোতি, তোকে আর মারব না। তারপর, সে সময় আমার হাতের সামনে যা-কিছু ভাল জিনিস থাকত, তাই তাকে দিয়ে যেন আমার প্রাণে গভীর তৃপ্তি আসত? মনে হ'ত, এই নিয়ে হয়তো সে আমার আঘাতটাকে ভুলবে।
বই থেকে ছবি ছিঁড়ে তাকে দেওয়াই ছিল আমার সবচেয়ে মূল্যবান

উপহার। এর জন্যে প্রায়ই পাঠশালায় সারা দিন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। কিন্তু যখন দেখতাম যে, আমার দেওয়া ঐ মহা-উপহার সে পরম আগ্রহে আঁচলের আড়ালে করে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলের বিছানা পেতে দিয়েছে, কিংবা তার খেলা-ঘরের দেওয়ালে ভাত দিয়ে সেগুলি এঁটে দিয়েছে, তখন আমার পাঠশালার সব অপমান ভুলে যেতাম। কিন্তু তার ঐ মেনী বেড়ালটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারতাম না। তাকে যে অত আদর করবে রাতদিন, এ যেন আমার সইত না। সে আমায় রাগিয়ে তুলবার জন্যে কোনদিন আমার দেওয়া সবচেয়ে ভাল ছবিটা আঠা দিয়ে ঐ মেনী বিড়ালছানাটার পিঠে এঁটে দিত, আমিও তখন থাপ্পড়ের চোটে তার দুলালী বেড়াল-বাচ্চাটাকে ত্রি-ভুবন দেখিয়ে দিতাম।

তার দেখাদেখি আমিও সময় বুঝে যে-দিন সে রেগে থাকত বা মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে বসে থাকত, তখন জোর ধুম্সুনী দিয়ে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম। তখন আমার আনন্দ দেখে কে! সে যত কাঁদত, আমি তত মুখ ভেঙিয়ে তাকে কাঁদিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসতাম। এক-একদিন তার পিঠের চামড়ায় পাঁচটি আঙুলের কালো দাগ ফুটিয়ে তবে ছাড়তাম। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, ঐ মার খাওয়ার পরেই সে বেশ শায়েস্তা হয়ে গেছে; আর এক মিনিটে কেমন করে সব ভুলে গিয়ে জলভরা চোখে-মুখে প্রাণভরা হাসি এনে আমার আঙুলগুলো টেনে মুচড়িয়ে ফুটিয়ে দিতে দিতে বলেছে,—তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে নুলো করে দিতে হয়! তাহলে দেখি তোমার ঐ ঠুঁটো হাত দিয়ে কেমন করে আমায় মার।

তার হাসি দেখে রেগে পিঠের ওপর মস্ত একটা লাথি মেরে বলতাম,—তাহলে এমনি করে তোর পিঠে ভাদুরে তাল ফেলাই।

সে কাঁদতে-কাঁদতে তার দাদি-জিকে বলে দিত গিয়ে এবং তিনি যখন চেলা-কাঠ দিয়ে আমায় জোর তাড়া করতেন, তখন সে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ত। রাগে তখন আমার শরীর গস্-গস্ করত। তাই আবার ফাঁকে পেলেই তাকে পিটিয়ে দোরস্ত করে দিতাম।

কোন দিন বা তার খেলা-ঘরের সব ভেঙে-চুরে একাকার করে দিতাম, এই

দিন সে সত্যি-সত্যি ক্ষেপে গিয়ে আমার পিঠে হয়তো মস্ত একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দিন-পনরো ধরে লুকিয়ে থাকত, ভয়ে আর কিছুতেই আমার সামনে আসত না। সেই সময়টা আমার বড্ডো দুঃখ হ'ত। আ ম'লো, ও-লাঠির বাড়িতে আমার এ মোষ-চামড়ার কি কিছু হয়? আর লাগলই বা! তাই বলে কি বাঁদরী এমন করে লুকিয়ে থাকবে? তারপর যখন নানান রকমের দিব্যি করে কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান রকমের বাঁকা সোজা সিঁথি কেটে দিতে-দিতে বলত,—দেখ ভাই, আর আমি কখ্খনো তোমায় মারব না। যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুঠ হয়, পোকা হয়।

তারপরে হঠাৎ বলে উঠত,—আচ্ছা ভাই, তুমি যদি আমার মতন বেটি ছেলে হতে, তাহলে বেশ হ'ত—নয়?—দাও না ভাই, তোমার চুলগুলো আমার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিই। কোন দিন সে সত্যি-সত্যিই কখন কথা কইতে কইতে দুষ্টুমি করে চুলে এমন বিনুনী গেঁথে দিত যে, তা ছাড়াতে আমার একটি ঘণ্টা সময় লাগত!....

তারপর কি হল?...

এই শূন্য মাঠের খানিকটা রাস্তা পেরিয়েই আমার মনের শাশ্বত শ্রোতা জিজ্ঞেস করে উঠল,—হাঁ ভাই, তারপর কি হল?

আমার হিয়ার কথক কিছুক্ষণ এই নিঝুম সাঁঝের জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে যেন তার কথা হারিয়ে ফেললে। হঠাৎ এই নীরবতাকে ব্যথিয়ে কয়ে উঠল,—না-না, তোমায় আমি ভালবাসি। সে-দিন মিথ্যা কয়েছিলাম মোতি, মিথ্যা কয়েছিলাম। তার এই খাপছাড়া আক্ষেপ সাঁঝের বেলার তোড়ি রাগিণী আলাপের মতো যেন বিষম বে-সুরো বাজল। সে আবার স্থির হয়ে তার সুর-বাহারে পুরবীর মূর্ছনা ফোটালে। চির-পিয়াসী আমার চিরন্তন তৃষিত আত্মা প্রাণভরে সে সুর-সুধা পান করতে লাগল।

এমনি করেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। সে যখন এগারোর কাছাকাছি, তখন তাকে জোর করে অন্দর-মহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হল। সে কী ছটফটানি তখন তার আর আমার! মনে হল, এই বুঝি আমার জীবন-স্রোতের ঢেউ থেমে গেল। স্রোত যদি তার তরঙ্গ হারায়, তবে

তার ব্যথা সে নিজেই বোঝে, বাঁধ-দেওয়া প্রশান্ত দীঘির জল তার সে বেদন বুঝবে না। মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোল মধুর চল-চপলতার কলহ বাণী ফুটে ওঠে। তাই এ-রকমের চলার পথে বাধা পেয়েই আমাদের সহজ ঢেউ বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে সামনের সকল বাধাকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলে। চির-চঞ্চলের প্রাণের ধারা এই চপল গতিকে থামাবে কে? পথের সাথী আমার হঠাৎ তার চলার বাধা পেয়ে বক্র-কুটিল গতি নিয়ে তার সাথীকে খুঁজতে ছুটল। এত দিনে যেন সে তার প্রাণের ঢেউ-এর খবর পেলে।....

সর্বক্ষণ কাছে পেয়ে যাকে সে পেতে চেষ্টা করে নি, সে দূরে সরে এই দূরত্বের ব্যথা, ছাড়াছাড়ির বেদনা তার বুকে প্রথম জেগে উঠতেই সে তাকে চিনল এবং বলে উঠল,—যাকে চাই তাকে পেতেই হবে। বঞ্চিত স্নেহের হাহাকার, ছিন্ন বাসনার আকুল কামনা তার বুকে উদ্দাম উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন সে তার আকাঙ্খিত আশ্রয়কে নতুন পথে নতুন করে খুঁজতে লাগল। সে অন্তরে বুঝলে, এ সাথী না হলে আমি আমার গতি হারাব। এই রকম মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল। সমাজ বললে,—রাখ তোর এ যুক্তি—আমি এই দেওয়াল দিলাম।

সে দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা বহালে, পাষাণের দেওয়াল—ভাঙতে পারলে না।

এ-দিকে আমাকে কেউ রাখতে পারলে না। লোকের চলার উলটো পথে উজানে বেয়ে চলাই হল আমার কাজ। অনেক মারামারি করে যখন আমাকে স্কুলের খাঁচায় পুরতে পারলে না, তখন সবাই বললে, এ ছেলের যদি লেখাপড়া হয়, তবে সুগ্রীব-সহচর দগ্ধমুখ হনুবংশ কি দোষ করেছিল? তারাও হাল ছেড়ে দিলে, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলাম, এই বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যত তাকে ভুলে রয়েছি, ততই যেন সে আমার একান্ত আপনার হয়ে আমার নিকটতম কাছে এসে আমার ওপর তার সব নির্ভরতা সঁপে গেছে।

যমুনা আসছিল সাগরের পানে, ঐ সাগরও তাঁর দিগন্ত-ছোঁওয়া ঢেউ-এর

আকুলতায় লক্ষ বাহুর ব্যগ্রতা নিয়ে তার দিকে ছুটে যেতে চাইল। দু-জনেই অধীর হয়ে পড়েছিল এই ভেবে—হায়, কবে কোন মোহনায় তাদের চুমোচুমি হবে, তারা এক হয়ে যাবে !····

আর আমাদের দেখাশোনা হ'ত না। কথা যা হ'ত, তা কখনও সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটি চোরা-চাওয়ায়, নয়তো বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দুটি তৃষিত অতৃপ্ত দৃষ্টির বিনিময়ে। ঐ এক পলকের চাওয়াতেই যে আমাদের কত কথা শুধানো হয়ে যেত, কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠত, তা ঠিক বোঝানো যায় না।

আরও পাঁচ বছর পরের কথা ! ··

একদিন শুনলাম তার বিয়ে হবে, মস্ত বড় জমিদারের ছেলে বি-এ পাস এক যুবকের সাথে। বিয়ে হওয়ার পর সে শশুরবাড়ি চলে যাবে, তার সাথে আমার এই চোখের চাওয়াটুকুও ফুরাবে, এই ব্যথাটুকুই বড় গভীর হয়ে মর্মে আমার দাগ কেটে বসে গেল ! এ ব্যথার প্রগাঢ় বেদনা আমার বুকের ভিতর যেন পিষে-পিষে দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যখন মেঘ-ছাড়া দীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো সহসা এই কথাটি আমার মনে উদয় হল যে, সে সুখী হবে, তখন যেন আমি আমার নতুন পথ দেখতে পেলাম। বললাম,—না --আমি জন্মে কারুর কাছে মাথা নত করিনি, আজও আমাকে জয়ী হতে হবে। আর দুঃখই বা কিসের ? সে ধনী শিক্ষিত সুন্দর যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী হবে, অভাগী মেয়েদের সুখী হবার জন্যে যা-কিছু চাওয়া যায় তার সব পাবে ; কিন্তু হায়, তবু অবুঝ মন মানে না। মনে হয়, আমার মতন এত ভালবাসা তো সে পাবে না।

এই কথা ক'টি ভাবতে গিয়ে আমার বুক কান্নায় ভরে এল– আমার যে বাইরের দীনতা, তাই মনে পড়ে তখন আমাকে আমার অন্তরের সত্য প্রেমের গৌরবের জোরে খাড়া হতে হল।—এক অজানার ওপর তীব্র অভিমানের আক্রোশে বললাম,—নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে এর প্রতিহিংসা নেবো। ত্যাগ দিয়ে আমার দীনতাকে ভরে তুলব।

এত দ্বন্দ্বের মাঝে 'আমার প্রিয় সুখী হবে' এই কথাটির গভীর তত্ত্ব প্রাণে আমার ক্রমেই কেটে-কেটে বসতে লাগল, তারপর হঠাৎ এক সময় আমার

বুকের সব ঝড়-ঝঞ্ঝা বেদনা-তরঙ্গ ধীর শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। বিপুল পবিত্র সান্ত্বনায় তিক্ত মন আমার যেন সুধাসিক্ত হয়ে গেল! আঃ! কোথায় ছিলে এতদিন ওগো বেদনার আরাম আমার? এতদিন পরে নিশ্চিন্ততার কান্না কেঁদে শান্ত হলাম।

এ কোন অফিয়াসের বাঁশির মায়া-তান, এমন করে আমার মনের দুরন্ত সিন্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে গেল?···

হায়, এত দিন বাঁশির এই যাদু-করা সুর কোথায় ছিল?··

সেদিন নিশীথ রাতে তার বাতায়নের পানে চেয়ে তাই গেয়েছিলাম,

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে!
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।

বাঃ, এরই মধ্যেই দেখছি মাঠের সারা পথটা পেরিয়ে গাঁয়ের সীমারেখার কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর হতে ঘরে ঘরে মাটির আর কেরোসিনের ধোঁওয়াভরা দ্বীপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই আমার মন কেমন ঐ প্রদীপ-জ্বালা ঘরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে ঐ দীপের পাশে ঘোমটা-পরা একটি ছোট মুখ হয়তো তার দু-চোখভরা আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে পথের পানে চেয়ে আছে। দখিন হাওয়ায় গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে অমনি সে চমকে উঠছে,—ঐ গো বুঝি তার প্রতীক্ষার ধন এল! তার বুকে এই রকম আশা-নিরাশার যে একটা নিবিড় আনন্দ ঘুরপাক খাচ্ছে, তারই নেশায় সে মাতাল!

আমার মনের সেই চিরকেলে অক্লান্ত বিরহী শ্রোতা তাড়া দিয়ে কয়ে উঠল,—ও-সব পরে ভেবো'খন, তারপর কি হল বল?

তখন গাঁয়ের মাথায় মায়ের নত আঁখির স্নেহ চাওয়ার মত নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে। করুণ বেদনার সাথে পবিত্র স্নিগ্ধতা মিশে আমার নয়ন-পল্লব সিক্ত করে আনল।

জলভরা চোখে আমার বাকি কথাটুকু মনে পড়ল।··

তার বিয়ের দিন-কতক আগের এক রাতে তাতে-আমাতে প্রথম

ও শেষ গোপন দেখা-শোনা! সে বললে,—এ বিয়েতে কি হবে ভাই?

আমি বললাম,—তুমি সুখী হবে।

সে আমার সহজ কণ্ঠ শুনে তার বয়সের কথা, আমার বয়সের কথা—আমাদের ব্যবধানের কথা সব যেন ভুলে গেল। মাথার ওপর আকাশভরা তারা মুখ টিপে হেসে উঠল। সে আবার তেমনি করে সেই ছেলেবেলার মতো আমার হাতের আঙুলগুলি ফুটিয়ে দিতে-দিতে বললে,—তা কি করে হবে? তোমাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, তোমাকে যে আর দেখতে পাব না।

এতদিনে তার এই নতুন রকমের আর্দ্র কণ্ঠের বাণী শুনলাম। তার টানা-টানা চোখের ঘন দীর্ঘ পাতায় তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হয়ে জানিয়ে দিল, সে কাঁদছে।

আমি বললাম,—তোমার কথা বুঝতে পেরেছি মোতি! কিন্তু তুমি যার কাছে যাবে, সে তোমায় আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে; আর তুমি সেখানে গিয়ে আমাদের সব কথা ভুলে যাবে।

অন্যে আমার প্রিয়কে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে, এই চিন্তাটাও যেন অসহ্য। তার স্বামী আমার চেয়ে ধনী হোক, সুন্দর হোক, শিক্ষিত হোক, কিন্তু আমার চেয়ে বেশী ভালবাসবে আমার ভালবাসার মানুষটিকে; বড় অভিমানেই ঐ কথাটা আমি বললাম, কিন্তু এ কথাটা বলেই এবার আমারও যেন কণ্ঠ ফেটে বিপুল কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল। সে-কান্না রুখবার শক্তি নেই—শক্তি নেই! মূর্ছাতুরার মতো সে আমার হাতটা নিয়ে জোরে তার চোখের ওপর চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে কয়ে উঠল,—না-না-না। কিসের এ 'না'?

আমি তীব্রকণ্ঠে কয়ে উঠলাম,—এ হতেই হবে মোতি, এ হতেই হবে। আমায় ছাড়তেই হবে।

তখন এক অজানা দেবতার বিরুদ্ধে আমার মন অভিমানে আর তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কয়ে উঠল,—ওগো, চিরদিন তো আমায় মেরে এসেছ, এখনও কি তোমার মেরে সাধ মেটেনি? তবে মারো, আরও মারো—যত সাধ মারো!

কত দিনের কত কথা কত ব্যথা আমার বুকের মাঝে ভরে উঠল! তার পরেই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অভিমানের কঠোরতা আমায় ক্রমেই শক্ত করে তুলতে লাগল। মন বললে,—জয়ী হতেই হবে।

আমি ক্রুর হাসি হেসে মোতিকে বললাম,—হুঁ! কিছুতেই মানবে না তো, তবে সত্যি কথাটাই বলি—মোতি, তোমায় যে আমি ভালবাসি না।

কথাটা তার চেয়ে আমার বুকেই বেশী বাজল। সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মতো চমকে উঠে বললে,—কি?

আমি বললাম,—তোমায় এতদিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করে এসেছি মোতি, কোনদিন সত্যিকার ভালবাসিনি।

আমার কণ্ঠ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আহত ফণিনীর মতো প্রদীপ্ত তেজে দাঁড়িয়ে যেন গর্জন করে উঠল,—যাও, চলে যাও—তোমায় আমি চাই নে, সরে যাও! তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর বে-দিল!—যাও, সরে যাও! তোমার পায়ে পড়ি, চলে যাও, আর আমার ভালবাসার অপমান করো না!

দু-চোখ হাত দিয়ে টিপে কাল-বৈশাখীর উড়ো-ঝঞ্ঝার মতো উন্মাদ বেগে সে ছুটে গেল। আমি টাল খেয়ে মাথা ঘুরে পড়তে-পড়তে শুনতে পেলাম আর্ত-গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিয়ে-বাড়ির ছাদনা-বাঁধা আঙিনায় কে দড়াম করে আছড়ে পড়ে গোঙিয়ে উঠল,—মা-গো!

ঐ যে অনেক দূরের খেয়া-পারের ক্লান্ত মাঝির মুখে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মনের চিরন্তন কান্নাটি ফুটে উঠেছে,

মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

ও যেন আমারই মনের কথা,—ওগো আমার মনের মাঝি আমারও এ ক্লান্তিভরা জীবন তরী আর যে বাইতে পারি নে ভাই! এখন আমায় কূল দাও, না হয় কোল দাও।

আমার মনে বড় ব্যথা রয়ে গেল, সে হয়তো আমার ব্যথা বুঝলে না। যাকে ভালবাসি, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমার নিজের বুকে যে ব্যথার

আঘাতে বেদনার কাঁটায় কত ছিন্ন-ভিন্ন, কি রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, হায়, তা যদি মোতি বুঝতে পারত! ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে? আমার এ রিক্ত-জীবনের সার্থকতা কি? হায়, দুনিয়ায় এর মতো বড় বেদনা বুঝি আর নাই!

এই তো আমার গাঁয়ের আমবাগানে এসে ঢুকেছি। ঐ তো আমার বন্ধ-করা আঁধার ঘর। চারিপাশে দীপ-জ্বালানো কোলাহল-মুখরিত স্নেহ-নিকেতন, আর তারই মাঝে আমার বিজন আঁধার কুটির যেন একটা বিষ-মাখা অভিশাপ-শেলের মতো জেগে রয়েছে। দিনের কাজ শেষ করে, বিনা-কাজের সেবা হতে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময় রোজ যে-কথাটি মনে হয়, বন্ধ দুয়ারের তালা খুলতে আজও সেই কথাটিই আমার মনে চির-ব্যথার বনে দাবানল জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্বলবে, শুধু আমার একার ঘরেই আর কোন-দিন সন্ধ্যা জ্বলবে না। সেই ম্লান দীপশিখাটির পাশে আমার আসার আশায় কোন কালো চোখের করুণ-কামনা ব্যাকুল হয়ে জাগবে না।

বাইরে আমার ভাঙা দরজায় উতল হাওয়ার শুধু একরোখা বুকচাপড়ানি আর কারবালা-মাতন রণিয়ে উঠল,—

হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা!

আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দসীও সাথে-সাথে কেঁদে উঠল,—

হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা!

প্রেসিডেন্সী জেল, কলিকাতা
মুক্তি-বার, বেলা-শেষ

প্রিয়তমা মানসী আমার!

আজ আমার বিদায় নেবার দিন। একে একে সকলেরই কাছে বিদায় নিয়েছি। তুমিই বাকি। ইচ্ছা ছিল, যাবার দিনে তোমায় আর ব্যথা দিয়ে যাব না, কিন্তু আমার যে এখনও কিছুই বলা হয়নি। তাই ব্যথা পাবে জেনেও নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিটাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। তাতে কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না, কেননা তোমার মনে তো চিরদিনই গভীর বিশ্বাস যে, আমার মতন এত বড় স্বার্থপর হিংসুটে দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

আমার কথা তোমার কাছে কোন দিনই ভাল লাগে নি, (কেন, তা পরে বলছি), আজ লাগবে না! তবু লক্ষ্মী, এই মনে করে চিঠিটা একটু পড়ে দেখো যে, এটা একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া পথিকের অস্ত-পারেব পথহারা-পথে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বিদায়-কান্না। আজ আমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম। আমার কথাগুলো তোমার বে-দাগ বুকে না-জানি কত দাগই কেটে দেবে! কিন্তু বড় বেদনায় প্রিয়, বড় বেদনায় আজ আমায় এত বড় বিদ্রোহী, এত বড় স্বেচ্ছাচারী উন্মাদ করে তুলেছে। তাই আজও এসেছি কাঁদাতে। তুমিও বল, আমি আজ জল্লাদ, আমি আজ হত্যাকারী কশাই! শুনে একটু সুখী হই।

আমার মন বড়ই বিক্ষিপ্ত। তাই কোন কথাই হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না। যার সারা জীবনটাই বয়ে গেল বিশৃঙ্খল অনিয়মের পূজা করে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজতে যেও না। হয়তো যেটা আরম্ভ করব সেইটেই শেষের, আর যেটায় শেষ করব সেইটেই আরম্ভের কথা।

আসল কথা, অন্যে বুঝুক চাই নাই বুঝুক, তুমি বুঝলেই হল। আমার বুকের এই অসম্পূর্ণ না-কওয়া কথা আর ব্যথা তোমার বুকের কথা আর ব্যথা দিয়ে পূর্ণ করে ভরে নিও।—এখন শোন।

প্রথমেই আমার মনে পড়েছে (আজ বোধ হয় তোমার তা মনেই পড়বে না), তুমি একদিন যেন সাঁঝে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে,—কি করলে তুমি ভাল হবে?

তোমারই মুখে আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে অধীর অভিমানের গুরু বেদনায় আমার বুকের তলা যেন তোলপাড় করে উঠল।

হায় আমার অসহায় অভিমান! হায় আমার লাঞ্ছিত অনাদৃত ভালবাসা! আমি তোমার সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। দেওয়া উচিতও হ'ত না। তখন আমার হিয়ার বেদনা-মন্দিরে যেন লক্ষ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যর্থ জীবনের আর্ত হাহাকার আর বঞ্চিত যৌবনের সঞ্চিত ব্যথা-নিবেদনের গভীর আরতি হচ্ছিল। যার জন্যে আমার এত ব্যথা, সেই এসে কিনা জিজ্ঞেস করে,— তোমার বেদনা ভাল হবে কিসে?...

মনে হল, তুমি আমায় উপহাস আর অপমান করতেই অমন করে ব্যথা দিয়ে কথা কয়ে গেলে তাই আমার বুকের ব্যথাটা তখন দশ গুণ হয়ে দেখা দিল। আমি পাশের বালিশটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার সবচেয়ে বেশী লজ্জা হতে লাগল, পাছে তুমি আমার অবাধ্য চোখের জল দেখে ফেল। পাছে তুমি জেনে ফেল যে, আমার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে। যে আমার প্রাণের দরদ বোঝে না, সেই বে-দরদীর কাছে চোখের জল ফেলা আর ব্যথায় এমন অভিভূত হয়ে পড়ার মতো দুর্নিবার লজ্জা আর অপমানের কথা আর কি থাকতে পারে? কথাও কইতে পারছিলুম না, ভয় হচ্ছিল এখনই আর্দ্র গলার স্বরে তুমি আমার কান্না ধরে ফেলবে।

যাক, আমায় খোদা রক্ষা করলেন সে-বিপদ থেকে। তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলে। তারপর আস্তে-আস্তে চলে গেলে। তুমি বোধ হয় আজ পড়ে হাসবে, যদি বলি যে আমার তখন মনে হল যেন তুমি যাবার বেলায় ছোট্ট একটি শ্বাস ফেলে গিয়েছিলে। হায় রে অন্ধ বধির

ভিখারী মন আমার! যদি তাই হ'ত তবে অন্ততঃ কেন আমি অমন করে শুয়ে পড়লুম, তা একটু মুখের কথায় শুধাতেও তো পারতে!

তুমি চলে যাবার পরই ব্যথায় অভিমানে আমার বুক যেন একেবারে ভেঙে পড়ল। নিষ্ফল আক্রোশ আর ব্যর্থ বেদনার জ্বালায় আমি হুঁ করে-হুঁ করে কাঁদতে লাগলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তারপর ডাক্তার এল, আত্মীয়-স্বজন এল, বন্ধু-বান্ধব এল। সবাই বললে,—যন্ত্রের ক্রিয়া বড় অস্বাভাবিক। গতিক....ডাক্তার বললে,—রোগী হঠাৎ কোন—ইয়ে—কোন—বিশেষ কারণে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছে। এ কিন্তু বড্ডো খারাপ। এতে এমনও হতে পারে যে....

বাকিটুকু ডাক্তার আমতা-আমতা করে না বললেও আমি সেটার পূরণ করে দিলুম,—'একেবারে নির্বাণ দীপ, গৃহ অন্ধকার!' না ডাক্তারবাবু? বলেই হাসতে গিয়ে কিন্তু এত কান্না পেল আমার যে, তা অনেকেরই চোখ এড়াল না। সত্যিই তখন আমার কণ্ঠ বড় কেঁপে উঠেছিল, অধর কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আবার উপুড় হয়ে পড়লুম। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও কেউ আর আমায় তুলতে পারলে না। আমার গোঁয়ারতুমির অনেকক্ষণ ধরে নিন্দে করে বন্ধু-বান্ধবরা বিদায় নিলে। আমিও মনে-মনে খোদাকে ধন্যবাদ দিলুম।

হায়, এই নিষ্ঠুর লোকগুলো কি আমায় একটু নিরিবিলি কেঁদে শান্তি পেতেও দেবে না? তখনও তোমরা সবাই কেউ আমার পাশে, কেউ বা আমার শিয়রে বসে ছিলে। হঠাৎ মনে হল, তুমি এসে আমার হাত ধরেছ। এক নিমেষে আমার সকল ব্যথা যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। এবারেও কান্না এল, কিন্তু সে যেন কেমন এক সুখের কান্না। তবে এ কান্নাতেও যে অভিমান ছিল না, তা নয়। তবু তোমার ঐ ছোওয়াটুকুর আনন্দেই আমি আমার সকল জ্বালা সকল ব্যথা-বেদনা মান-অপমানের কথা ভুলে গেলুম। মনে হল, তুমি আমার—তুমি আমার—একা আমার! হায় রে শাশ্বত ভিখারী! চির-তৃষাতুর দীন অন্তর আমার! কত অল্প নিয়েই না তুই তোর আপন-বুকের পূর্ণতা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলতে চাস, তবু তোর আপনজনকে আর পেলি নে!

খানিক পরেই আমি আবার সকলের সঙ্গে দিব্যি প্রাণ খুলে হাসি-গল্প জুড়ে দিলুম দেখে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কেউ বুঝল না, হয়তো তুমিও বোঝ নি, কেমন করে অত অধীর বেদনা আমার এক পলকে শান্ত স্থির হয়ে গেল। সে-সুখ সে-ব্যথা শুধু আমি জানলুম আর আমার অন্তর্যামী জানলেন। হাঁ, সত্যি বলব কি? আরও মনে হয়েছিল, সে-ব্যথা যেন তুমিও একটু বুঝতে পেরেছিলে। দেখেছ, কী ভিখিরী মন আমার! তুমি না জানি আমায় কতই ছোট মনে করছ! আহা, একবার যদি মিথ্যা করেও বলতে লক্ষ্মী যে, আমার ব্যথার কারণ অন্ততঃ তুমি মনে-মনে জেনেছ, তাহলে আমি আজ অমন করে হয়তো ফুটতে-না-ফুটতেই ঝরে পড়তুম না। আমার জীবন এমন ছন্নছাড়া 'দেবদাস'-এর জীবন হয়ে পড়ত না। যাঃ, খেই হারিয়ে বসেছি আমার কথার!

হাঁ—সেদিন তোমার ঐ একটু উষ্ণ ছোঁওয়ার আনন্দেই বিভোর হয়ে রইলুম। তার পরের দিন মনে হতে লাগল, তোমায় আড়ালে ডেকে বলি, কেন আমার এ বুকভরা ব্যথার সৃষ্টি? সারাদিন তোমার পানে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম, যদি আবার এসে জিজ্ঞাসা কর তেমনি ক'রে—কি করলে তুমি ভাল হবে?

হায় রে দুর্ভাগার আশা! তুমি ভুলেও আর সে-কথাটি আর একবার শুধালে না এসে। সারাদিন আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বেলাশেষের সাথে-সাথে আমার প্রাণও যেন কেমন নেতিয়ে পড়তে লাগল। আমার কাঙাল আত্মার এক নির্লজ্জ বেদনা ভুলবার জন্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় গানটা বড় দুঃখে বড় প্রাণভরেই গাইতে লাগলুম,—

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধলনাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা,
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী॥

টেনেছিল কতই কান্না হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
শুধোয় সবাই হতভাগ্য বলে,
'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে?'
জানি জানি নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥

আমার কণ্ঠ আমার আঁখি আমারই ব্যথায় ভিজে ভারী হয়ে উঠল। আমার গানের সময় আমি আর বাহিরকে ফাঁকি দিতে পারি নে। সে-সুর তখন আমার স্বরে কেঁপে-কেঁপে ক্রন্দন করে. সে-সুর সে-কান্না আমার কণ্ঠের নয়, আমার প্রাণের ক্রন্দসীর। গান গেয়ে মনে হল, যেন এই বিশ্বে আমার মতন ছন্ন-ছাড়ারও অন্ততঃ একজন বন্ধু আছেন, যিনি আমার প্রাণের জ্বালা মর্মব্যথা বোঝেন, আমার গান শুনে যাঁর চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তিনি আমার অন্তর্যামী। অমনি এ কথাটিও মনে হয়েছিল যে, যদি সত্যিই আমার কেউ প্রিয়া থাকত, তাহলে সে আমার ঐ 'শুধোয় সবাই হতভাগ্য বলে, মাথা কোথায় রাখবি. সন্ধ্যে হলে!'—ঐটুকু শুনবার পরই আর দূরে থাকতে পারত না, তার কোলে আমার মাথাটি থুয়ে সজল কণ্ঠে বলত,—'ওগো, আমার কোলে প্রিয়, আমার কোলে!' তার তরুণ কণ্ঠে করুণ মিনতি ব্যথায় অভিমানে কেঁপে-কেঁপে উঠত,—ছি লক্ষ্মী! এ গান গাইতে পাবে না তুমি।

কি বিশ্রী লোভী আমি, দেখেছ? তুমি হয়তো এতক্ষণ হেসে লুটিয়ে পড়েছ আমার এই ছেলেমানুষী আর কাতরতা দেখে। তুমি হয়তো ভাবছ, কি করে এত বড় দুর্জয় অভিমানী দুরন্ত বাঁধনহারা এমন করে নেতিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারে, কেমন করে এক বিশ্বজয়ীর এত অল্পে এমন আশ্চর্য এত বড় পরাজয় হতে পারে। তা ভাব, কোন দুঃখ নেই। আমিও নিজেই তাই ভাবছি। কিন্তু ভয় হয় প্রিয়, কখন তোমার এত গরব না-জানি এক নিমেষে টুটে গিয়ে 'সলিল বয়ে যাবে নয়ানে!' সেই দিন হয়তো আমার এ ভালবাসার ব্যথা বুঝবে। আমার এই পরাজয়ের মানেও বুঝবে সে-দিন। যাক, যা বলছিলাম তাই বলি।—গান গেয়ে কেন আমার

মনে হল, আমার অন্তর্যামী বুঝি আমার আঁখির আগে এসে নীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে। চোখের জল মুছে সামনে চাইতেই—ও খোদা! কে তুমি দাঁড়িয়ে অমন করুণ চোখে আমার পানে চেয়ে? আহা, চটুল চোখের কালো তারা দুটি তাদের দুষ্টুমি চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে ব্যথায় যেন নিথর হয়ে গেছে। সে পাগল-চোখের কাজল আঁখি-পাতা যেন জল-ভরাতুর। ওগো আমার অন্তর্যামী! তুমি কি সত্য-সত্যই এই সাঁঝের তিমিরে আমার আঁখির আগে এসে দাঁড়ালে? হে আমার দেবতা! তবে কি আমার আজিকার এ সন্ধ্যা-আরতি বিফলে যায় নি? আমি আমার সবকিছু ভুলে কেমন যেন আত্মবিস্মৃতের মতো বলে উঠলুম,—তুমি আমার চেয়ে কাউকে বেশী ভালবাসতে পাবে না! কেমন?

কোন কথা না বলে তুমি আমার কোলের উপরকার বালিশটিতে এসে মুখ লুকালে। কেন? লজ্জায়? না সুখে? না ব্যথায়? জানি না, কেন। তাই তো আজ আমার এত দুঃখ, আর এত প্রাণ-পোড়ানী? তোমার প্রাণের কথা তুমি কোনদিনই একটি কথাতেও জানাও নি, তাই তো আজ আমার বুক জুড়ে এত না-জানার ব্যথা। অনেক সাধ্য-সাধনায় তুমি মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু বললে না, কেন অমন করে মুখ লুকালে। সে-দিন একটিবার যদি মিথ্যা করেও বলতে,—হে আমার চির-জনমের প্রিয়! যে····না-না, যাক সে-কথা!

এইখানে একটা মজার খবর দিই তোমাকে। এই হাজত-ঘরে বসেও আমার এমন অসময়ে মনে হচ্ছে, যেন আমি একজন কবি। রোসো, এখনই হেসে লুটিয়ে পড়ো না। তোমার চেয়ে আমি ভাল করেই জানি যে, আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্তির করার প্রয়োজন, তার কোনটাই বাদ দেন নি ভগবান। তাই আমার বাহির ভিতর সবকিছুই যেন খোট্টাই মুলুকের চোট্টাই ভেইয়্যার মতোই কাট-খোট্টা। তবু যদি আমি কবি হতুম, তাহলে আমার এই ভাবটাকে কী সুন্দর করেই না বলতুম,—

শুধু অনাদর—শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!
ভালবাসা—সে শুধু কথার কথা রে!

অপমান কেনা শুধু! প্রাণ দিলে পায়ে দলে যাবে তোর প্রাণ!
শুধু অনাদর, শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!

যাক, যা হই নি, কপাল ঠুকলেও আর তা হচ্ছি নে। এখন যা আছি, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

দাঁড়াও,—অভিমান করে চেঁচিয়ে হয়তো ও-কথাটার অপমানই করছি আমি। নয় কি? আমার মতন হয়তো তুমিও ভাবছ, কার ওপর এ অভিমান আমার? কে আমায় এ অধিকার দিয়েছে এত অভিমান দেখাবার? এক বিন্দু ভালবাসা পেলাম না, অথচ এক সিন্ধু অভিমান নিয়ে বসে আছি। তবু শুনে আশ্চর্য হবে তুমি যে, সত্যি-সত্যিই আমার বড্ডো অভিমান হয়। যার ওপর অভিমান করি, সে আমার এ-অভিমান দেখে হাসবে, না দু-পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। চেয়ে দেখি না, আমার এত ভালবাসার সম্মান সে রাখবে কি না, শুধু নিজের ভালবাসার গরবে আর অন্ধতায় মনে করি, সেও আমায় ভালবাসে, তাই তো আজ আমার এত লাঞ্ছনা ঘরে বাইরে।

অনেক পথিক-বালা এ পথিকের পথের ব্যথা মুছিয়ে দিতে চেয়েছিল, হয়তো ভালও বেসেছিল, (শুনে হেসো না) আমি কিন্তু ফিরেও চাই নি তাদের পানে। ওর মধ্যে আমার কতকটা গরবও ছিল। মনে হত, এ বালিকা তো আমার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবে না, অনর্থক কেন তার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবো? যে-সে এসে আমার মতন বাঁধন-হারা বিদ্রোহী মনটাকে এত অল্প সাধনায় জয় করে নেবে, এও যেন সইতে পারতুম না। তাই কোন হতভাগীর মনে আমার ছাপ লেগেছে বুঝতে পারলেই আমি অমনি দূরে—অনেক দূরে সরে যেতুম; আর দেখতুম, তার এ আকর্ষণের জোর কত—সে সত্যি আমায় ভালবাসে, না একটু করুণা করে, না ওটা মোহ? ঐ দূরে যাবার আর একটা কারণও ছিল যে, আমাদের কাউকে যেন কোনদিন অনুতাপ করতে না হয় শেষে কোন ভুলের জন্যে।

আমার এক জায়গায় বড় দুর্বলতা আছে। স্নেহের হাতে আমার মতো এমন করে কেউ বুঝি আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাই কেউ স্নেহ করছে

বুঝলেই অমনি বাঁধা পড়বার ভয়ে আমি পালিয়ে যেতুম। ঐ দূরে গিয়ে কিন্তু অনেকেরই ভুল ধরা পড়ে গেছে। অনেকেই নাকি আমায় ভালবেসেছিল, কিন্তু তাদের সকলেরই মনের মিথ্যেটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঐ দূরে সরে গিয়েই। তাদের কেউ আমায় তার জীবন ভরে পেতে চায় নি। আমি পথিক, তাই পথের মাঝে আমায় একটু ক্ষণের জন্যে পেতে চেয়েছিল মাত্র। তাই কেউ আমায় কোনদিনই তার হাতের নাগালের মধ্যেও পেলে না। অনেকে বলে, হয়তো এটাও আমার অভিমান। জানি না। কিন্তু দু-এক জায়গায় একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে যেই নিকটে আসতে চেয়েছিল, অমনি সে আমার দেবতার—আমার ভালবাসার বুকে জোর পদাঘাত করেছে। তবু কি তুমি বলবে, এ আমার অহেতুক অভিমান?

এইখানে একটা কথা মনে রেখো কিন্তু। এই যে যারা আমায় পেতে চেয়েছিল, তাদের সকলেই আগে আমায় ভালবেসেছিল, আমি কখনও তাদের ভালবাসি নি। অত পেয়েও আমার মন চিরদিন বলে এসেছে,—এ নহে, এ নহে!

হায় আমার অতৃপ্ত প্রিয়া! কাকে চাস তুই? কে সে তোর প্রিয়তমা? কে সে গরবিনী, কোথায় কোন আঙিনায় তোর তরে মালা হাতে দাঁড়িয়ে রে? আমার মনের যে মানসী প্রিয়া, তাকে না পেয়েই তো কাউকে ভালবাসতে পারলুম না এ-জীবনে। কতকগুলি কচি বুকই না দলে গেলুম আমার এই জীবনের আরম্ভ হতে-না-হতেই, তা ভেবে আজ আর আমার কষ্টের অন্ত নেই। তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমি কখনও কারুর ভালবাসার অপমান করি নি। কাউকে ভালবেসেছি বলে প্রলোভন দেখিয়ে শেষে পথে ফেলে চলে যাই নি। উল্টে তাদের কাছে দু'হাত জুড়ে ক্ষমাই চেয়েছি, অমনি করে সুদূর থেকেই। আমায় ভাল না বাসতে অনুরোধ করে তার পথ থেকে চিরদিনের মতো সরে গিয়েছি। পাছে কোনদিন কোন কাজে তার বাধা পড়ে, সেই ভয়ে আর কোনদিন তার পথের পাশ দিয়েও চলি নি। অনেকে আমায় অভিশাপও দিয়েছে আমার নির্মমতার জন্যে, অনেকে আবার অহঙ্কারী দর্পী বলে গালও দিয়েছে।

এমনি করে বিজয়ী বীরের মতো আপনমনে পথে-বিপথে আমার রথ চালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এমন সময় একদিন সকালে তোমায় আমায় দেখা + হঠাৎ আমার রথ থেমে গেল। আমার মন কি এক বিপুল সুখে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল,—পেয়েছি, পেয়েছি! আমার মনের পথিক-বন্ধু হঠাৎ ম্লানমুখে আমার সামনে এসে বললে,—বন্ধু, বিদায়! আর তুমি আমার নও; এখন তুমি তোমার মানসীর! তোমার পথের শেষ হয়েছে। দেখলুম, সে পথের শেষ দিগন্তের আঁধারে মিলিয়ে গেল।

এতদিন আমায় শত সত্যসাধনা করেও পথিক-বালারা আমার রথ থামাতে পারে নি, কতজন রথের চাকার সামনে বুক পেতে শুয়ে পড়েছে, আমি হাসতে হাসতে তাদের বুকের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি—কিন্তু হায়! আজ আমার এ কি হল? রথ যে আর চলে না! তুমি শুধু আমার পানে চোখ তুলে চাইলে মাত্র, একটু সাধলেও না যে, পথিক! আমার দ্বারে একটু থাম।

তবু আমার দুঃখ হল না, মান-অপমান জ্ঞান রইল না, আমি মালা-হাতে রথ থেকে নেমে পড়লুম। তোমার গলায় আমার জন্ম-জন্মের সাধের গাঁথা মালা পরিয়ে দিলুম। তুমি নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলে। তোমার ঐ মৌন বুকের ভাষা বুঝতে পারলুম না। প্রাণ যেন কেমন করে উঠল। তুমি সুখী হলে, না ব্যথা পেলে, কিছুই বোঝা গেল না। অমনি চির-অভিমানী আমার বুকে বড়ই বাজল। ভগবান কেন অন্যের মনটি দেখবার শক্তি দেন নি মানুষকে? কিন্তু তোমার প্রতি অভিমান আমার যতই হোক, তোমাকে নালিশ করবার কিছুই ছিল না আমার (আজও নেই)। আমি যে তোমার মনটা না জেনেই তোমায় ভালবেসেছি। চিরদিন জয় করে ফিরে তোমার গলায় যে হার-মানা হার পরিয়েছি—তুমি যে আমার মানসী প্রিয়া! আমার মনে-মনে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে-ছবি আঁকা ছিল, যাকে খুঁজতে এমন করে আমার এমন চিরন্তন- পথিক বেশ, সে মানসীকে দেখেই চিনে নিয়েছি। তাই আমি একটুক্ষণের জন্যেও ভেবে দেখি নি, তুমি এ পরাজিত বিদ্রোহীর নৈবেদ্যমালা হেসে গ্রহণ করবে না পায়ে ঠেলে চলে যাবে। তুমি যদি আমায় ভাল না বাসতে পার, তার

জন্যে তো তোমায় দোষ দিতে পারি নে। আমি জানি খুব প্রিয় যে কোন মানুষেরই মন তার অধীন নয়! সে যাকে ভালবাসতে চায়, যাকে ভালবাসা কর্তব্য মনে করে, মন তাকে কিছুতেই ভালবাসবে না। মন তার মনের মানুষের জন্যে নিরন্তর কেঁদে মরেছে, সে অন্যকে ভালবাসতে পারে না। কত জন্ম ধরে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছি এমনই করে, তুমি কিন্তু ধরা দাও নি ; এবারেও ধরা দিলে না। কখন কোন জন্মে কোন নামহারা গাঁয়ের পাশে তোমায় আমায় ঘর বাঁধব, কখন তুমি আমায় ভালবাসবে, জানি নে। তবু আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমার এত বিপুল অভিমান তোমার ওপর।

ধর, আমার এ-অভিমান যদি মিথ্যে হয়, যদি সত্যি তুমি আমায় ভালবাস, তাহলে হয়তো মনে করবে যে, আমি কেন তোমায় ভুল বুঝে এমন করে কষ্ট পাচ্ছি। কেন তোমাকে এমন করে ব্যথা দিচ্ছি। সেই কথাটি জানবার জন্যেই কাল সারা রাত্তির ধরে তোমার দয়ার দান চিঠি কটি নিয়ে হাজার বার করে পড়েছি ; কিন্তু হায়, তাতেও এমন কিছু পেলুম না, যাতে করে আমায় এ নির্মল ধারণা, কঠোর বিশ্বাস দূর হয়ে যেতে পারে। আমার দুঃখে আমার বেদনায় করুণা বিগলিত হৃদয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছ, অনেক কিছু লিখেছ, অনেক জায়গায় পড়তে-পড়তে চোখের জলও বাধা মানে না, কিন্তু 'তোমায় আমি ভালবাসি' এই কথাটি কোথাও লেখনি—ভুলেও না। ঐ কথাটি ঢাকবার জন্যে যে সলজ্জ কুণ্ঠা বা আকুলতা, তাও নেই কোনে চিঠির কোনখানটিতেই। হায় রে অন্ধ বিশ্বাস আমার! তবু এতদিন কত অধিকার নিয়ে কত অভিমান করেই না তোমায় চিঠি দিয়ে এসেছি। সেই লজ্জায়, সেই অপমানে আজ আলার বুকের বেদনা শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু আর তোমায় ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারছি নে। এবার যে আমি আগে ভালবেসেছি। যে আগে ভালবাসে, প্রায়ই তার এই দুর্দশা, এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাই বড় দুঃখে আজ অবিশ্বাসী নাস্তিকের মতো মরতে যাচ্ছি যে, পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কোন জিনিস নেই। ভালবেসে ভালবাসা পাওয়া যায় না এই অবহেলার মাটির ধারায়। মানুষ যে কত বড় ঘা খেয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়, তা যে নাস্তিক হয়,

সে-ই বোঝে। জানি, ভালবেসে আত্মদানেই তৃপ্তি। বিশ্বাসও করি, যাকে সত্যিকার ভালবাসা যায়, সে অপমান আঘাত করলে হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না। প্রিয়ের দেওয়া সেই ব্যথাও যেন সুখের মতই প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে এত প্রাণঢালা ভালবাসার বিনিময়ে একটু ভালবাসা পাবার জন্যে প্রাণটা হা-হা করে কেঁদে ওঠে না, এ যে বলে, সে সত্যি কথা বলে না।

পুরুষ জন্ম-জন্ম সাধনা করেও নারীর মন পাচ্ছে না। নারীর অন্তরের রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্চিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না। শুনেছি, কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তবে তার হাতে ঐ চাবিকাঠিটি নাকি সমর্পণ করে। তোমার ওপর আজ আমার এত অভিমান কেন, জান? তুমি আমার সকল আদর, সকল সোহাগ, আমার দুরন্ত ভালবাসার সকল বাড়াবাড়ি নীরবে সয়ে গেছ। কখনও এতটুকু প্রতিবাদ কর নি। তোমার মুখ দেখে কোনদিন বুঝতে পারি নি, তুমি আমার সে আদর-সোহাগে ব্যথা পেয়েছ, না সুখী হয়েছ। তোমার মুখে কোনদিন এক রেখা হাসিও ফুটে উঠতে দেখিনি সে সময়। তাই আজ এই কথাটি ভাবতে বুক আমার ভেঙে পড়ছে যে, হয়ত তুমি দায়ে পড়েই আমার অত বাড়াবাড়ি নীরবে সয়েছ, হয়তো ওতে কত ব্যথাই পেয়েছ মনে-মনে। কোন চিঠিতে ও-কথাটির ভুলেও উল্লেখ কর নি। তাই মনে হয়, ওটাকে কোন রকমে চাপা দেওয়াই তোমার ইচ্ছা। আচ্ছা, তাই হোক। এইবার সকল ভুল সকল যাতনা চিরতরেই চাপা পড়বে, ফিরলেও আর সে-কথনও ভুলব না, না ফিরলে তো নয়ই। তাতে প্রাণ যত বেশীই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক না কেন। যদি ফিরি, তবে আর একবার আত্ম-বিদ্রোহী হবার শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু হায়! কার কাছে একথা বলছি? কোন পাষাণ মৌন নির্বাক দেবতা আমার এ তিক্ত ক্রন্দন শুনছে? যা বলছিলাম, তাই বলি।

আমি কেন সুখী হতে পারছি নে, জান? সাধারণ লোকের মতন সহজ ভালবাসায় তুষ্ট হতে পারছি নে বলে। আমারই চারিপাশে আর সকলে কেমন খাচ্ছে-দাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছে—আবার তখনই মিল হয়ে

যাচ্ছে—এমনি করে তাদের সুখে-দুঃখে বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণের পথ ধরে চলতে পারি নে বলেই ওদের একজন হয়ে সুখী হওয়া তো দূরের কথা, অমনি অসুখীও হতে পারলুম না। ওরা বিয়ে করে ছেলে-পিলে হয়, বড় হলে বিয়ে দেয়, জামাই বউ ঘরে আসে—ব্যস, আর কি চাই? ওরই মধ্যে হাসে, কাঁদে, সব করে। ওরা ওতেই সুখী। ওরা যা পেয়েছে, তাতেই তুষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয়, বেচারাদের শতকরা নব্বুই জনই যেন জানে না আর জানতে চায় না যে, যে মানুষটিকে নিয়ে এতদিন ঘরকন্না করছে, সেই মানুষটির মনটাই তার নয়। দুই জনেই দুই জনের মন কোনদিন বোঝে নি, বুঝবার দরকারও হয় নি। এত কাছাকাছি থেকেও তাই মনের দেশে দুই জন দুই জনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফাঁকি আমার চোখে যেদিন ধরা পড়েছে, সেই দিন থেকে আমি আর কাউকে সাথী করে ঘর বাঁধতে সাহস পাচ্ছি নে। সদা ভয় হয় আর বাজে এই কথাটি ভাবতে যে, আমারই বুকে মাথা রেখে আমারই জীবন-সঙ্গিনী অন্যের কথা ভাববে তার ব্যর্থ জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমি তারই কাছে আমার ভালবাসার অভিনয় করে যাব, সেও দায়ে পড়ে দিব্যি সয়ে যাবে। উঃ! এ-কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। আমি যাকে নিয়ে বাসা বাঁধব, আগে দেখে নেব তার মনের মানুষটি আমার মনের মানুষটিকে চিনেছে কি না। তা যত জন্ম না হবে, তত জন্ম আমি হয় মায়ের লক্ষ্মী ছেলেটি হয়েই মায়ের কোলেই থাকব, নতুবা লোটা-কম্‌লী নিয়ে এমনি ব্যোম-ব্যোম করেই বেড়িয়ে বেড়াব।

আমি মানুষ দেখেই তার মনের কথা ধরে দিতে পারি বলে বড্ড গর্ব করে এসেছি এতদিন, আর অনেক জায়গাতেই চিনিওছি ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে যে এমন করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে যাবে তা কে জানত! সত্যই।

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে ধরা পড়ে কে জানে,
সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়ানে।'

তা না হলে এত বড় দুর্দান্ত দুর্বার আমাকেও তুমি আজ শিশুর মতন করে কাঁদাচ্ছ! তুমি আর সকলের কাছে এত সরল, আর আমার কাছেই কেন

এন দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছ, বলতে পার লক্ষ্মীমণি ?—হাঁ, একটি কথা নিবেদন করে রাখি এর মধ্যে—যখন জীবনে বড্ডো ক্লান্ত হয়ে পড়বে তোমার ভালোবাসার অবমাননা দেখে, যখন দেখবে তোমার বুকভরা অভিমান পদাহত হয়ে ধুলোয় পড়ে লুটাচ্ছে, যখন নিরাশায় বুক ভেঙে যেতে চাইবে। (খোদা না করুন), সে-দিন এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়ো প্রিয়ো আমার যে, এই দুঃখের সংসারেও অন্ততঃ একজন ছিল, সে তোমায় বড় প্রাণভরে ভালবেসেছিল। বিনিময়ে তার এক কণাও ভালবাসা সে পায় নি, তবু সে এতটুকু ব্যথা রেখে যায় নি তোমার জন্যে, এমন কি কোনদিন তোমার তা নিয়ে অনুযোগও করে নি। সে তোমায় পেলে মাথার মণি করে রাখত। তোমাকে রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা সকল সাধ তার ছিল। তোমায় এত ভালবাসা এত অভিমানের অধিকারী হলে সে এমন করে তার বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা উদ্দাম তরুণ জীবনকে এত অল্পদিনে ব্যর্থ করে এমন করে বিদায় নিত না। সে অনেক—অনেক বড় কিছু বিশ্বের বিস্ময় হতে পারত। বড় ব্যথায় তবে সারা জীবনটা বিদ্রোহ আর স্বেচ্ছাচারিতা করেই কেটে গেল। আরও মনে করো যে পরপারে গিয়েও সে শান্ত হতে পারে নি, চিরদিনের মত এবারেও সে সেখানে তোমায়ই তরে মালা হাতে করে তার অশান্ত জীবন বয়ে বেড়াচ্ছ পথে-পথে ঘুরে। তোমায় বুকে করে তুলে নেবার জন্যে সে সকল সময় তোমার পানে তার সকল প্রাণ-মন নিয়োজিত করে রেখেছে। সে যে তোমায় সত্যিই ভালবাসে, তাই প্রমাণ করতে সে তার নিজের গর্দানে নিজে খড়্গ হেনে মেরেছে। আরও মনে কর সেই দিন, যাকে তুমি একদিন মনে-মনে তোমার সুখের পথের কাঁটা তোমায় জীবনের অভিশাপ মনে করেছিলে, সে-ই তোমার সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচাবার জন্যেই চিরদিনের মত তোমার পথ হতে সরে গিয়েছে। মনে করো, যাকে তুমি অনাদর করেছ, তারা এককণা ভালবাসা পাবার জন্যে বহু হতভাগিনী বহুদিন ধরে সাধনা করেছিল, কিন্তু সে কোনদিন তার মানসী-প্রিয়া তোমায় ছাড়া আর কারুর পানে একটু হেসেও চাইতে পারে নি, পাছে তোমার অভিমান হয়, পাছে তুমি ব্যথা পাও ভেবে।

আর একটা ছোট কথা এখানে মনে পড়ে গেল। শুনে তুমি হয়তো আমায় কি ভাববে, জানি না। তোমার বিরুদ্ধে যে-যে কারণে আজ এত বড় বুক-জোড়া অভিমান নিয়ে যাচ্ছি, এটাও তারই একটা। সেটা আর কিছু নয়, কাল চিঠিগুলো তোমার পড়তে পড়তে হঠাৎ ও-কথাটা মনে পড়ে গেল। তুমি জান, আমি বড্ডো হিংসুটে! তোমায় অন্যে ভালবাসে, এ-চিন্তাটাও সইতে পারি নে, দেখতে পারা তো দূরের কথা। সকলে তোমার খুব প্রশংসা করুক, তোমায় ভাল বলুক, তাতে খুবই আনন্দ আর গৌরব অনুভব করব, কিন্তু তাই বলে অন্যকে তোমার ভালবাসতে তো দিতে পারি নে। আমি চাই, তুমি একা আমার—শুধু আমার—ভিতরে বাইরে পরিপূর্ণ রূপে আমার হও, আর আমিও পূর্ণ রূপে তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হই। আমি ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না—কখনই না, কিছুতেই না। তাই যখনই আমি দেখেছি যে অন্যে তোমার দিকে একটু চেয়ে দেখেছে আর তুমিও তার পানে হেসে চেয়েছ, অমনি মনে হয়েছে এক্ষুণি গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিই। কিন্তু খোদা তোমাকে রূপ আর গুণ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন যে, তোমায় দেখেই লোকে ভালবেসে ফেলে। ভালবাসা-পিয়াসী তৃষাতুর মানুষের মন তোমাকে যে ভাল না বেসেই পারে না। তাই কতদিন মনে হয়েছে যে, তোমাকে নিয়ে এমন বিজন বনে পালাই, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। চোখ মেললেই আমি তোমাকে দেখব, তুমি আমাকে দেখবে। আমার এ যেন রাহুর প্রেম। নয়? আমায় ছেড়ে অন্যকে তুমি ভালবাসবে, আমার এই ব্যথাটাই সবচেয়ে মর্মন্তুদ। তাই তো এমন করে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে এসেছি যে, আমার চেয়ে বেশী কাউকে ভালবাসতে পারবে না—পারবে না! কিন্তু তুমি আমায় অত সকরুণ মিনতি শুনেও কোনদিন কথা কয়ে ত জানাও নি, একটু মিথ্যা করে মাথা দুলিয়েও বল নি যে, হ্যাঁ গো, হ্যা! শুধু নিস্তব্ধ মৌন হয়ে গেছ। তোমার তখনকার ভাবের মানেটা আজও বুঝতে পারছি নে বলেই আমার এত প্রাণ-পোড়ানী আর ছটফটানী। আজ আমি বড় সুখে মরতে পারতাম, যদি আমার এই চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির ক্ষণেও জানতে পারতাম তোমার

সত্যিকার মনের কথা। এখন জানাতে চাইলেও হয়তো আর জানাতে পারবে না। যদি পারতে, তাহলে হয়তো চির-হতভাগ্য বলে একটু করুণা করে আমায় অনেক-কিছু সিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে আমায় প্রবোধ দিতে, কিন্তু হায় প্রিয় আমার, এ মৃত্যুপথের পথিককে আর ভুলতে পারত না, সে সুযোগ তাই আমি ইচ্ছা করেই দিলাম না তোমায় যখন তুমি আমার এই চিঠি পড়বে, তখন আমি তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ব। দেখ আমার আজ মনে হচ্ছে, পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই, অন্ততঃ মেয়েদের কাছে। পুরুষ যেমন করে ভালবাসা পাবার জন্যে হা-হা করে উন্মাদের মতন ছুটে যায়, তা দেখে মনে হয়, এর এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি স্বয়ং ভগবানও মেটাতে পারবে না, কিন্তু তাকে একটি ছোট্ট মিষ্টি কথা দিয়ে তোমরাই এমনই ভুলিয়ে দিতে পার যে তা দেখে অবাক মেরে যেতে হয়। এত বড় দুর্দান্ত দুর্বিনীতকে ঐ একটু মিষ্টি করে 'লক্ষ্মীটি' বলে গিয়ে একটু কপালে হাতটি রাখলে, বা গিয়ে তার হাতটি ধরলেই সে যত-দূর-হতে-পারা সম্ভব সুশীল সুবোধ বালকটির মতন শান্ত হয়ে পড়ে। তোমার মনে কি আছে, তা ভেবে দেখতে চায় না, ঐ একটু পেয়েই ভালবাসার কাঙাল পুরুষ এত বেশী বিভোর হয়ে পড়ে। তবু তোমরা এই বেচারা হতভাগা পুরুষদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দাও না। কিছুতেই তোমাদের মনের কথাটি পাওয়া যায় না - সব ভালবাসাটুকু পাওয়ার আশা তো মরীচিকার পেছনে ছোটার মতই। কোথায় যেন তোমাদের মনের সীমা-রেখা, কোথায় যেন তোমাদের ভালবাসার তল, কোথায় যেন তার শেষ। আমি তাই অবাক হয়ে অনেক সময় ভাবি আর ভাবি। মনে করো না যে, এগুলো সকলেরই। মনের ভাব। আমি আমার এখানকার মনের ভাবগুলো সোজাসুজি জানাচ্ছি তোমার সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এমনি করে পুরুষ নারীর কাছে চিরদিন প্রতারিত হয়ে আসছে। কারণ, তারা বাইরে যত বড় কর্মী, বিদ্বান আর বীর হোক না কেন, তোমাদের কাছে তারা একের নম্বর বোকা,- একেবারে ভেড়া বনে যায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝতে স্বয়ং ভগবান পারবে না, এ আমি আজ জোর গলায় বলছি। তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা

করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, একটু সেবা করতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী। এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পার, কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভালবাসতেও পার না, আর ভালবাসও না। এইখানে পুরুষ সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালবাসা বলে ভুল করে দেখে, অবশ্য যদি সে তোমায় ভালবেসে ফেলে। আর যাকে জান যে, সে সত্যি-সত্যিই তোমাকে বড় প্রাণ দিয়েই ভালবাসে, অথচ তুমি কিছুতেই তাকে ভালবাসতে পারছ না; তাহলে তার জন্যেও তুমি সকল রকম বাইরের ত্যাগ স্বীকার করতে পার, তার সেবা কর, শুশ্রূষা কর, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দাও, কত চোখের জল ফেল করুণায়—তবু কিন্তু ভালবাসতে পার না। বাইরের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে পার তার জন্যে, কিন্তু মনের সিংহাসনে রাজা করে কিছুতেই তাকে বসাতে পার না।

কিন্তু অন্ধ অবোধ পুরুষ তোমাদের ঐ স্বভাবজাত করুণাকেই ভালবাসা মনে করে বেশী আনন্দ পায়, সুখ অনুভব করে। হায় রে অভাগা! পরে তার জন্যে তাকে আবার দুঃখও পেতে হয় অনেকগুণ বেশী। কারণ—মিথ্যা যা, তা একদিন-না-একদিন ধরা পড়েই। হঠাৎ একদিন নিশীথে বুকে জড়িয়ে ধরেও সে ধরে ফেলে যে, আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সবচেয়ে সুদূরতম; আমার বুকে থেকেও সে আমার নয়। একে হারিয়েছি এ-জনমের মতো। সে যাতনা যে কী নিদারুণ, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। এ ভুল ভাঙার সাথে-সাথে অনেকেরই বুক নিষ্করুণভাবে ভেঙে যায়, তার জীবন চিরতরে নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে যায়। সে তখন নির্মম আক্রোশে নিজের ওপর নির্দয়তম ব্যবহার করে, নিজের সে ভুলের শোধ নেয়। সে আত্মহত্যা করে, এক নিমিষে নয়, একটু-একটু করে কচলিয়ে-কচলিয়ে।

তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশী শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হতে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন রয়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা করে।

তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না। আমাদের সমাজের বেদনার সৃষ্টি এইখানেই। যে তাকে সকল রকমে সুখী করে তার বাহির-ভিতরে রানী করে দেবী করে রাখতে পারত, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সে হতভাগার রক্ত-ঝরা প্রাণের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আলতা পরে। পরে তাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হয় সারাটা জীবন ধরে, তা জানি। ভালবাসাকে অবমাননা করে সে-ও জীবনে আর ভালবাসা পায় না, তখন তার জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে বিষিয়ে ওঠে। তখন হয়তো তার বেশী করে তাকেই মনে পড়ে, সে তার এক কণা ভালবাসা পেলে আজ তাকে মাথায় নিয়ে নাচত। তোমরা হয়তো ভুরু কুঁচকে বলবে, এ আমার মিথ্যা ধারণা। তা বল, আমি যা দেখছি, তাই বলছি। তোমরা একটা কথা বলবে,—নারী বড় ভালবাসার কাঙালিনী। একটু আদর পেলে তাকে সে প্রাণেমনে ভালবেসে ফেলে!....

শুনে হাসি পায় আমার। একটু আদর তো ছোট কথা, জন্ম-জন্ম ধরে পাখিটির মতন করে বুকে রেখে আদর-সোহাগ করে ভালবেসেও তোমার মন পাইনি, শুধু এই একটা উদাহরণ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলুম। আমার মতন হতভাগা দু-দশটা প্রায়ই দেখতে পাবে পথে-ঘাটে টো-টো কোম্পানির দলে। নেহাত চোখের মাথা না খেলে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না।

যাক, আমি হিংসের কথা বলতে গিয়ে কি সব বাজে বকলুম। আমি বলতে চাই যে, আমি তোমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে তোমারই চোখের সামনে একে ওকে কত আদর করেছি, কিন্তু কোনদিন তোমার তাতে হিংসে হয় নি, তুমি কোনদিন বাইরে ভিতরে এতটুকু চঞ্চল বা বিচলিত হও নি। তুমি মনে-মনে জান যে, তুমি আমার নও, তুমি আমায় ভালবাসতে পার না, অতএব আমি যাকেই যত আদর ভালবাসা দেখাই, তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না। আমার ওপর যখন তুমি কোন দাবিই রাখ না, তখন আমায় যে-কেহ ভালবাসুক বা আমি যাকেই ভালবাসি, তাতে তোমার কি আসে যায়?

আমার এখন মনে হচ্ছে কি, জান? আমি যদি তোমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে হতে পারতুম, তাহলে তোমার ভালবাসার মানুষটিকে ভালবেসে দেখাতুম, তোমার বুকে কেমন ব্যথা বাজে, কত বেদনা লাগে।

এত কথা কেন জানালুম, জান? আমি আজ রাজবন্দী। প্রেসিডেন্সী জেলের হাজতে বসে তোমায় এই চিঠি দিচ্ছি। কাল আমার বিচার হবে। বিচারে দুটি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তো হবেই। জেলের এক কর্মচারী দৈবক্রমে আমারই এক বন্ধু—শৈশবকালের—আমাদের আজ আশ্চর্য রকমের দেখাশোনা। স্কুলে আমাদের দুইজনের মধ্যে বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট কে হবে, এই নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। ওঁরই কৃপায় এত বড় চিঠি এমন করে লেখবার অবসর আর সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি, তা না হলে কারুক্‌খে কোনকিছু জানিয়ে যেতে পারতুম না। ভগবান, বন্ধুর আমার মঙ্গল করুন!

তুমি মনে করবে, মাত্র দু বছরের জেল হবে হয়তো, তার জন্যে এমন বিদায়-কান্না কেন? আবার তো ফিরে আসব। কিন্তু আমি জানি, আমি আর ফিরব না। তোমায় এতদিন বলি নি, লুকিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আজ যাবার দিনে কষ্ট পাবে জেনেও জানিয়ে যাচ্ছি। আমার যক্ষ্মা হয়েছে—যাকে আমাদের দেশে শিবের অসাধ্য রোগ বলে। ডাক্তার কতবার আমার পরিশ্রম করতে মানা করেছে, আমার কত বন্ধু আমায় কত মিনতে করে হাতে-পায়ে ধরে এখন কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম করতে বলেছে, আর আমি ততই দ্বিগুণ বেগে কাজ করেছি। সে-সময় তুমি যদি আমায় একটিবার মানা করতে, করুণা করে নয়, ভালবেসে! তাহলে কি করতুম, জানি না, কিন্তু তুমি তো আমার এ ভীষণ রোগের খবর জানতে না! তাহলে দয়া করে হয়তো আমায় মিনতি করে লিখতে ভাল হবার জন্যে।...

তবু কিন্তু তোমার সকল শাসন মেনে চলছি আমি আমার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এমন করে আর কেউ আমায় কথা শোনাতে পারে নি, এ বিশ্বে এত স্পর্ধা তুমি ছাড়া আর কারুর হয়নি যে, আমায় শাসন করে, হুকুম শোনায়!—যদি কোন অপরাধ করে থাকি তোমার কাছে কোনদিন, তবে তা ভুলে যেও না, ক্ষমা করো এই ভেবে যে, তুমি যাকে কিছুতেই ভালবাসতে পার

নি, সে-ই তোমার সকল কথা তার শেষ দিন পর্যন্ত খোদার পবিত্র বাণীর চেয়েও পবিত্রতর মনে করে মেনে চলেছি। এইটুকু ভাবতে পার তো একটু আনন্দও অনুভব করো। আমার মতন দুর্জয় বাঁধন হারাকে তুমি জয় করেছিলে, এই ভেবেও একটু গৌরব করো।

দু-বছর না হয়ে যদি মাত্র ছয় মাসেরও সশ্রম কারাদণ্ড হয় আমার, তাহলেও আমার ফিরবার কোন আশা নেই। যক্ষায় আমার শরীরটাকে খেয়ে ফেলেছে, আর ব্যথায় আমার বুকে ঘূণ ধরিয়ে দিয়েছে। এর ওপর জেলের খাটুনি। কখন যে আমার হৃদ্‌ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, তা বলতে পারি নে। এখনই একটু পরিশ্রম করলেই আমার নাকে-মুখে অজস্র ধারায় রক্ত নির্গত হয়। হয়তো ইচ্ছা করলে বাঁচতেও পারতুম; কেননা তোমার ইচ্ছা-শক্তির ও প্রাণশক্তির উপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। কিন্তু আর সে-ইচ্ছা নেই লক্ষ্মী! এখন ফিরাতে এলেও হয়তো আমি ফিরতে পারতুম না। বড় দুঃখেই বলতে হ'ত, —'অবহেলায় প্রিয়তম, এ যে অবহেলায়!' তা ছাড়া; বাঁচতে পারতুম, যাদ জীবনটাকে অন্য কোন বড় দিক দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারতুম, তাও পারলুম না। অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে দেখা গেল। আও পারবও না। তাই আজ হাল ছেড়ে দিয়ে বলছি,—সন্ধ্যে হল গো, এবার আমায় বুকে ধর। এত শীঘ্র এমন করে ধরা পড়ব, তা আমি দু-দিন আগে স্বপ্নেও ভাবি নি। কেননা আমার আশা ছিল, এর চেয়ে অনেক বড় করে মরণ বরণ করা। কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। কারণ-গুলো জেনে আর কি হবে বল।

তবে বিদায় হই! বিদায়-বেলায় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেন তুমি জীবনে একটি দিন সত্যিকার ভালবেসে দুঃখ পেয়ে আমার ব্যথা বোঝ। তোমার জীবনের অভিশাপ আজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলল। আর ভয় নেই।

হাঁ, যদি পার আশীর্বাদ করো, যেন এবার জন্ম নিলে তুমি যাকে ভালবাস, সে-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করি!—ওঃ! কী অন্ধকার!···ইতি—

তোমার চির-জীবন-জোড়া অভিশাপ আর অমঙ্গল—

শ্রীধূমকেতু

রিক্তের বেদন

বীরভূম

আঃ! এ কি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ?

জননী জন্মভূমি মঙ্গলের জন্যে যে-কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে এ কি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা—আমার ভাইরা! খাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ ছাপা রয়েছে!—তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ও-গুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশীষমাল্য—বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল কমলহার!

ফুলগুলো কত আর্দ্র-সমুজ্জ্বল! কী বেদনা-রাঙা মধুর! ওগুলো তো ফুল নয়, ও যে আমাদের মা-ভাই-বোনের হৃদয়ের পূততম প্রদেশ হতে উজাড়-করে-দেওয়া অশ্রুবিন্দু! এই যে অশ্রু ঝরেছে আমাদের নয়ন গলে, এর মতো শ্রেষ্ঠ অশ্রু আর ঝরে নি,—ওঃ, সে কত যুগ হতে!

আজ ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রভাতের অরুণ কিরণ চিরে নিমেষের জন্য বৃষ্টি নেমে তাদের খাকি বসনগুলোকে আরো গাঢ়-ম্লান করে দিয়েছিল। বৃষ্টির ঐ খুব মোটা-মোটা ফোঁটাগুলো বোধ হয় আর কারুর ঝরা অশ্রু, সেগুলো মায়ের অশ্রু-ভরা-শান্ত আশীর্বাদের মতো তাগিদে কেমন অভিষিক্ত করে দিলে!

তারা চলে গেল। একটা যুগবাঞ্ছিত গৌরবের সার্থকতার রুদ্ধবক্ষঃ-বাষ্পপথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস-ফোঁস শব্দ ছাপিয়ে আশার সে কী করুণ গান দুলে দুলে ভেসে আসছিল,—

> বহুদিন পরে হইবে আবার আপন কুটীরবাসী
> হেরিব বিরহ-বিধুর-অধরে মিলন-মধুর হাসি,
> শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখর বাণী,—
> আমার কুটীর-রানী সে যে গো আমার হৃদয়-রানী।

সমস্ত প্রকৃতি তখন একটা বুকভরা স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিল। বাঙলার আকাশে, বাঙলার বাতাসে সে বিদায়-ক্ষণে ত্যাগের ভাস্বর অরুণিমা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। কে বলে মাটির মায়ের প্রাণ নেই?

এই যে জল-ছলছল শ্যামোজ্জ্বল বিদায় ক্ষণটুকু অতীত হয়ে গেল, কে জানে আবার কত যুগ বাদে এমনি একটা সত্যিকার বিদায়-মুহূর্ত হয়ে আসবে?

আমার 'ইস্তকনাগাদ' ত্যাগের মহিমা কীর্তন পঞ্চমুখে করে আস্‌ছি কিন্তু কাজে কতটুকু করতে পেরেছি? আমাদের করার সমস্ত শক্তি বোধ হয় এই বলার মধ্য দিয়েই গলে যায়!

পারবে? বাঙালার সাহসী যুবক! পারবে এমনি করে তোমাদের সবুজ, কাঁচা তরুণ জীবনগুলি জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতে দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে? তবে এস। এস নবীন, এস! এস কাঁচা, এস! তোমরাই ত আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সব! বৃদ্ধদের মানা শুনে না। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেন, আবার কোন মুগ্ধ যুবক নিজেকে ঐ রকম বলিদান দিয়ে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাত করেন। মনে করেন, এই মাথা-গরম ছোকরাগুলো কী নির্বোধ! ভেঙে ফেল, ভেঙে ফেল ভাই এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন!

অনেকদিন পরে দেশে একটা প্রতিধ্বনি উঠছে,—জাগো হিন্দুস্থান, জাগো! হুঁশিয়ার!

নান্‌্‌ব

মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ? কেন এ অবশ্যম্ভাবী একটা অগ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছ?—আচ্ছা মা! তুমি বি-এ পাসকরা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর-মাতা হতে চাও? নিঝুম ঘুমের আলস্যের দেশে বীর-মাতা হবার মতো সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা? তবে, কোনটি বরণীয় তা জেনেও কেন এ অন্ধস্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? গরীয়সী মহিমান্বিতা মা আমার! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—তোমার এ

জনম-পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও! দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আগুন আমার ভাই—আমায় ডাক দিয়েছে। সে যে কিছুতেই আঁচলচাপা থাকবে না। আর, যে থাকবে না সে বাঁধন ছিঁড়বেই। সে সত্য-সত্যই পাগল, তার জন্যে এখনও এমন পাগলা-গারদের নির্মাণ হয়নি, যা তাকে আটকে রাখতে পারবে।

পাগল আজকে ভাঙরে আগল
পাগলা গারদের,

আর ওদের

সকল শিকল শিথিল করে বেরিয়ে পালা বাইরে
দুশ্‌মন্ স্বজনের মতো দিন দুনিয়ায় নাইরে!
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে॥

আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি। পাখি যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কি রকম বেদনা-বিজড়িত মধুর।

আহ্, আমার আদেশ দিয়ে শেষ আশীষ করবার সময় মার গলার আওয়াজটা কি রকম আর্দ্র-গভীর হয়ে গিয়েছিল! সে কী উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ আমাদের দু'জনকেই মুষড়ে দিচ্ছিল!··হাজার হোক, মায়ের মন তো!

আকাশ যখন তার সঞ্চিত জমাট-নীর শেষে ঝরিয়ে দেয় তখন তার অসীম নিস্তব্ধ বুকে সে কি একা শান্ত সজল স্নিগ্ধতার তরল কারুণ্য ফুটে!

মাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান, বি-এ পড়ছিলুম; মায়ের মনে যে কত আশাই না মুকুলিত পল্লবিত হয়ে উঠেছিল! আমি আজ সে-সব কত নিষ্ঠুরভাবে দলে দিলুম। কি করি, এ দিনে এ রকম যে না করেই পারি না।

আমার পরিচিত সমস্ত লোক মিলে আমায় তিরস্কার করতে আরম্ভ করেছে, যেন আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি। সবাই বলছে আমার সহায়-সম্বলহীন মাকে দেখবে কে? হায়, আজ আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা, তা কাউকে বুঝাতে পারব না। কাকে বোঝাই যে লক্ষপতি হবে দশ হাজার টাকা বিলিয়ে দিলে তাকে ত্যাগ বলে না, সে হচ্ছে দান। সে নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে নিজের সর্বস্বকে

দিতে না পারলে, সে তো ত্যাগী নয়। মার এই উঁচু ত্যাগের গগনস্পর্শী চূড়া কেউ ছুঁতেই পারবে না। তাঁর এ গোপন বরেণ্য ত্যাগের মহিমা এক অন্তর্যামী জানেন।

এই তো সেই সত্যিকারের মোসলেম জননী, যিনি নিজের হাতে নিজের একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে জন্মভূমির পায়ে রক্ত ঢালতে পাঠালেন।

এ বিসর্জন না অর্জন?

সালার

জননী আর জন্মভূমির দিকে তখনও আর এত স্নেহ. এত ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেনি, যেমন তাঁগিদে ছেড়ে আসবার দিনে দেখেছিলুম। শেষ চাওয়া মাত্রেই বোধহয় এমনি প্রগাঢ় করুণ।

নাঃ, আমাকে হয়রাণ করে ফেললে এদের অতিভক্তির চোটে! আমি যেন মহা-মহিমান্বিত এক সম্মানার্হ ব্যক্তিবিশেষ আর কি! দিন নেই, রাত নেই, লোক আসছে আর আসছে। যে-আমাকে তার এইখানেই হাজার-বার দেখেছে তারাও আবার আমাকে নতুন করে দেখছে। এ এক যেন তাজ্জব ব্যাপার। আমি আমার চির-পরিচিত শৈশবসাথী বন্ধুদের মাঝে থেকেও মনে করছি যেন 'আবু হোসেনের' মতো এক রাত্তিরেই আমি ঐ রকম একটা রাজা-বাদশা গোছের কিছু হয়ে পড়েছি। সবচেয়ে বেশী দুঃখ হচ্ছে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ভক্তি দেখে। বন্ধুরা যদি ভক্তি করে, তাহলে বন্ধুদের ঘাড়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড মুদ্গর! তাগিদে যতই বলছি ভো-ভো আহাম্মকবৃন্দ, তোমাদের এ চোরের লক্ষণ; ওফে অতিভক্তি সম্বরণ করা, ততই যেন তারা আমার আরো মহত্বের পরিচয় পাচ্ছে!··· বাইরে তো বেরোনো দায়! বেরোলেই অমনি স্ত্রী-পুরুষের ছোট বড় মাঝারি প্রাণী আমার দিকে প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে, আর অন্যকে আমার সবিশেষ ইতিবৃত্ত জ্ঞান করিয়ে বলে, ঐ রে ঐ লম্বা সুন্দর ছেলেটা যুদ্ধে যাচ্ছে।

তারা কোনটা দেখে, আমার ভিতর—না বাহির?

রেলপথে

অণ্ডালের কাছকাছি

যাক, এতক্ষণে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া গেল।— উঃ, যুদ্ধের আগেই এও তো একটা মন্দ যুদ্ধ নয়, রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এখন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

একটা ভাল কাজ করে যা আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ মনে-মনে লাভ করা যায়, তার অনেকটা নষ্ট করে দেয় বাইরের প্রশংসায়।

সবচেয়ে বেশী ভিড় হয়েছিল কলকাতায় আর হাওড়ার ষ্টেশনে। ওঃ, সে কী বিপুল জনতা আর সে কী আকুল আগ্রহ আমাদিগকে দেখবার জন্যে! আমরা মঙ্গলগ্রহ হতে অথবা ঐ রকমেরই স্বর্গের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা হতে যেন নেমে আসছি আর কি! যাঁদের সঙ্গে কখনও আলাপ করবারও সুযোগ পাই নি, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন আর অশ্রু গদগদ কণ্ঠে আশীষ করেছেন। ঐ যে হাজার হাজার পুর-মহিলার হৃদয় গলে সহানুভূতির পূত অশ্রু ঝরছে, ওতেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হচ্ছে। সকলেরই দৃষ্টি আজ কত স্নেহ আর্দ্র কোমল!

ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই যে উপহারের আর বিদায়-সম্ভাষণের ধুমধাম, এতে কিন্তু বড্ডো বেশী ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে!—এসব রাজ্যের জিনিস খাবে কে?—আহা, না-না, এই রকম উপহার দিয়েই যদি ওরা তৃপ্ত হয়, একটা অশ্রুময় গৌরবে বক্ষ ভরে উঠে, তবে তাই হোক!

মন! বুঝে নাও কি জন্যে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা! ভেবে নাও কি ঘোর দায়িত্ব মাথায় করছ!

আমার কম্পিত বুকে থেকে-থেকে এখনও সেই আর্ত বন্দনার ঘন-ঘন প্রতিধ্বনি হচ্ছে, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম!

রেলগাড়ি

নিশিভোর

কী সুন্দর জলে-ধোওয়া আকাশ! কী স্নিগ্ধ নিঝুম নিশিভোর! সারা প্রকৃতি এখনও তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে। গোলাবী

রং-এর মসলিনের মতো খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ধূমভরা ক্লান্ত দেহটাই জড়িয়ে রয়েছে। আর একটু পরেই এমন সুন্দর প্রকৃতি বিচিত্র অঙ্গিভঙ্গি করে জেগে উঠবে, তারপরে সেই তেমনি নিত্যকার গোলমাল।

ঐ প্রত্যূষে

এখন বোধ হচ্ছে সমস্ত দেশটা এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে, উদাস-অলস নয়নে তার চেয়েও উদার আকাশটার দিকে চেয়ে রয়েছে। এখনও তার আঁখির পাতায়-পাতায় ঘুমের জড়িমা মাখানো। হাই-তোলার মতো মাঝে-মাঝে দমকা বাতাস ছুটে আসছে।
পাকা তবলচির মতো রেলগাড়িটা কী সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে 'পাঁটা কেটে ভাগ দিন—পাঁটা কেটে ভাগ দিন!' ইচ্ছে করছে রেল চলার এই কারফা তালের তালে-তালে একটা ভৈরোঁ কি টোড়ি রাগিণী ভাঁজি, কিন্তু গান গাইবার মতো এখন আদৌ সুর নেই যেন আমার কণ্ঠে।

মধুপুর

নিশি-শেষের গ্যাসের আলো পড়ে আমাদের মুখগুলো কী করুণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে! ঐ ফ্যাকাসে আলোর পাণ্ডুর আভা প্রতিভাত হয়ে আমার ঘুমন্ত সৈনিক-বন্ধুদের সিক্ত নয়ন-পল্লবগুলি কি রকম চকচক করছে! ও কিসের অশ্রুবিন্দু? বিদায়-ব্যথার? কে জানে!....
আজ এই প্রভাতের গ্যাসের আলোর মতোই পাণ্ডুর রক্তহীন একটি তরুণ মুখ ক্ষণে-ক্ষণে আমার বুকের মাঝে ভেসে উঠছে! এখন যেন একটা বাষ্পময় কুয়াশার মতো আধো-আলো আধো-আঁধার ভাব দেখা যাচ্ছে। ক'দিন ধরে তার দৃষ্টিও ঠিক এইরকম ঝাপসা সজল হয়ে উঠেছিল। সে কিন্তু কখনও কিছু বলে নি—কিছু বলতে পারে নি। আমিও কখনও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি—হাজার চেষ্টাতেও না। কি যেন একটা লজ্জা-মিশ্রিত কিছু আমায় প্রাণপণে চোখমুখ ঢেকে মানা করত—না-না-না, তবু

কি করে আমাদের দুটি প্রাণের গোপন কথা দু'জনেই জেনেছিলুম।—ওঃ, প্রথম যৌবনের এই গোপন ভালবাসাবাসির মাধুর্য কত গাঢ়। আমার বিদায়-দিনেও আমি একটি মুখের কথাও বলতে পারি নি তাকে। শুধু একটা জমাট অশ্রুখণ্ড এসে আমার বাকরোধ করে দিয়েছিল। সেও কিছু বলে নি; যতদিন বাড়িতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে কেঁদেছে আর কেঁদেছে। তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে ছিল। আর তার তরুণ সুন্দর মুখটি এই ভোরের গ্যাসের আলোর মতোই করুণ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। মা যেন আমায় গোপন-ব্যথার রক্তক্ষরা দেখেই সেদিন বলেছিলেন, যা বাপ, একবার শহিদাকে দেখা দিয়ে আয়। সে মেয়ে তো কেঁদে-কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। আমি তখন জোর করে বলেছিলুম, না মা, মরুক গে সে, আমি কিছুতেই দেখা করতে পারব না। হায় রে খামখেয়ালির অহেতুক অভিমান!

আজ বড় দুঃখে আমার সেই প্রিয় গানটা মনে পড়ছে,

দু-জনে দেখা হল মধু-যামিনীতে—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে?
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, কহিছে হায় হায়—
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।—
দু-জনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝরে—
দু-জনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে;
আর তো হ'ল না দেখা জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে।

উঃ, কী পানসে উদাস আজকার ভোরের বাংলাটা! সদ্য-সুপ্তোত্থিত বনের বিহঙ্গের আনন্দ-কাকলি, আজ যেন কি রকম অশ্রুজড়িত আর দীর্ঘ-ব্যথিত।

এই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দটা কত অরুন্তুদ গভীর। ঠিক যেন গীর্জায় কোন অতীত হতভাগার চির-বিদায়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি!

নিশীথ

একটা বিরাট মহিষাসুরের মতো কি একরোখা ছুট ছুটছে এই উম্মাদ বাষ্প-রথটা। ছোটো,...ওগো আগুন আর বাষ্প-পোরা দানব, ছোটো। আর দোল দাও—দোল দাও এই তরুণ তোমার ভাইদের। ছোটো, ওগো ক্ষ্যাপা দৈত্য, ছোটো—আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে। তোমার পথের পাশে ঘুমিয়ে যারা, তাদের জাগিয়ে দিয়ে যাও তোমার এই ছোটার শব্দে।

নিশীথের জমাট অন্ধকার চিরে শান্ত বনশ্রীতে চকিত শঙ্কিত করে কত জোরে ছুটেছে এই খামখেয়ালি মাথা-পাগলা রাক্ষসটা—কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ গুণ বেগে আমার মন উল্টোদিকে ছুটেছে—সেখানে আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা গ্রামের নিরীহ অন্ধকারকে ব্যথিত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মন আমার তারি সাথে শ্বাস ফেলাচ্ছে, যে হতভাগিনীর ফুলে ফুলে উঠা দীর্ঘশ্বাস সরল-মেঠো বাতাসটিকে নিষ্ঠুরভাবে আহত করছে। আলুথালু আকুলকেশ, ধূলিলুণ্ঠিত, শিথিল-বসন, উজাড়-করে-দেওয়া আঁশুয়া-ভেজা উপাধান,—সব যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্চি আর এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন একটি গৌরবের ছোঁওয়া দিয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত শাল আর পিরাল বন কাঁপিয়ে যেন একটা পুত্র-শোকাতুরা দৈত্য-জননী ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে, ঔ—ঔ—ঔ! আর মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মতো এই ক্ষ্যাপা গাড়িটাও এপার থেকে কাৎরে কাৎরে উঠছে, উ—উ—উঃ!

গ

নৌশেরা

এস, আমার বোবা সাথী এস। আজ কতদিন পরে তোমায় আমায় দেখা! তোমার বুকে এমনি করে আমার প্রাণের বোঝা নামিয়ে না রাখতে পারলে এতদিন আমার ঘাড় মুমড়ে পড়ত।

আহ্‌, কী জ্বালা! এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম, এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অন্ধ স্মৃতিটার ব্যথা যেন বুকের উপর চেপে বসে আছে। আজ তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। হৃদয়, শক্ত হও—বাঁধন ছিঁড়তে হবে। যে তোমার কখনো হয় নি, যাকে কখনো পাবে না—যে তোমার হয়তো কখ্‌খনো হবে না, যাকে কখ্‌খনো পাবে না—যার অজানা-ভালবাসার স্মৃতিটাই ছিল তোমার সারা বক্ষ-বেদনায় ভরে সেই শহিদার স্মৃতিটাকেও ধুয়ে-মুছে ফেলতে হবে! উঃ! তা পারবে? সাহস আছে? 'না' বললে চলবে না, এ যে পারতেই হবে। মনে পড়ে কি আমাদের দেশের মা-ভাই-বোনের দেওয়া উপহার? বুঝেছিল কি যে, ওগুলি তাঁদের দেওয়া দায়িত্ব, কর্তব্যের গুরুভার? আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কষ্টিপাথরের মতো সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোক যাচাই করে নেবে যে, বাঙালীরাও বীরের জাতি। এ সময় একটা গোপন স্মৃতি-ব্যথা বুকে পুষে মুষড়ে পড়লে চলবে না। তাকে চাপা দিতেও পারবে না, নিঃশেষে বিসর্জন দিতে হবে। একেবারে বাইরের ভিতরের সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে, তবে না রিক্ততার —বিজয়ের পূর্ণরূপে ফুটে উঠবে প্রাণে। অনেকে জীবন দিয়েছে, তবু এই প্রাণপণে-আঁকড়ে ধরে-থাকা মধুস্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারে নি। তোমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে। পারবে? সাধনার সে জোর আছে? যদি না পার, তবে কেন নিজেকে 'মুক্ত' 'রিক্ত' 'বীর' বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছো? যার প্রাণের গোপনতলে এখনও কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবি করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্য প্রাণ দেবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ!

মাথার ওপর মা আমার ভাবী-বিজয় বীর-সন্তানের মুখের দিকে আশা-উৎসুক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আর পায়ের নীচে এক তরুণী তার অশ্রু মিনতিভরা ভাষায় সাধছে, যেও না গো প্রিয়, যেও না। কি করবে? নিশ্চয়ই পারবে। তুমি যে মায়া মমতাহীন কঠোর সৈনিক।

শক্ত হও হৃদয় আমার, শক্ত হও! আজ তোমার বিসর্জনের দিন! আজ

ঐ কাবুল নদীর ধারে উষর প্রান্তরটার মতোই বুকটাকে রিক্ত শূন্য করে ফেলতে হবে। তবে না তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত সুখ-দুঃখ-বৈরাগ্যের যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে পূর্ণ রিক্ততার গান ধরবে,—

ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী,—
পলকে সকলি সঁপিছে চরণে আর তো কিছুই নাই !
আরো কি তোমার চাই ?

কুর্দিস্তান

পেয়েছি—পেয়েছি। আঃ আজ দীর্ঘ এক বৎসর পরে আমার প্রাণ যেন পূর্ণ-রিক্ততায় ভরে উঠেছে বলে বোধ হচ্ছে।···এই এক বৎসর ধরে সে কী ভয়ানক যুদ্ধ মনের সাথে ! এ সময় কত কিছুই না মারা গেল।····বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ কত দুরন্ত দুর্বার। রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু সমরজিৎ ক'জন হয় ? সে কেমন একটা প্রদীপ্ত কাঠিন্য আমাকে ক্রমেই ছেয়ে ফেলেছে। সে কী সীমাহীন বিরাট শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়টা আমার ! এই কি রিক্ততা ? ভোগও নেই—ত্যাগও নেই ; তৃষ্ণাও নেই—তৃপ্তিও নেই ; প্রেমও নেই—বিচ্ছেদও নেই ; এ যেন কেমন একটা নির্বিকার ভাব। না ভাই, না, এমন তিক্ততা-ভরা রিক্ততা দিয়ে জীবন শুধু দুর্বিষহই হয়ে পড়ে। এমন কঠিন অকরুণ মুক্তি তো আমি চাই নি। এ যেন প্রাণহীন মর্মর মন্দির।

তবু কিন্তু রয়ে রয়ে মর্মরের শক্ত বুকে শুক্লা চাঁদিনীর মত করুণ মধুর হয়ে সে কার স্নিগ্ধ শান্ত আলো হৃদয় ছুঁয়ে যায় ?—হায়, ছুঁয়ে যায় বটে, আর তো তেমন নুয়ে যায় না ! দেখেছ ? আমার অহঙ্কারী মন তবু বলতে চায় যে, ওটা নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেওয়ার একটা অখণ্ড আনন্দের এক কণা শুভ্র জ্যোতিঃ।—তবু সে বলবে না যে, ওটা একটি বিসর্জিতা প্রীতিময় প্রীতির কিরণ।

আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে মুখে মেঘমুক্ত শুভ্রজ্যোৎস্না পড়ে তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মতোই দেখাচ্ছে। এদেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ করবার জিনিস। পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র আর প্রখর নয়। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তোলা আমার ফটোগুলি দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এগুলি জোৎস্নালোকে তোলা ফটো। ঠিক যেন শরৎ-প্রভাতের সোনালি রোদ্দুর।

হ্যাঁ—এ তো মস্ত আর এক মুশকিলে পড়লুম দেখছি। ডালিম ফুলের মতোই সুন্দর রাঙা টুকটুকে একটি বেদুইন যুবতী পাকড়ে বসেছে যে, তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে কী ভয়ানক জোর-জবরদস্তি! আমি যত বলছি 'না' সে তত একরোখা ঝোঁকে বলে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হ্যাঁ!' সে বলছে যে, সে আমাকে বড্ডো ভালবেসে ফেলেছে, আমি বলছি যে, আমি তাকে একদম ভালবাসি নি। সে বলছে, তাতে কিছু আসে যায় না—আমাকে ভাল-বেসেছে, আমাকেই তার জীবনের চিরসাথী বলে চিনে নিয়েছে—ব্যস। এই যথেষ্ট! আমার ওজর-আপত্তির মানেই বোঝে না সে! আমি যতই তাকে মিনতি করে বারণ করি সে ততই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে, বাঃ-রে, আমি যে ভালবেসেছি, তা তুমি বাসবে না কেন? হায়, একি জুলুম!

ওরে মুক্ত! ওরে রিক্ত! তোর ভয় নেই, ভয় নেই। এই যে হৃদয়টাকে শুষ্ক করে ফেলেছিস হাজার বছরের বৃষ্টিপাতেও এতে ঘাস জন্মাবে না, ফুল ফুটবে না, এ বালি-ভরা নীরস সাহারার ভালবাসা নেই।

যে ভালবাসবে না তাকে ভালবাসায় কে? যে বাঁধা দেবে না, তাকে বাঁধে কে? আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন, সে কি এমনি হবে?

কারবালা

এই সেই বিয়োগান্ত নিষ্করুণ নাটকের রঙ্গমঞ্চ।—যার নামে জগতের সারা মোসলেম নরনারীর আঁখি-পল্লব বড় বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে। এখানে

এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম আর দেশরক্ষার জন্যে লক্ষ-লক্ষ তরুণ বীরের হাসতে-হাসতে 'শহিদ' হওয়ার কথা। তেমনি বয়ে যাচ্ছে সেই ফোরাত নদী, যার একবিন্দু জলের জন্য দুধের ছেলে 'মাসগর' কচি বুকে জহর-মাখা তীরের আঘাত খেয়ে বাবার কোলে তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি চিরতরে মুদেছিল। ফোরাতের এই মরুময় কূলে-কূলে না জানি সে কত পবিত্র বীরের খুন বালির সঙ্গে মাখানো রয়েছে। আঃ, এ বালির পরশেও যেন আমার অন্তর পবিত্র হয়ে গেল।

কয়েকটা পাষাণময় নিস্তব্ধ গৃহ খাড়া রয়েছে জমাট হয়ে—উদার অসীম আকাশেরই মতো বিব্রত মরুভূমি তারা বালু-ভরা আঁচল পেতে চলেই গিয়েছে—ছোট দুটি তৃষ্ণাতুর দুম্বা-শিশু 'মা-মা' করে চিৎকার করতে-করতে ফোরাতের দিকে ছুটে আসছে, - শিশিরবিন্দুর মতো সুন্দর কয়েকটি বুভুক্ষু বালিকা ফোরাতের এক হাঁটু জলে নেমে আঁজলা-আঁজলা জল পান করে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছে—বালিতে আর বাতাসে মাতামাতি—এই সব মিলে কারবালার একটি করুণ চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠছে।...

কারবালা! কারবালা!! আজ তোমারই আকাশ, তোমারই বাতাস, তোমারই বক্ষের মতো আমার আকাশ বাতাস বক্ষ সব একটা বিপুল রিক্ততায় পূর্ণ।

সেদিনও সেই বেদুইন যুবতীগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই অবাধ্য অবুঝ তরুণী সে কী উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আমার পিছু-পিছু ছুটছে! আমি বাইরে বেরোলেই দেখতে পাই, সে একটা মস্ত আরবী ঘোড়ায় চড়ে ফোরাতের কিনারে-কিনারে আরবী গজল গেয়ে বেড়াচ্ছে। সে সুরের গিটকারী কত তীব্র--কী তীক্ষ্ণ! প্রাণে যেন খেদং তীরের মতো এসে বিঁধে।

আমি বললুম, 'ছি গুল, একি পাগলামি করছ?—আমার প্রাণে যে ভাল-বাসাই নেই, তা ভালবাসব কি করে?' সে তো হেসেই অস্থির। মানুষের প্রাণে যে ভালবাসা নেই, তা সে নতুন শুনলে। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমায় ভালবাসার তোমার তো কোন অধিকার নেই গুল।' সে আমার হাতটা তার কচি কিশলয়ের মতো কম্পিত ওষ্ঠপুটে ছুঁইয়ে আর মুখটা পাকা

বেদানার চেয়েও লাল করে বললে, 'অধিকার না থাকলে আমি ভালবাসছি কি কয়ে হাসিন?' এ সরল যুক্তির পরে কি আর কোন কথা খাটে?

ঘ

আজিজিয়া

কী মুশকিল! কোথায় কারবালা আর কোথায় আজিজিয়া! আর সে কতদিন পরেই না এখানে এসেছি।....তবু গুল এখানে এল কি করে?
শুনছি এদেশের সুন্দরীরা এমনি মুক্ত স্বাধীন আবার এমনি একগুঁয়ে। একবার যাকে ভালবাসে, তাকে আর চিরজীবনেও ভোলে না। এদের এ সত্যিকারের ভালবাসা! এ উদ্দাম ভালবাসায় মিথ্যা নেই, প্রতারণা নেই। কিন্তু আমি তো 'সাপে-নেউলে' ভালবাসায় বিলকুল রাজী নই। তাহলে আমার এ রিক্ততার অহঙ্কারের মাথা কাটা যাবে যে!....
কাল যখন গুল আমার পাশ দিয়ে ঘোড়াটা ছুটিয়ে চলে গেল তখন তার 'নারগিস' ফুলের মতো টানা চোখ দুটোয় কী একটা ব্যথা-কাতর মিনতি কেঁপে-কেঁপে উঠছিল! তার সেই চকিত চাওয়া, মৌন ভাষা যেন কেঁদে-কেঁদে কয়ে গেল, 'বহুৎ দাগা দিয়া তু বেরহম।'
আমি আবার বললুম, আমি যে মুক্ত, আমায় বাঁধতে পারবে না!....আমি যে রিক্ত, আমি তোমায় কি দেব? সে তার ফিরোজা রঙ-এর উড়ানিটা দিয়ে আমার হাত দুটো এক নিমেষে বেঁধে ফেলে বললে, 'এই তো বেঁধেছি, আর তুমি রিক্ত বলছো হাসিন? তা হোক আমার কুম্ভভরা ভালবাসা হতে না হয় খানিক ঢেলে দিয়ে তোমার রিক্ত চিত্ত পূর্ণ করে দেবো!'
আমি যত বলছি 'না-না'—সে তত হাসছে আর বলছে 'মিথ্যুক—মিথ্যুক—বেরহম!'
সত্যিই তো, একি নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে দিচ্ছে প্রাণে গুল! কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে তুলছ—নাঃ, এখান হতেও সরে পড়তে হবে দেখছি। আমার কিন্তু একটা কথা মনে পড়ছে 'সকল গরব হায় নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়ানে!'
ওরে আকাশের মুক্ত পাখি! ওরে মুগ্ধ বিহগী! এ কি শিকলি পরতে

চাচ্ছিস তুই তা এখনি কিছুতেই বুঝতে পারছিস নে। এড়িয়ে চল—এড়িয়ে চল সোনার শিকল…'মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে!'

কুতল-আমরা
শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি

আঃ, খোদা! কেমন করে তুমি এমন দু-দুটো আসন্ন বন্ধন হতে আমায় মুক্তি দিলে, তাই ভাবছি আর অবিশ্রান্ত অশ্রু এসে আমাকে বিচলিত করে তুলছে! এ মুক্তির আনন্দটা বড় নিবিড় বেদনায় ভরা! রিক্তের বেদন আমার মতো এমনি বাঁধা আর ছাড়ার দু'টানার মধ্যে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না!….হাঁ, এই সঙ্গে একটা নীরস হাসির বেগ কিছুতেই যেন সামলাতে পারছি নে, এই দুটো ব্যর্থ বন্ধনের নিষ্ঠুর কঠিন পরিণাম দেখে। তাই এই নিশীথে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে গাইছি, 'এই করেছো ভাল নিঠুর, এই করেছো ভাল! এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো! এই করেছো ভাল!' কি হয়েছে তাই বলছি।

সেদিন চিঠি পেলুম শহিদার, আমার গোপন ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেছে—সে সুখী হয়েছে।…মনে হ'ল, যেন এক বন্ধন হতে মুক্তি পেলেম। না-না, আর অসত্য বলব না, আমার সেই সময় কেমন একটা হিংসা আর অভিমানে সারা বুক যেন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, তাই এই ক'দিন ধরে বড় হিংস্রের মতোই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শান্তি পাই নি। এই আমাদের রক্তমাংসময় শরীর আর তারই ভিতরকার মনটা নিয়ে যতটা অহঙ্কার করি, বাইরে তার কতটুকু টিকে? যেমনি মনটাকে টিপিয়ে-টিপিয়ে এক নিমেষের জন্য দুরন্ত করে রাখি, অমনি মনে হয়, এই তো এক দরবেশ হয়ে পড়েছি! তারপরেই আবার কখন কোন ক্ষণে যে মনের মাঝে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার ক্রন্দন জুড়ে দেয়, তা আর ভেবেই পাই না। আবার, পেলেও সেটাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চাই। হায় রে মানুষ! বুঝি বা এই বন্ধনেই সত্যিকার মুক্তি রয়েছে। কে জানে! ভুলে যাও অভাগিনী শহিদা, ভুলে যাও—সকল অতীত, সব স্মৃতির বেদনা, সব গোপন আকাঙ্ক্ষা, সব কিছু। সমাজের

চারিদিককার খাঁচায় বন্দিনী থেকে কেন হতভাগিনী তোমরা এমন করে অ-পাওয়াকে পেতে চাও? কেন তোমাদের মুগ্ধ অবোধ হিয়া এমন করে, তারই পায়ে সব ঢেলে দেয়, যাকে সে কখ্‌খনো পাবে না! তবে কেন এ অন্ধ কামনা? বিশ্বের গোপনতম অন্তরে-অন্তরে তোমাদের এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনা-ধারা ফল্গু নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে এই মূঢ় ভালবাসাকে রাখতে গিয়ে তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের খুনে সমাজের আবরণ লালে লাল হয়ে গেছে, তবু সে তোমাদের এই আপনি-ভালবাসার, পূর্বরাগের প্রশ্রয় দেয় নি। তাই আজও পাথরের দেবতার মতো বিশাল দণ্ডহস্তে সে তোমাদের সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

ভুলে যাও শহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও। তোমাদের কোন ব্যক্তিত্বকে ভালবাসবার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালবাসতে হবেই।

আঃ, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের ম্লান রশ্মি পাতলা মেঘের বসন ছিঁড়ে কী মলিন করুণ হয়ে ঝরছে! গত নিশির কথাটা মনে পড়ছে আর গুরু ব্যথায় নিজেই কেঁপে-কেঁপে উঠছি।.. কাল রাত্তিরে এমনি সময়ে যখন এখানকার সান্ত্রীদের অধিনায়করূপে রিভলবার হাতে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে বেড়াচ্ছি তখন শুনলুম, পেছনের সান্ত্রী একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে "চ্যালেঞ্জ" করলে, 'হল্ট্, হু কামস্ দেয়ার?' আর একবার সে জোরে বললে, 'কৌন হ্যায়? খাড়া রহ, হিলো মৎ!' 'মাগো।—উঃ!' তারপর আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। শুধু একটা অব্যক্ত গোঙানি হাওয়ায় ভেসে এল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলাম, লাল পোশাক-পরা একটি আরব রমণী সান্ত্রীর রাইফেলটা নিয়ে ছুটছে আর সান্ত্রীর হিম দেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না কেন এতদিন ধরে আমাদের রাইফেল চুরি যাচ্ছে আর সান্ত্রী মারা পড়ছে। ওঃ, কী দুর্ধর্ষ সাহসী এই বেদুইন-রমণী! আমি পলকে স্থির হয়ে রমণীকে লক্ষ্য করে গুলী ছাড়লুম, তার গায়ে লাগল না। আর একটা গুলী ছাড়তেই বোধ হয় নিজের বিপদ ভেবেই সে সহসা আমার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল, তার

বিদ্যুদ্বেগে পাকা সিপাই-এর মতো রাইফেলটা কাঁধে করে নিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করল, খট করে "বোল্ট" বন্ধ করার শব্দ হ'ল, তারপর কি জানি কেন, সে রাইফেলটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল। আত্মরক্ষার্থে আমি ততক্ষণ "বোল্ট" বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। এই সুযোগে এক লাফে রিভলভারটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই যা দেখলুম, তাতে আমারও হাতের রিভলভারটা এক পলকে খসে পড়ল। তখন তার মুখের বোরখা খসে পড়েছে আর মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমা-শশীর পূর্ণ শ্বেত জ্যোৎস্না তার চোখে-মুখে যেন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে। আমি স্পষ্ট দেখলুম, জানু পেতে বসে বেদুইন-যুবতী গুল। তার বিস্ময়চকিত চাউনি ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার চেয়েও উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে! একটা বেদনাতুর আনন্দের আতিশয্যে সে থর-থর করে কাঁপছিল। তার প্রাণের ভাষা তারই অশ্রুর আখরে যেন আঁকা যাচ্ছিল, 'এতদিনে এমন করে দেখা দিলে নিষ্ঠুর! ছি, এত কাঁদানো কি ভাল?' পাথর কেটে কে যেন আমার চোখে অনেক দিন পরে দু-ফোঁটা অশ্রু এনে দিল।

এ কী পরীক্ষায় ফেললে খোদা! আমার এ বিস্ময়মুগ্ধ ভাব কেটে যাবার পরই মনে হ'ল, কি করা উচিত? ভয় হ'ল আজ বুঝি সব সংযম ত্যাগ সাধনা এই মুগ্ধা তরুণীর চোখের জলে ভেসে যায়! আবার এই সঙ্গে মনে পড়ল শহিদার কথা, এমনি একটি কচি অশ্রুস্নাত মুখ!....

সমস্ত কুতল—আমার মরুভূমি আর পাহাড়ের বুকে দল খাইয়ে কার জলদমন্দ্র আওয়াজ ছুটে এল, 'সেনানী, হুঁশিয়ার!'

আমার আমি যেন দেখতে পেলুম, আশীষ-বারির মঙ্গল-ঝারি আর অশ্রু-সমুজ্জ্বল বিজয়মাল্য হস্তে বাংলা আমাদের দিকে আশা উত্তেজিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।—প্রেমের চরণে কর্তব্যের বলিদান দেবো? না-না, কখ্খনো না।

আপনি-আপনি আমার কঠিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, খোদা, হৃদয়ে বল দাও! বাহুতে শক্তি দাও! আর কর্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ কর প্রাণের শিরায়-শিরায়!....

নিমেষে আমার সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীম তেজে নেচে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তলটা সোজা করে ধরলুম। সমস্ত স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে বাজ পড়ার মতো কড়-কড় করে কার হুকুম এল, 'গুলী করো!'

দ্রুম! দ্রুম!! দ্রুম!!!······ একটা যন্ত্রণা-কাতর কাতরানি—'আম্মা—মাঃ! আঃ!!'····

তারপরেই সব শেষ।

তারপরেই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লুম।···ছুটে গিয়ে গুলের এলিয়ে-পড়া দেহলতা আমার চির-তৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম। তারপর তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুটে আমার পিপাসী-ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে সংলগ্ন করে আর্ত-কণ্ঠে ডাকলুম, 'গুল—গুল—গুল!' প্রবল একটা জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মতো শুধু একরাশ ঝরা-অশ্রু তার আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অবশ অলস তার ভুজলতা দিয়ে বড় কষ্টে সে আমার কণ্ঠবেষ্টন করে ধরলে, তারপর আরও কাছে—আরও কাছে সংলগ্ন হয়ে নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। মেঘের কোলে লুটিয়ে-পড়া, চাঁদের পানসে জ্যোৎস্না তার ব্যথা-কাতর শুষ্ক মুখের সে কি একটা স্নিগ্ধ-করুণ মহিমশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল!···· সেই অকরুণ স্মৃতিটাই বুঝি আমার ভাবী জীবনের সম্বল, বাকি পথের পাথেয়। অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে চোখ খুলে আমার মুখের পানে চেয়েই চোখ বুজে বললে, "এই আশেকের" হাতে "মাশুকের" মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর নয় হাসিন? আমি শুধু পাথরের মতো বসে রইলুম। আর তার মুখে এক টুকরো মলিন হাসি কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে গেল। শেষের সেই তৃপ্ত হাসি তার ঠোঁটে আর ফুটল না, শুধু একটা ভূমিকম্পের মতো কিসের ব্যাকুল শিহরণ সঞ্চরণ করে গেল। তার বুকের লোহুতে আর আমার আঁখের আঁশুতে এক হ'য়ে বয়ে যাচ্ছিল। সে তখনও আমাকে নিবিড় নিষ্পেষণে আঁকড়ে ধরেছিল, তার চোখে-মুখে চিরবাঞ্ছিত তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল।—এই কি সে চাচ্ছিল? তবে এই কি তার নারী-জীবনের সার্থকতা?···আর একবার—আর একবার—তার মৃত্যুশীতল

ওষ্ঠপুটে আমার শুষ্ক অধরোষ্ঠ প্রাণপণে নিষ্পেষিত করে হুমড়ি খেয়ে ডাক দিলুম,—'গুল্, গুল্, গুল!' বাতাসের আহত একটা কঠোর বিদ্রূপ আমায় মুখ ভেংচিয়ে গেল, 'ভুল—ভুল ভুল—!'....

আবার সমস্ত মেঘ ছিন্ন করে চাঁদের আলোর যেন 'ফিং' ফুটছিল। গুলের নিঝুম দেহটা সমেত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলুম, এমন সময় বিপুল ঝঞ্ঝার মতো এসে এক প্রৌঢ়া বেদুইন-মহিলা আমার বক্ষ হতে গুলকে ছিনিয়ে নিলে এক উন্মাদিনীর মতো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'গুল—আম্মা—গুল—!'

প্রৌঢ়া তার মৃতা কন্যাকে বুকে চেপে ধরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠতেই আমি তার কোলে মূর্ছাতুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকলুম, 'আম্মা—আম্মা! মার মতো গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠল, 'ফর্‌জন্দ—ফর্‌জন্দ'! কাবেরী জলপ্রপাতের চেয়ে উদ্দাম একটা অশ্রুস্রোত আমার মাথায় ঝরে পড়ল।

আঃ, কত নিদারুণ সে কন্যাহীনা মার কান্না!

আমি আবার প্রাণপণে গা ঝেড়ে উঠে কাতরে উঠলুম, 'আম্মা - আম্মা—মা' '—একটা রুদ্ধ কণ্ঠের চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি পাগল হাওয়ায় বয়ে আনলে—'ফর্‌জন্দ' ....

অনেক দূরে ..পাহাড়ের ওপর হতে, সে কোন শোকাতুরা মাতার কাঁদনের রেশ ভেসে আসছিল, 'আহ—আহ—আহ!'....আরবী ঘোড়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পাষাণে আহত শব্দ শোনা গেল—খট খট খট!!!

ও

করাচি

মেঘম্লান সন্ধ্যা, সাগর বেলা

আমি আজ কাঙ্গাল না রাজাধিরাজ? বন্দী না মুক্ত? পূর্ণ না রিক্ত....

একা এই ম্লান মৌন আরব সাগরের বিজন বেলায় বসে তাই ভাবছি আর ভাবছি! আর আমার মাথার ওপর মুক্ত আকাশ বেয়ে মাঝে-মাঝে বৃষ্টি ঝরছে—রিম ঝিম ঝিম।

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

[বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে : নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।]

'কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে? আরে ছোঃ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সে-সব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতীর চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম! আর কাজেই দু'চারজন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই', কিন্তু আমার এই 'নাজোক্' জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মতো চেঁচিয়ে উঠবো! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস 'ভাই, আমায় সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে— পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে-হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপপুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠতে পারে তা আমার মতো এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

খ

'হাঁ, আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু-একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই! সেই সরকারী রাম-শ্যামের মতো পিতা-মাতার

অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর, ডাণ্ডাগুলি খেলায়, দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিশেষ খোশ ছিলেন কি না তা আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ে নাওয়াকেফ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে 'উৎপাত করলেই চিৎপাত হতে হয়।' সুতরাং এটা বলা বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয় নি, বরং ও-কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল; কারণ ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্মবহুল ফুটপাতে চিৎপাত হয়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম-বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেব রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়। থাক, আমার সে-সব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুনবে মজা ?

একদিন পাঠশালায় বসে আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস সরগরম করে আবৃত্তি করছিলুম, 'মাননীয় রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!' এতে শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কি না জানি না, জানবার অবসর পাইনি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দে, 'আরে রে দুর্বৃত্ত পামর' বলে হুঙ্কার করে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন —সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিত মশাই! যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার ভীম মশাইয়ের মতো ভীষণ পণ্ডিতমশাই অবস্থান করছিলেন, এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না। তার ক্রোধবহ্নি যে দুর্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি বিশেষ রকম উপলব্ধি করলুম তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেঘের মতো এসে আমার নাতিদীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি ধরে দেওয়ানের মাথাটায় বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে কোন নূতন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভাবন হয় নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটি' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি

করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মার খেয়ে খেয়ে ইট-পাটকেলের মতো আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মনটা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন, এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচ পোয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেক-ছানা-সম শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফঝম্ফ প্রদান করছিল। সঙ্গে-সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন তেড়ে উঠাত' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম। ক্রমে যখন দেখলুম তাঁর এ প্রহারের কবিতায় আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হ'ল না। জান ত, 'পুরুষের রাগ' আনাগোনা করে, আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁর খাঁড়ার মতো নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম। বাড়ি গিয়েও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেঁধুলাম গিয়ে একেবারে চালের মরাই-এ, উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হতে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবেন না—কি জানি কখন কি হয়! খানিক পরে—আমার সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম পণ্ডিত মশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, আমার মতো দুর্ধর্ষ বাউণ্ডুলে ছোকরার লেখাপড়া ত 'ক' অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমহাশয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাততঃ এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখু ঠুটোর মতো চাটুহস্তে মাছ মারতে হবে অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়, তার জন্যেও নাকি তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন। প্রথমতঃ অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি, পরে অবগত হলুম, পণ্ডিত মশাইয়ের অর্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি 'শ্রীমতী রাধা'—আর তাঁর এক-আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস

আছে, অবিশ্যি সেটা স্বামীদেবতার অগোচরেই সম্পন্ন হয়,—আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেদের কাছে স্বহস্তে গুড়ুক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্মস্পর্শী সুরে উপরোধ করছিলুম,—'মানময়ী রাধে, একবার মুখ তুলে গুড়ুক খাও'—আর পণ্ডিত মশাই অন্তরালে থেকে সব শুনছিলেন। আমার আর বরদাস্ত হ'ল না, চালের মরাই থেকেই উসখুস করতে লাগলুম, ইতিমধ্যে গরমেও আমি রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিত মশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতী রাধা আর তিনি যে গুড়ুক খান তা ত বিলকুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তুড়ুক করে চালের মরাই হতে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করতে লাগলুম, কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার গোলামচির মতো আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করি নি।—চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত-পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষায় 'শ্রাবণের ধারার মতো' পড়তে লাগল আমার মুখের 'পরে—পিঠের 'পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেরেছিল যে তার 'পিঠ' নাম সার্থক হয়েছে। একেই আমার ভাষায় বলে, 'পোঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।' বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই বাবা আমায় বর্ধমান এনে 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন। কি করি, আমি নাচারের মতো সহ্য করতে লাগলুম—কথায় বলে 'ধরে, মারে না, সয় ভাল।'

গ

প্রথম প্রথম শহরে এসে আমার মতো পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হয়েছিল, বিশেষ শহুরে ছোকরাদের দৌরাত্ম্যিতে সে ব্যাটারা পাড়াগেঁয়ে ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর-প্যাঁচার মতো পেয়ে বসে। যা হোক, অল্পদিনেই আমি শহুরে কায়দায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলুম। ক্রমে 'অহম'

পাড়াগেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো-চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই—আগেকার পগেয়া—খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে চলতে লাগলো। বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে-ওস্তাদি! এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি। দেখতে-দেখতে পড়া-লেখার যত না উন্নতি করলুম তার চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টোমির গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্ধমানের মতো পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মতো একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগার-ইঞ্চি ঝাড়তে তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেললে। এইরূপে ক্রমেই আমি নীচুদিকে গড়িয়ে যেতে লাগলুম—তাই বলে যে আমাদের দিয়ে কোনো ভাল কাজ হয় নি, তা বলতে পারবে না। মিশন, কুষ্ঠরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলেদের দল যা করেছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠতে পারে নি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মতো অমন অদম্য উৎসাহ ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা শুধু বই-এর পোকা। বর্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই শহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময় আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর্তের জীবন রক্ষা করেছিল। কনফারেন্সের সভা-সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ-আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা। আমাদেরই চেষ্টায় স্পোর্টস, জিম্‌নাষ্টিক, সার্কাস, থিয়েটার, ক্লাব প্রভৃতির আড্ডাগুলির অস্তিত্ব অনেক দিন ধরে লোপ পায় নি।

পিতার অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হলেও মাসহারটা ঠিক রকমের পাঠাতেন। তিনি ত আর আমার এতদূর উন্নতির অরশা করেন নি, আর এত খবরও রাখতেন না। কারণ কোনো ক্লাশে আমার 'প্রমোশন' ষ্টপ হয় নি। বহু গবেষণার ফলেও হেডমাষ্টার মশায় আবিষ্কার করতে পারেন নি—আমার মতো বওয়াটে ছেলেরা কি করে পাসের নম্বর রাখে—ভায়া, ঐখানেই ত genious-এর (প্রতিভার) পরিচয়! —'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' পরীক্ষার সময় চার-পাঁচ জোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকতই, কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না,

তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর'! তা ছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হতে তাঁর ছেলে বা অন্য কোনো ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজতচক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হতে প্রশ্ন চুরি প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্মার আয়ত্ত ছিল। সে-সব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে। যা হোক, এই রকমেই যেন-তেন-প্রকারেণ থার্ড ক্লাশের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।

বাড়ি খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভাল লাগত না। পিতাও বাড়ি না গেলেও দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুল্লে আমিই পড়তে এসেছিলুম ইংরেজী স্কুলে, তার উপর আমি নাকি পাসগুলো পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো তড়াত্তর ডিঙিয়ে যাচ্ছিলাম। কেবল একজনের আঁখি দুটি সর্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাকত, তিনি আমার স্নেহময়ী জননী। মায়ের মন ত এত শত বোঝে না, তাই দু'মাস বাড়ি না গেলেই মা কেঁদে আকুল হতেন। সংসারে মার কাছে ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ-আদর পাই নি! দুষ্ট বদমায়েশ ছেলে বলে, আমায় যখন সকলেই মারত, ধমকাত, তখন মা-ই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টুমিটাই যেন তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত। আমার পিঠে প্রহারের দাগগুলোয় তেলমালিশ করে দিতে-দিতে কতদিন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে।

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিলেন। আমি কটিদেশ বন্ধনপূর্বক, নানা ওজর-আপত্তি দেখাতে লাগলুম, কিন্তু মায়ের আদালতে ও তাঁর অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার সমস্ত ওজর বাতিল ও নামঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন ত আর কথাই নাই। তা ছাড়া কনেটি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ও-রকম কনে শ'য়ে একটি মেলে না। বয়সও বার তের হয়েছিল। ঐ বার-তের বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমথ মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আমারও

বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি, এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হোত। প্রথম-প্রথম কনে বৌ একটি পুঁটুলির মতো জড়সড় হয়ে তার নির্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে বসে থাকত। নববধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। কিন্তু অনবরত চোখ বুজে থাকা, সেও এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তা হলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে ত আর কথাই নেই। নিজেকে কাছিমের মতো তৎক্ষণাৎ শাড়ি ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলত। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসীর শাড়ির ভিতর থেকে চুরি করে আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে-না-চাইতেই সে সটান চোখ দুটোকে বুজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত, যেন আমায় দেখবার তার আদৌ গরজ নাই। আমি মুখ টিপে হাসতে-হাসতে পালিয়ে এসে বাড়িময় উচ্চৈঃস্বরে বউয়ের লজ্জা-হীনতার কথা প্রকাশ করে ফেলতুম! মা ত হেসেই অস্থির। বলতেন, 'হাঁরে, তুই কি আজন্ম এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নন, তাঁরা বউ-এর রীতিমত কৈফিয়ৎ তলব করতেন। সে বেচারার তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হ'ত, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যা হোক, এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, কিশোরী কনে আমায় ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে জ্বালাতন করতে ছাড়তেম না। আমার পাগলামির ভয়ে সে বেচারী আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দুটির ভাসা-ভাসা করুন দৃষ্টি দিয়ে হাজারবার চেয়ে-চেয়ে দেখত তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরে দিতুম—

'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে,
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যাক সে।'

ক্রমে আমারও ভালবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক-আধটু করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্খী পিতা আমার আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চলে আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারি নি। হাসতে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দুটি ধরে বলেছিলুম, 'আমার সকল দুষ্টামি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো।' সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে অব্যক্ত স্বরে কাঁদতে লাগল। আমি চোখে রুমাল চেপে কোন রকমে নিজের দুর্বলতাকে সম্বরণ করে ফেললুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ-বিদায়-সম্ভাষণ—আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ-চুম্বন! কারণ, আর তাকে দেখতে পাই নি। আমি চলে আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মতো কাঁদিয়ে চলে যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমার চলে যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, না গো না, সে মরতেই পারে না। স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতেই পারে না। সব শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা জানিয়েছে। আমি পাগলের মতো রাবেয়াদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তাদের পুরানো শোক আবার নতুন করে জেগে উঠল। বাড়িময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মতো এসে পড়ল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম। ওগো, আর তার মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ-বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও বলতে পারে নি সে! সে যাবে না, কখনও যাবে না, না। 'হায় অভিমানিনী! ফিরে এস! ফিরে এস!'

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই কেবল একটা 'ফেরু' ফেউ-ফেউ চিৎকার করে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর করে তুলছিল তখন একবার তার গোরের উপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম,—'রাবেয়া! প্রিয়তমে! একবার উঠ, আমি এসেছি, সকল দুষ্টামি ছেড়ে এসেছি।

আমার সারা বক্ষ জুড়ে সে তোমারই আলেখ্য আঁকা, তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠ, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখাবে না, কেউ জানবে না।' কবর ধরে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হু-হু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলিগাছ থোক শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা? দু একটা ধ্বসে যাওয়া কবরে দপ-দপ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গে তার কবরের মাটি মেখে আবার ছুটে এলুম বর্ধমানে। হায়, সে ত চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে ত আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এই প্রাণ-পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোন নিদর্শন যে সে রেখে যায় নি, যাতে করে আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।
সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙে চূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।

ঘ

দিন যায়, থাকে না। আমারও নীরস দিনগুলো কেটে যেতে লাগল কোন রকমে। ক্রমে ফার্স্ট ক্লাশে উঠলুম। তখন অনেকটা শুধরেছি! ইতিমধ্যে বর্ধমান নিউ স্কুল উঠে যাওয়ায়, তা ছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায় আমি রাণীগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলের হেডমাষ্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরানো ছাত্র বলে তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, আমি পড়ালেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোন ওজর-আপত্তি করি নি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর

সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মতো হয়ে পড়লুম। যে যা বলত তাতে উদাসীনের মতো 'হাঁ' বলে দিতুম। কোন জিনিস তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা যেন তখন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এই সব দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে দেবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমি আরও ভেবেছিলুম হয়ত এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে পাব, আর তার স্নেহকোমল স্পর্শ হয়ত আমার বুকের দারুণ শোক-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হবে বলে বিধাতার মন্তব্য-বহিতে লিখিত হয়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকর ভি নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পুড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরীও নয়, আর আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে ওরকম একটি পরীর কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশী, সে-সব বিষয়ে কোথাও খুঁত ছিল না। আজকাল-কার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মতো নিজে বৌ পছন্দ করে আনেন। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কালো বা কেঁদকাঠের চেয়েও এবড়ো-খেবড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমত দুধে-আলতার রং, হরিণের মত নয়ন, অন্ততঃ পটলচেরা ত চাই-ই, সিংহের মতো কটিদেশ, চাঁদের মতো মুখ, কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মতো গমন; রাতুল চরণকমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি, 'দেহি পদপল্লভম্ উদারম্' বলে তাঁর চরণধরে ধন্না দিতে হয়, আর সেই চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদাধরের পিসীর ঠ্যাংএর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহলে বেচারা একটা আরাম পাওয়া হতে যে বঞ্চিত হয়, আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরও কত কি কবি-প্রসিদ্ধির চিজবস্তু, সে সময় আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এই সব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারার জাত হলেও তাদের একটা পছন্দ আছে, তারাও ভাল বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষমানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তাদের কোনো কষ্ট দেখেও দেখি নে। মেয়েদের 'বুক ফাটে

ত মুখ ফোটে না' ভাব আমি বিলকুল না পছন্দ করি। অন্ততঃ যার সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারীরা কিছু বলতে-কইতে না পায়, তবে তাদের পোড়াকপালী নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক, আমার মতো চুনোপুঁটির এসব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার ত করবেনই না; অধিকন্তু হয়ত আমার মস্তক লোমশূন্য করে তাতে কোনো বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দেবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব-পরিণীতা সখিনার এসব গুণ থাকা সত্তেও আমি তাকে ভালবাসতে পারলুম না। অনেক রিহার্সেল দিলুম, কিছুতেই কিছু হ'ল না। হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া তুমি বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, রাবেয়া যেণ আমার হৃদয় জুড়ে রানীর মতো সিংহাসন পেতে বসেছিল, সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলত তবে 'কায়েস' 'মজনু' হয়ে লায়লীর জন্য এমন করে বনে পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, 'ফরহাদের ওরকম পরিণাম হত না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে, বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায়, বুঝেও কিছু বুঝতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধছিল। মা ক্ষুণ্ণ হলেন, বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে তালিম করতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি ফাঁক রয়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল, তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর—খোদা, একি করলুম, নিতান্ত অর্বাচীনের মতো? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেললুম? অসহ্য এই বৃশ্চি-কযন্ত্রণা কাঁটার ছুরির মতো আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল। আমি পাগল হয়ে যাবার মতো হলুম। এরই মধ্যেই রাণীগঞ্জে এসে 'টেস্‌ট একজামিনেশন' দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাস

করব কোত্থেকে ? আগেকার সে চুরিবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি ছিল না—অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে (টেস্‌টে এলাউ) হই নি, সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই সংবাদ বাবার কর্ণগোচর হবামাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ করে আমার বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে, আমার মতো কুপুত্তুরের লেখাপড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন—অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলেছিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতবেরক্ত হয়ে উঠল। 'দুত্তোর' বলে দফ্‌তর গুটালুম। পরে, যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্যে বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। আমি তাদের কথায় 'ড্যামকেয়ার' করে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু'চারদিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ফের বর্ধমানে চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গদলের ভূতপূর্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল। পিতা সব শুনে আমায ত্যাজ্যপুত্র করলেন। এক বৎসর পরে খবর এলো, সখিনা আমায় নিষ্ঠুর উপহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে, মরবার সময়ও নাকি, হতভাগিনী আমার মত পাপিষ্ঠের চরণধুলোর জন্যে কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটো বুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁদিয়ে পড়লুম 'বোম কেদারনাথ' বলে। আর এক গ্লাস জল দিতে পার ভাই ?

বাঁশী বাজছে আর এক-বুক কান্না আমার গুমরে উঠেছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হল, তখন, যখন বৈশাখের গুমট-ভরা উদাস-মদির সন্ধ্যায় বেদনাতুর পিলু-বারোঁয়া রাগিণীর ক্লান্ত কান্না হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বেরুচ্ছিল। আমাদের দু'জনারই যে এক-বুক করে ব্যথা, তার অনেকটা প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ সরল-বাঁশের-বাঁশীর সুরে। উপুড়-হয়ে পড়ে-থাকা সমস্ত স্তব্ধ ময়দানটার আশেপাশে পথ হারিয়ে গিয়ে তারই উদাস প্রতিধ্বনি ঘুরে মরছিল। দুষ্ট দয়িতাকে খুঁজে-খুঁজে বেচারা কোকিল যখন হয়রান পরেশান হয়ে গিয়েছে আর অশান্ত অশ্রুগুলো আটকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারম্বার চোখ দুটোকে ঘষে-ঘষে কলিজার মতো রক্ত-লোহিত করে ফেলেছে, তখন তরুণী কোয়েলীটা তার প্রণয়ীকে এই ব্যথা দেওয়ায় বোধ হয় বাস্তবিকই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল—কেননা, তখনই কলামোচার পাশে আমগাছটার আগডালে কচি আমের থোকার আড়ালে থেকে মুখ বাড়িয়ে সকৌতুকে সে বুক দিয়ে উঠল 'কু—কু—কু।' বেচারা শ্রান্ত কোকিল তখন রুদ্ধকণ্ঠে তার এই পাওয়ার আনন্দটা জানাতে আকুলি-বিকুলি করে চেঁচিয়ে উঠল কিন্তু ডেকে-ডেকে তখন তার গলা বসে গিয়েছে তবু অশোকগাছ থেকে ঐ ভাঙা গলাতেই তার যে চাপা বেদনা আটকে-আটকে যাচ্ছিল, তারই আঘাত খেয়ে সাঁঝের বাতাস ঝিলম-তীরের কাশের বনে মুহুর্মুহু কাঁপন দিয়ে গেল। আমি ডাক দিলুম, 'মেহের-নেগার!' কাশের বনটা তার হাজার শুভ্রশীষ দুলিয়ে বিদ্রূপ করলে, 'আ-র্!' ঝিলমের ওপারের উঁচু চরে আহত হয়ে আমারই আহ্বানে কেঁদে ফেললে, আর সে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে এসে এইটুকু বলতে পারল, 'মেহের—নেই—আর!' পশ্চিমে সূর্যের চিতা জ্বলন্ত এবং নিবে এল। বাঁশীর কাঁদন থামলো। মলয়-মারুত পারুল বনে নামলো বড় বড় শ্বাস ফেলে। পারুল বললে, 'উহু'—মলয় বললে, 'আ—হ—আঃ!'

আমি বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মনটাকে খুব একচোট বকুনি দিয়ে আনন্দ-ভৈরবী আলাপ করতে করতে ফিরতুম—আমার মতো অনেক হতভাগারই ঐ ব্যথা-বিজড়িত চলার পথ ধরে। এমন সাধা গলাতেও আমার সুরটার কলতান শুধু হোঁচট খেয়ে খেয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু লজ্জা হচ্ছিল না। আমার বন্ধু তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন দেখলুম। তিনি হেসে বললেন, 'কি য়ুসোফ! এ আসন্ন সন্ধ্যা বুঝি তোমায় আনন্দ-ভৈরবী আলাপের সময়? তুমি যে দেখছি অপরূপ বিপরীত!' আমার তখন কান্না আসছিল। হেসে বললাম, 'ভাই, তোমার শ্রীরাগেরও ত সময় পেরিয়ে গেছে।' সে বললে, 'তাইত! কিন্তু তোমার হাসি আজ এত করুণ কেন—ঠিক পাথর-খোদা মূর্তির হাসির মত হিম-শীতল আর জমাট?' আমি উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম। আদরিণী অভিমানী বধূর মতো সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলেছিল। এমন সময় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় এক-আকাশ তারা তাকে ঘিরে বললে, 'সন্ধ্যারাণী! বলি, এত মুখভার কিসের? এত ব্যস্ত হসনে লো,—ঐ—চন্দ্রদেব এল বলে।' অপ্রতিভ বেচারী সন্ধ্যার মুখে জোর করে হাসার সলজ্জ মলিন ঈষৎ আলো ফুটে উঠল। চাঁদ এল মদখোর মাতালের মত টলতে-টলতে, চোখ-মুখ লাল করে এসেই সে জোর করে সন্ধ্যাবধূর আবরু-ঘোমটা খুলে দিলে, সন্ধ্যা হেসে ফেললে। লুকিয়ে দেখা বৌটির মতো একটা পাখি বকুলগাছে থেকে লজ্জারাঙা হয়ে টিটকারি দিয়ে উঠল, ছি—ছি! তারপর চাঁদে আর সন্ধ্যায় অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়ে সন্ধ্যার চিবুক আর গাল বেয়ে খুব খানিক শিশির ঝরবার পর সে বেশ খুশী মনেই আবার হাসি-খেলা করতে লাগল। কতকগুলো বেহায়া তারা ছাড়া অধিকাংশকেই আর দেখা গেল না।

আবার বিজন কুটিরে ফিরে এলুম। চাঁদ উঠেছে, তাই আর প্রদীপ জ্বালালুম না। আর জ্বালালেও দীপশিখার ঐ ম্লান ধোঁয়ার রাশটা আমার ঘরের বুকভরা অন্ধকারকে একেবারে তাড়াতে পারবে না। সে থাকবে লুকিয়ে পাতার আড়ালে, ঘরের কোণে, সব জিনিসেরই আড়ালে; ছায়া হয়ে আমাকে মধ্যে রেখে ঘুরবে আমারই চারপাশে। চোখের পাতা পড়তে-না

পড়তে হড়পা বানের মতো হুপ করে আবার সে এসে পড়বে—যেই একটু সরে যাবে এই দীপশিখাটা। ওগো আমার অন্ধকার! আর তোমায় তাড়াবো না। আজ হতে তুমি আমার সাথী, আমার বন্ধু, আমার ভাই! বুঝলে ভাই আঁধার, এই আলোটার পেছনে খামখা এতগুলো বছর ঘুরে মরলুম! আমি বললুম, 'ওগো মেহের-নেগার! আমার তোমাকে চাই-ই। নইলে যে আমি বাঁচব না। তুমি আমার! নইলে এত লোকের মাঝে তোমাকে আমি নিতান্ত আপনার বলে চিনলুম কি করে? তুমিই ত আমার স্বপ্নে পাওয়ার সাথী! তুমি আমার, নিশ্চয়ই আমার!' চলতে-চলতে থমকে দাঁড়িয়ে সে আমার পানে চাইলে, পলাশ ফুলের মতো ডাগর টানা-টানা কাজলকালো চোখ দুটির গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে চাইলে! কলসীটি-কাঁখে ঐ পথের বাঁকেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সে রইল। তারপর বললে, 'আচ্ছা, তুমি পাগল?' আমি ঢোক গিলে, একরাশ অশ্রু ভিতর দিকে ঠেলে দিয়ে মাথা দুলিয়ে বললুম, 'হুঁ।' তার আঁখিব ঘনকৃষ্ণপল্লব-গুলিতে আঁশু উথলে এল। তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললে, 'আচ্ছা, আমি তোমারই!'

একটা অসম্ভব আনন্দের জোর ধাক্কায় আমি অনেকক্ষণ মুষড়ে পড়েছিলুম। চমকে উঠে চেয়ে দেখলুম সে পথের বাঁক ফিরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। আমি দৌড়তে-দৌড়তে ডাকলুম, 'মেহের-নেগার! সে উত্তর দিল না। কলসীটাকে কাঁখে জড়িয়ে ধরে ডান হাতটাকে তেমনি ঘন ঘন দুলিয়ে সে যাচ্ছিল। তারপর তাদের বাড়ির সিঁড়িতে একটা পা থুয়ে আমার দিকে তিরস্কার-ভরা মলিন চাওয়া চেয়ে চলে গেল। আর বলে গেল, 'ছি! পথে-ঘাটে এমন করে নাম ধরে ডেকো না। কি মনে করবে লোকে!' পথ না দেখে দৌড়তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে একবার পড়ে গেছলুম, তাতে আমার নাক দিয়ে তখনো ঝরঝর করে খুন ঝরছিল। আমি সেটা বাঁ হাত দিয়ে লুকিয়ে বললুম, 'আঃ, তাই ত! আর অমন করে ডাকব না।'

বুঝলে সখা আঁধার! যে জন্মান্ধ, তার তত বেশী যাতনা নেই যত বেশী যাতনা আর দুঃখ হয়—একটা আঘাত পেয়ে যার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। কেননা জন্মান্ধ ত কখনও আলোক দেখেনি। কাজেই এ জিনিসটা সে

বুঝতে পারে না, আর যে জিনিস সে বুঝতে পারে না তা দিয়ে তার তত মর্মাহত হবারও কোন কারণ নেই। আর এই একবার আলো দেখে তারপর তা হতে বঞ্চিত হওয়া · ওঃ, কত বেশী নির্মম নিদারুণ!

তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়ার যে প্রতিশোধ নিলে তুমি, তাতে ভাই আঁধার, আর যেন তোমায় ছেড়ে না যাই। তোমায় ছোট ভেবে এই যে দাগা পেলাম বুকে, ওঃ—তা—

সেদিন ভোরে ঝিলম-নদীর কূলে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। সে আসছিল একা নদীতে স্নান করে। কালো কসকসে ভেজা চুলগুলো আর ফিরোজা রঙের পাতলা উড়ানিটা ব্যাকুল আবেগে তার দেহলতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আকুল কেশের মাঝে সদ্যস্নাত সুন্দর মুখটি তার দীঘির কালো জলে টাটকা ফোটা পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। দূরে একটা জলপাই গাছের তলায় বসে সরল রাখাল বালক গাইছিল—

গৌরী ধীরে চলো, গাগরি ছলক নাকি যায়—
শিরোপরি গাগরি, কোমর মে ঘড়া,
পাৎরি কমরিয়া তেরি বলখ না যায়. আহা টুটু না যায় ;—
গৌরী ধীরে চলো!

আমিও সেই গানের প্রতিধ্বনি তুলে বললুম, 'ওগো গৌরবর্ণ কিশোরী, একটু ধীরে চল,—ধীরে—তোমার ভরা কুম্ভ হতে জল ছলকে পড়বে যে। অত সূক্ষ্ম তোমার কটিদেশ ভরা গাগরি আর ঘড়ার ভারে মুচকে ভেঙে যাবে যে! ওগো তন্বী গৌরী, ধীরে-ধীরে একটু চল!' আমায় দেখে তার কানের গোড়াটা সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠল। আমার দিকে সরল অনুযোগভরা কটাক্ষ হেনে সে বললে, 'ছি ছি, সরে যাও! একি পাগলামি করছ!' আমি ব্যথিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'মেহের-নেগার!' সে একবার আমার রুক্ষ কেশ, ব্যথাতুর মুখ, ধূলিলিপ্ত দেহ আর ছিন্ন মলিন বসন দেখে কি মনে করে চুপটি করে দাঁড়াল। তারপর ম্লান হেসে বললে, 'ও হল। আমার নাম "মেহের-নেগার" কে বললে? —আচ্ছা তুমি আমায় ও নামে ডাক কেন? সে তোমার কে?' আমি দেখলুম, কি একটা ভীতি আর বিস্ময় তার স্বরটাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো

করে দিয়ে গেল। তারা শঙ্কাকুল বুকে ঘন-স্পন্দন মূর্ত হয়ে ফুটল। আমারও মনে অমনি বিস্ময় ঘনিয়ে এল। দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছিল, তাই তার গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, 'আহ! তুমি তবে সে নও? না-না, তুমিই ত সেই আমার—আমার মেহের-নেগার!' অমনি হুবহু মুখ, চোখ,—অমনি ভুরু, অমনি চাউনি, অমনি কথা! না গো, না, আর আমায় প্রতারণা করো না! তুমি সেই! তুমি—' সে বললে, 'আচ্ছা মেহের-নেগারকে কোথায় দেখেছিলে?' আমি বললুম, 'কেন, খোওয়াবে!' তার মুখটা এক নিমেষে যেন দপ করে জ্বলে উঠল। তা সাদা মুখে আবার রক্ত দেখা গেল। সে ঝরনার মতো ঝরঝর করে হাসির ঝরা ঝরিয়ে বললে, 'আচ্ছা তুমি কবি না চিত্রকর?' 'আমি অপ্রতিভ হয়ে বললুম, চিত্র ভালবাসি, তবে চিত্রকর নই। আমি কবিতাও লিখি, কিন্তু কবি নই।' সে একবার হেসে যেন লুটোপুটি খেতে লাগল।
আমি বললুম, 'দেখ তুমি বড় দুষ্ট!' সে বললে, 'আচ্ছা আমি আর হাসব না।—তুমি কিসের কবিতা লেখ?' আমি বললুম, 'ভালবাসার!' সে ভিজা কাপড়ের একটা কোণ নিঙড়াতে নিঙড়াতে বললে, 'ও, তা কাকে উদ্দেশ করে?' আমি সেইখানেই সবুজ ঘাসে বসে পড়ে বললুম, 'তোমাকে মেহের-নেগার—তোমাকে উদ্দেশ করে।' আবার তার মুখে যেন কে এক থাবা আবির ছড়িয়ে দিলে। সে কলসীটা কাঁখে আর একবার সামলে নিয়ে বললে, 'তুমি কদ্দিন হতে এ রকম কবিতা লিখছ?' আমি বললুম, 'যেদিন হতে তোমাকে খোওয়াবে দেখেছি।' সে বিস্ময়ে পুলকিত নেত্রে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর বললে, 'তুমি এখানে কি কর?' আমি বললুম, 'খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখি।' সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'একদিন তোমার গান শুনব'খন। শুনাবে?' তারপর চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে বললে, 'আচ্ছা, তোমার ঘর কোনখানে?' আমি বললুম, 'ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়।' সে অবাক বিস্ময়ে ডাগর চক্ষু দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাইলে, তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি তাহলে এদেশের নও? এখানে নূতন এসেছ?' আমি তার চোখে চোখ রেখে বললুম, 'হুঁ, আমি পরদেশী।' সে চুপি-চুপি চলে গেল, আর একটিও কথা কইলে না....

আমার গলায় তখন বড্ডো বেদনা, কে যেন টুঁটি চেপে ধরেছিল। পেছন হতে ঘাসের শ্যামল বুকে লুটিয়ে পড়ে আবার ডাকলুম তাকে। কাঁখের কলসী তার টিপ করে পড়ে ভেঙে গেল। সে আমার দিকে একটা আর্তদৃষ্টি হেনে বললে, 'আর ডেকো না অমন করে!' দেখলুম তার দুই কপোল দিয়ে বেয়ে চলেছে দুইটি দীর্ঘ অশ্রুরেখা!

প্রাণপণে চেষ্টা করেও সেদিন সুরবাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না। আদুরে মেয়ের জেদ-নেওয়ার মতো তার ঝঙ্কারে শুধু একরোখা বেখাপ্পা কান্না ডুকরে উঠেছিল। আমার হাতে আমার এই প্রিয় যন্ত্রটি আর কখনও এরূপ অশান্ত অবাধ্য হয়নি, এমন একজিদে কান্নাও কাঁদেনি। আদর-আবদার দিয়ে অনেক করেও মেয়ের কান্না থামাতে না পারলে মা যেমন সেই কাঁদুনে মেয়ের গালে আরও দু-তিন থাপ্পড় বসিয়ে দেয়, আমিও তেমনি করে সুরবাহারের তারগুলোতে অত্যাচারীর মতো হাত চালাতে লাগলুম। সে নানান রকমের মিশ্রসুরে গোঙানি আরম্ভ করে দিলে। ওস্তাদজী আঙ্গুরগালা মদিরার প্রাসাদে খুব খোশ-মেজাজে ঘোর দৃষ্টিতে আমার কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে হাসতে-হাসতে বললেন, 'কি বাচ্চা, তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই— না? মনের তার ঠিক না থাকলে বীণার তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তোর বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচ্চা আর সহজ কথা। দে, আমি সুর বেঁধে দিই। ওস্তাদজী বেয়াদব সুরবাহারটার কান ধরে বারকতক মোলায়েম ধরনের কানুটি দিতেই সে শান্তশিষ্ট ছেলের মতো সুরে এল। সেটা আমার হাতে দিয়ে, সামনের প্লেট হতে দুটো গরম সিককাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'আচ্ছা একবার বাগেশ্রী রাগিণীটা আলাপ করত বাচ্চা, হাঁ,—আর ও সুরটা ভাঁজবারও সময় হয়ে এসেছে। এখন কত রাত হবে? হাঁ,—আর দেখ বাচ্চা, তুই গলায় আর একটু গমক খেলাতে চেষ্টা কর, তাহলেই সুন্দর হবে।' কিন্তু সেদিন যেন কণ্ঠভরা বেদনা! সুরকে আমার গোর দিয়ে এসেছিলুম ঐ ঝিলমদরিয়ার তীরের বালুকাব তলে। তাই কণ্ঠে যখন অতিতারের কোমল গান্ধারে উঠলুম তখন আমার কণ্ঠ যেন জীর্ণ হয়ে গেল আর তা ফেটে বেরুল শুধু কণ্ঠভরা কান্না। ওস্তাদজী দ্রাক্ষারসের নেশায় 'চড় বাচ্চা আর দু-পরদা

পঞ্চমে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সান্ত্বনাভরা স্বরে কইলেন, 'কি হয়েছে আজ তোর বাচ্চা? দে আমায় ওটা।' বাগেশ্রীর ফেঁপিয়ে ফেঁপিয়ে কান্না ওস্তাদজীর গভীর কণ্ঠ সঞ্চরণ করতে লাগল, অনুলোমে বিলোমে—সাধা গলার গমকে মীড়ে! তিনি গাইলেন, 'বীণা-বাদিনীর বীণ আজ আর রোয়ে-রোয়ে বনের বুকে মুহুর্মুহু স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে না। ওগো, তার যে খাদের আর অতিতার দুইটি তার ছিন্ন হয়ে গেছে।' আমার তখন ওদিকে মন ছিল না। আমার মন পড়ে ছিল সেই আমার স্বপ্নে-পাওয়া তরুণীটির কাছে।

ওঃ, সে স্বপ্নের চিন্তাটা এত বেশী তীব্র মধুব, তাতে এত বেশী মিঠা উন্মাদনা যে দিনে হাজারবার মনে করেও আমার অতি তৃপ্তি হচ্ছে না। সে কি অতৃপ্তির কণ্টক বিঁধে গেল আমার মর্মতলে, ওগো আমার স্বপ্ন-দেবী! ওই কাঁটা যে হৃদয়ে বিঁধছে, সেইটেই এখন পেকে সারা বুক বেদনায় টনটন করছে। ওগো আমার স্বপ্নলোকের ঘুমের দেশের রানী! তোমার সে আকাশ-ঘেঁষা ফুল, আব পরাণ পরিমলে ভরা দেশ কোথায়? সে জ্যোৎস্না-দীপ্ত কুটিব যেখানে পায়ের আলতা তোমার রক্তরাগে পাতার বুকে ছোপ দিয়ে যায়, সে কুটির কোন নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন তড়াগের তরঙ্গ-মর্মরিত তীরে!

সে স্বপ্নচিত্রটি কী সুন্দর!

সেদিন সাঁঝে অনেকক্ষণ কুস্তি করে খুব ক্লান্ত হয়ে যেমনি বিছানায় গা দিয়েছি, অমনি যেন রাজ্যের ঘুম এসে আমার সারা দেহটাকে নিষ্কম্প অলস করে ফেলছে আমার চোখের পাতায় তার সোহাগ-ভরা ছোঁয়ার আবেশ দিয়ে। শীঘ্রই আমার চেতনা লুপ্ত করে দিলে সে যেন কার শিউরে-ওঠা কোমল অধরের উন্মাদনা-ভরা চুম্বন মদিরা।....হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম! ....কে এসে আমার দুইটি চোখেই স্নিগ্ধ কাজল বুলিয়ে দিলে। দেখলুম, যেখানে আসমান আর দরিয়া চুমোচুমি করছে, সেইখানে একটি কিশোরী বীণা বাজাচ্ছে; বরফের ওপর পূর্ণ চাঁদের চাঁদনী পড়লে যেমন সুন্দর দেখায়, তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল, সূক্ষ্ম রেশমী নীল পেশোয়াজের শাসন টুটে বীণা-বাদিনীর কৈশোর-মাধুর্য ফুটে বেরুচ্ছিল আসমানের গোলাবী নীলিমায়

জড়িত প্রভাত অরুণশ্রীর মতো মহিমশ্রী হয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আমার চোখে ঘুমের রঙিন কুয়াশা মসলিনের মতো একটা ফিনফিনে পরদা টেনে দিলে। বীণার চেয়ে মধুর বীণাবাদিনীর মঞ্জু গুঞ্জন প্রেয়সীর কানে কানে কওয়া গোপন কথার মতো আমায় কয়ে গেল ঐ যে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে দরিয়ার কিনারে ঐখানে আমার ঘর। ঐখানে আমি বীণা বাজাই। তোমার ঐ সরল বীণার সহজ সুর আমার বুকে বেদনার মতো বেজেছে, তাই এসেছি। আবার আমাদের দেখা হবে সূর্যাস্তের বিদায় ম্লান শেষ আলোকতলে। আর মিল হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক অরুণ অরুণিমারক্ত নিশি-ভোরে—যখন বিদায়-বাঁশীর ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝরে পড়বে। আমি আবিষ্টের মতো আঁচল ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে তুমি স্বপ্নরানী?' সে বললে, 'আমায় চিনতে পারলে না য়ুসোফ? আমি তোমারই মেহের-নেগার।'···অচিন্ত্য অপূর্ব অনেক কিছু পাওয়ার আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে কইলুম, 'তুমি আমায় কি করে চিনলে? হ্যাঁ, আমি তোমাকেই চাইছিলুম—তবে তোমার নাম জানতুম না। আর তোমায় নাকি অনেকেই জীবনের এমনি ফাল্গুন-দিনে ডাকে? তবে শুধু কি আমাকেই দেখা দিলে, আর কাউকে না?' সে তার তাম্বুলরাগ-রক্ত পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'না—আমি তোমায় কি করে চিনব? এই হালকা হাওয়ায় ভেসে আমি সব জায়গাতেই বেড়াই; কাল সাঁঝে তাই এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে শুনলুম, তুমি আমায় বাঁশীর সুরে কামনা করছ। তাই তোমায় দেখা দিলুম····আর, হাঁ—যারা তোমার মতো এমনি বয়সে এমনি করে তাদের অজানা অচেনা প্রেয়সীর জন্য কেঁদে মরে, কেবল তাকেই দেখা দিয়ে যাই।···তবু আমি তোমারই! মেঘের কোলে সে কিশোরীর কম মূর্তি ঝাপসা হয়ে এল।

আমার ঘুম ভাঙল। কোকিল ডাকলে, 'উ - হু - উ'; পাপিয়া শুধালে, 'পিউ কাঁহা?' বুলবুল ঝুঁটি দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে বললে, 'জা—নি—নে!' ঝরা-হেনার শেষ সুবাস আর পীত-পরাগ লিপ্ত ভোরের বাতাস আমার কানের কাছে শ্বাস ফেলে গেল, 'হু—হু—হু!'

গ

আমার স্নেহের বাঁধনগুলো জোর বাতাসে পালের জীর্ণ দড়ির মতো পট পট করে ছিঁড়ে গেল। তারপর ঢেউয়ের মুখে ভাসতে ভাসতে, খাপছাড়া—ঘরছাড়া আমি এই ঝিলমে এলুম। প্রথম দেখলুম এই হিন্দুস্থানের বীরের দেশ পাঁচটা দরিয়ার তরঙ্গসঙ্কুল পাঞ্জাব, যেখানের প্রতি বালুকণা বীরের বুকের রক্ত জড়ানো—যেখানের লোকের তৃষ্ণা মিটাত দেশদ্রোহী, আর দেশ-শত্রু "জিগরের খুন"।

যে ডাল ধরতে গেলুম তাই ভেঙে আমার মাথায় পড়ল। তাই নিরাশ্রয়ের কুটোধারার মতো অকেজোর কাজ এই সঙ্গীতকেই আশ্রয় করলুম আমার কাজ আর সান্ত্বনারূপে।

ওঃ, আমার এই বলিষ্ঠ মাংসপেশীবহুল শরীর, মায়ামমতাহীন লৌহ-কপাটের মতো শক্ত বক্ষ, তাকে আমি চেষ্টা করেও উপযুক্ত ভাল কাজে লাগাতে পারলুম না খোদা! দেশের মঙ্গলের জন্য এর ক্ষয় হ'ল না!—প্রিয় ওয়াজিরিস্থানের পাহাড় আমার। তোমার দেহটাকে অক্ষয় রাখতে যদি আমার এই বুকের উপর তোমার অনেকগুলো পাথর পড়ে পাঁজরগুলো গুঁড়ো করে দিত, তাহলে সে কত সুখের মরণ হ'ত আমার! ওই ত হ'ত আমার হতভাগ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা—আমার জন্যে কেউ কাঁদবার নেই বলে হয়ত তাতে মানুষ কেউ কাঁদত না কিন্তু তোমার পাথরে মরুতে—উষ্ণ-মারুতে—শুকনো শাখায় একটা আকুল অব্যক্ত কম্পন উঠত। সেই ত দিত আত্মায় আমার পূর্ণ তৃপ্তি! আহ, এমন দিন কি আসবে না জীবনে! আচ্ছা—ওগো অলক্ষ্যের মহান স্রষ্টা! তোমার সৃষ্ট পদার্থে এত মধুর জটিলতা কেন? পাহাড়ের পাথরবুকে নির্ঝরের স্রোত বইয়েছ, আর আমাদের কত পাষাণের বুকেও প্রেমের ফল্গুধারা লুকিয়ে রেখেছ। আর তুমি যদি ভালবাসাই সৃষ্টি করলে, তবে আলোর নিচের ছায়ার মতো তার আড়ালে নিরাশাকে সঙ্গোপন রাখলে কেন? আমাকে সবচেয়ে ব্যথিয়ে তুলছে গত সন্ধ্যার কথাটা।

আবার সহসা তার সঙ্গে দেখা হ'ল সন্ধ্যেবেলার খানিক আগে। তখন

ঝিলমের তীরে তীরে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঝিঁঝিট রাগিণীর ঝম-ঝমানি ভরে উঠেছিল। সে ঠিক সেই স্বপ্নে-দেখা কিশোরীর মতোই হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকলে, 'এখানে এস'....আমি শুধোলুম, 'মেহের-নেগার, স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়?' সে বললে, 'কেন?' আমি তাকে আমার সেই স্বপ্নের কথা জানিয়ে বললুম, 'তুমিই ত সেদিন নিশি-ভোরে আমায় অমন করে দেখা দিয়ে এসেছিলে আর তোমার নামও বলে এসেছিলে। তুমি যে আমার!' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল তার বুকের বসনে দোল দিয়ে। সে বললে, 'য়ুসোফ, আমি ত মেহের-নেগার নই—আমি গুল্‌শন্।' সে কেঁদে ফেললে।...আমি বললুম, 'তা হোক, তুমিই সেই! আমি তোমাকে মেহের-নেগার বলেই ডাকব।'....সে বললে, 'এস, সেদিন গান শুনবে বলেছিলে না?' আমি বললুম, 'তুমিই গাও, আমি শুনি।' সে গাইলে,—

'ফারাকে জাঁনা মে হাম্‌নে সাকি লোহু পিয়া হেয় শারাব
কর্‌কে।
তপে আলম নে জেগর কো ভূনা উয়ো হাম্‌নে খায়া করায়
কর্‌কে॥'

আহ্! এ কোন দগ্ধ হৃদয়ের ছটফটানি! প্রিয়তমের বিচ্ছেদে আমার নিজের খুনকেই শরাবের মতো করে পান করেছি, আর ব্যথার তাপে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে কাবাব করে খেয়েছি: ওগো সাকি, আর কেন? এসরাজের ঝঙ্কার থামাতে অনেক সময় লাগবে।

আমি গাইলুম, 'ওগো, সে যদি আমার কথা শুধায়, তবে বলো যে সারাজীবন অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে আজ বেহেশতের বাইরে তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে!' সে কেঁদে, আমার মুখটা চেপে ধরে বললে, 'না না, এমন গান গাইতে নেই।' তারপর বললে, 'আচ্ছা, এই গান-বাজনায় তোমার খুব আনন্দ হয়—না?' আবার সে কোন অজানা-নিষ্ঠুরের প্রতি অভিমানে আমার বক্ষে ক্রন্দন গুমরে উঠল। আমি গাইলুম

'শান্তি কোথায় মোর তরে হয় বিশ্বভুবন মাঝে ?
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতে বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা
এই কি তোমার খুশী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা !'

বিদায়ের ক্ষণে সে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আচ্ছা তুমি আমায় ভালবাস, তাই আমি একটা ভিক্ষা চাইছি। বল, আর আমায় ভালবাসবে না, আমায় চাইবে না।' সে উপুড় হয়ে আমার পায়ে পড়ল।···চাঁদের সমস্ত আলো এক লহমায় নিবে গেল বিরাট একটা জলোমেঘের কালো ছায়ার আড়ালে পড়ে।

আমি কষ্টে উচ্চারণ করতে পারলুম, 'কেন ?' সে একটু থেমে, চোখ দুটো আঁচল দিয়ে চেপে বললে, 'দেখ, পবিত্র জিনিসের পূজা পবিত্র জিনিস দিয়েই হয়। কলুষ যা, তা দিয়ে পূতকে পেতে গেলে পূজারীর পাপের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছে।·······এই যে তোমার ভালবাসা,—হোক না তা মাদকতা আর উন্মাদনার তীব্রতায় ভরা—তা অকৃত্রিম আর প্রগাঢ় ভক্তি তাকে অবমাননা করতে আমার যে একবিন্দু সামর্থ্য নেই। আমাকে চেন না ? এই শহরে যে খুরশেদয়ান বাঈজীর নাম শুন, আমি তারই মেয়ে।' বলেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার সারা অঙ্গ কাঁপতে লাগল। সে বললে, 'রূপ-জীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য অপবিত্র। ওগো, আমার শিরায় যে অপবিত্র পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে! কেটে দেখ সে লহু রক্তবর্ণ নয়, বিষজর্জরিত মুমূর্ষুর মতো তা নীল শিয়াহ।' দেখলুম তার চোখ দিয়ে আগুনের ফিনকির মতো জ্বালাময়ী অশ্রু নির্গত হচ্ছে। বুঝলুম এ ত স্নিগ্ধ গৈরিক নির্ঝর নয়, এ যে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত দ্রবময়ী স্রোতের নিঃস্রাব।

বিছার কামড়ের মতো কেমন একটা দংশন-জ্বালা বুকের অন্তরতম কোণে অনুভব করলুম। ভাবলুম স্বভাবদুর্গন্ধি যে ফুল, সে দোষ ত সে ফুলের নয়। সে দোষ যদি দোষ হয়, তবে তা স্রষ্টার। অথচ তার বুকেও যে সুবাস আছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে অসাধারণ যে সে-ই, সাধারণে কিন্তু

তার নিকট গেলেই মুখে কাপড় দেয়, নাক সিঁটকায়....আমি ছিন্নকণ্ঠ বিহগের মতো আহত স্বরে বললুম, 'তা—তা হোক্ মেহের-নেগার। সে দোষ ত তোমার নয়। তুমি ইচ্ছা করলে কি পবিত্র পথে চলতে পার না? স্রষ্টার সৃষ্টিতে ত তেমন অবিচার নেই। আর বোধ হয় এমনই ভাগ্যাহত যারা তাদের প্রতিই তাঁর করুণা অন্ততঃ সহানুভূতি একটু বেশী পরিমাণেই পড়ে, এ যে আমরা না ভেবেই পারি নে!....আর তুমি ত আমায় সত্য করে ভালবেসেছ! এ ভালবাসায় যে কৃত্রিমতা নেই তা আমি যে আমার হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছি। আর এ প্রেমের আসল নকল দুটি হৃদয় ছাড়া সারা বিশ্বের কেউ বুঝতে পারবে না...হাঁ, আর ভালবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে, তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। নীচের লোকেরা ভাবে এ লোকটার অধঃপতন নিশ্চিত। অবশ্য একটু পা পিছলে গেলেই যে সে অত উঁচু হতে একেবারে পাতালে এসে পড়বে, তা সেও বোঝে। তাই সে কারুর কথা না শুনে সাবধানে অমনি উঁচুতেই থাকে। ....না মেহের-নেগার, তোমাকে আমার হতেই হবে। সে স্থির হয়ে বসল, তারপর মূর্ছাতুরের মতো অস্পষ্ট কণ্ঠে কইলে, 'ঠিক বলেছ য়ুসোফ, আমার সামনে অনেকেই এল, অনেকেই ডাকল; কিন্তু আমি কোনোদিন ত এমন করে কাঁদি নি যে আমার সামনে এসে তার ভরা অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হ'ত আহা, একেই ভালবাসি। এখন দেখছি তা ভুল। সময় সময় যে অমন হয় আজ বুঝছি তা ক্ষণিকের মোহ আর প্রবৃত্তির বাইরের উত্তেজনা। কিন্তু যেদিন তুমি এসে বললে, 'তুমি আমারই,' সেদিন আমার প্রাণমন সব কেন একযোগে সাড়া দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমার সব তোমারই।' ওঃ সে কী অনাবিল গভীর প্রশান্ত প্রীতির জোয়ার ছুটে গেল ধমনীর প্রতি রক্তকণিকায়! সে এমন একটা মধুর সুন্দর ভাব, যা মানুষে জীবনে একমাত্র পেয়ে থাকে,—সেটা আমি ঠিক বুঝাত পারছি নে। আমাদের এই ভালবাসার আর দরবেশের প্রেমেয় সমান গভীরতা এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যদি সেই ভালবাসা চিরন্তন হয়।' ক্লান্ত কান্তার মতো সে আমার স্কন্ধে মাথাটা ভর করে আস্তে আস্তে কইল, 'তোমাকে পেয়েও যে এই আমি তোমাকে

তাড়িয়ে দিচ্ছি, এ তোমাকে ভালবাসতে,—প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পেরেছি বলে।······আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালবাসি তারই অপমান ত করতে পারি নে আমি। এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পারব। অভাগিনী নারী জাতি, আমাদের এর চেয়েও যে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তোমরা যাই ভাব, আমাদের কাছে এ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।····ওঃ, কেন তুমি আমার পথে এলে ? কেন তোমার শুভ্র শুচি প্রেমের সোনার কাঠির পরশ দিয়ে আমার অ-জাগন্ত ভালবাসা জাগিয়ে দিলে ?—না, তোমাকে না পেলেও তুমি থাকবে আমারই। তবু আমাদের দু'জনকে দু'দিকে সরে যেতে হবে। যে বুকে প্রেম আছে সেই বুকেই কামনা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের নারীর মনকে বিশ্বাস নেই য়ুসোফ, সে যে বড়ই কোমল, সময়ে একটু তাপেই গলে পড়ে। কে জানে এমন করে থাকলে কোনদিন আমাদের এই উঁচু জায়গা হতে অধঃপতন হবে।····না-না, প্রিয়তম, আর এই কলুষবাষ্পে স্বপ্ন দর্পণ ঝাপসা করে তুলবো না।····আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। যদি হয়, তবে আমাদের মিলন হবে—ঐ—ঐখানে—যেখানে আকাশ আর দরিয়া দুই উদার অসীমে কোলাকুলি করছে।—বিদায় প্রিয়তম ! বিদায় !!' বলেই সে আমার হস্ত চুম্বন করে উন্মাদিনীর মতো ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঝড় বইছিল শন্—শন্। আর অদূরের বেণুবনে আহত হয়ে তারই কান্না শোনা যাচ্ছিল, আহ্—উহ্—আহা ! স্নায়ুচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কট কট করে বেদনা-আর্ত বাঁশগুলোর গিঁটে গিঁটে শব্দ হচ্ছিল।

একবুক ব্যথা নিয়ে ফিরে এলুম। ফিরতে ফিরতে চোখের জলে আমার মনে পড়ল—সে আমার স্বপ্নরানীর শেষ কথা। সেও এর মতোই বলেছিল, 'আমাদের মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক অরুণ অরুণিমা রক্ত নিশিভোরে যখন বিদায় বাঁশীর সুরে সুরে ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ক্ষরবে !'

ঘ

সেদিন যখন একেবারে বিস্ময়-পুলকিত আর চকিত করে সহসা আমার জন্মভূমি-জননী আমার বুকের রক্ত চাইলে, তখন আমার প্রাণ যে কেমন ছটফট করে উঠল তা কইতে পারব না····শুনলুম আমাদের স্বাধীন পাহাড়িয়া জাতিটার উপর ইংরেজ আর কাবুলের আমীর দু'জনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। আর কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে, আমাদের এই ঘরবাড়িহীন পাঠানদের বশে আনতে কেউ কখনও পারবে না। আমরা স্বাধীন—মুক্ত। সে যেই হোক না কেন, আমরা কেন তার অধীনতা স্বীকার করতে যাব? শিকল সোনার হলেও তা শিকল। না-না, যতক্ষণ এই য়ুসোফ খাঁর এক বিন্দু রক্ত থাকবে গায়ে আর মাথাটা ধড়ের সঙ্গে লাগা থাকবে ততক্ষণ কেউ কোন অত্যাচারী সম্রাট আমার জন্মভূমির এককণা বালুকাও স্পর্শ করতে পারবে না। ওঃ—একি দুনিয়াভরা অবিচার আর অত্যাচার খোদা, তোমার এই মুক্ত সাম্রাজ্যে? এই সব ছোট মনের লোকেই আবার নিজেদের "উচ্চ" "মহান" "বড়" বলে নিজেদের ঢাক পেটায়।—ওঃ, যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে, যেমন আকাশের অনেকগুলো পাখিকে ধরে এনে চারিদিকে, লোহার শিক দেওয়া একটা খাঁচার ভিতর পুরে দিলে হয়। ওঃ, আমাদের সমস্ত স্নায়ু আর মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে! আরও শুনছি দু'পক্ষেই আমাদিগকে রীতিমতো ভয় দেখানো হচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ! গাছের পাখিগুলোকে বন্দুক দেখিয়ে শিকারী যদি বলে, 'সব এসে আমার হাতে ধরা দেও, নইলে গুলী ছাড়লুম।' তাহলে কি পাখিরা এসে তার হাতে ধরা দেবে? কখনই না, তারা মরবে তবুও ধরা দেবে না—দেবে না! এ শিকারীদের বুকে যে ছুরি লুকানো আছে, তা পাখিরা আপনিই বোঝে। এ তাদের শিখিয়ে দিতে হয় না। হাঁ, আর যদিই যোগ দিতে হয়, তবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে যেখানে অন্যায় দেখবে সেইখানেই আমাদের বজ্রমুষ্টির ভীম তরবারির আঘাত পড়বে। আমার জন্মভূমি কোন বিজয়ীর চরণস্পর্শে কখনও কলঙ্কিত হয় নি আর হবেও না। শির দিব, তবু স্বাধীনতা দিব না।

তোমার পবিত্র নামের শপথ করে এই যে তরবারি ধরলুম খোদা, এ আর আমার হাত হতে খসবে না। তুমি বাহুতে শক্তি দাও!—এই তরবারির তৃষ্ণা মিটাব—প্রথমে দেশদ্রোহী শয়তানদের জিগরের খুনে, তারপর দেশ-শত্রুর কলুষ-রক্তে। আমিন!

হাঁ, আমার মনে হচ্ছে হয়ত আমার দেশের ভাই-ই আমায় হত্যা করবে জল্লাদ হয়ে! তা হোক, তবুও সুখে মরতে পারব, কেননা আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দেশের পায়েই উৎসর্গীকৃত হবে।—খোদা! আমার এ দান যেন কবুল করো।

বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে!! আচ্ছা হয়েছে!!!

আমার এই চিরবিদায়ের সময় কেন কাল মনে হ'ল, সে অভাগীকে একবার দেখে যাই। কেন সে ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না?....গিয়ে দেখলুম তার ত্যক্ত বাড়িটা ধূলি আর জঙ্গলময় হয়ে সদ্যবিধবা নারীর মতো হাহাকার করছে · আর ওকি! ঘরের আঙ্গিনায় ও কার কবর? যেন কার এক-বুক বেদনা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কার পাহাড়পারা ব্যথা জমাট হয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে মাটি আঁকড়ে রয়েছে!....কবরের শিরানে কার বুকের রক্ত দিয়ে মর্মর-ফলকে লেখা, 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও, ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা ক'রো না। একবিন্দু অশ্রু ফেলো আমার কল্যাণ কামনা করে, আমি অপবিত্র কি না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল;....আর ওগো স্বামিন্! তুমি যদি কখনও এখানে আস,—আঃ, তা আসবেই—তবে আমায় মনে করে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই। এমন আকুল প্রতীক্ষার শেষ অবসান এই দুনিয়াতেই হতে পারে না। খোদা নিজে যে প্রেমময়!—অভাগিনী গুল্‌শন্!'

আমার এক-বুক অশ্রু ঝরে মর্মর-ফলকের মলিন রক্ত-লেখাগুলিকে আরও অরুণোজ্জ্বল করে দিলে।

ঝিলমের ওপার হতে কার আর্ত আর্দ্র স্বর এপারে এসে আছাড় খাচ্ছিল,—

আগর মেয় বাগবাঁ হোতো গুল্‌শন্‌ কো
লুটা দেতো।
পাকড় করদস্তে বুলবুল কো চমন তে জাঁ
মেলা দেতো॥

হায়রে অবোধ গায়ক! তুই যদি মালী হতিস, তা হলে বুলবুলের হাত ধরে ফুলের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতিস!

অসম্ভব রে, তা অসম্ভব। খোদা হয়ত তোকে সে শক্তি দেন নি, কিন্তু যাঁদের সে শক্তি আছে ভাই, তাঁরা ত কই এমন করা ত দূরের কথা, একবার তোর এই কথা মুখেও আনতে পারে না! তোরই এই ক্ষমতা থাকলে হয়ত তুই এ গান গাইতে পারতিস নে!....

তবু আমার চিরবিদায়ের দিনে ঐ গানটা বড্ডো মর্মস্পর্শী মধুর লেগেছিল।

সাঁজের তারার সাথে যেদিন আমার নতুন করে চেনা-শোনা, সে এক বড় মজার ঘটনা।

আরব-সাগরের বেলার ওপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার বুক রঙ বেরঙ-এর শাঁখের হাড়ে ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা ভাবছিলাম সে কথা কখনো বাজে উদাস পথিকের কাঁপা গলায়, কখনো শুনি প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস ডাকে; আর ব্যথাহত কবির ভাষায় কখনো তার আচমকা একটি কথা-হারা কথা—উড়ে চলা পাখির মিলিয়ে আসা ডাকের মতো শোনায়।

সে-দিন পথ চলার নিবিড় শ্রান্তি যেন আমার অণু-পরমাণুতে আসল ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুঘুর দেশের রাজকুমারী আমার রুক্ষ চুলের গোড়াগুলি তার রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতন আঙুল দিয়ে চোখের ওপর হতে তুলে দিতে-দিতে বললে, 'লক্ষ্মীটি, এবার ঘুমাও।' বলেই সে তার বুকের কাছটিতে কোলের ওপর আমার ক্লান্ত মাথাটি তুলে নিলে। তার সইদের কণ্ঠে বীণার সুর উঠছিল,—

'অশ্রু নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।'

আমার পরশ-হরষে সদ্য-বিধবার কাঁদনের মতো একটা আহত ব্যথা টোল খাইয়ে গেল। আমি ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কণ্ঠভরা মিনতি এনে বললাম, 'আবার ঐটে গাইতে বল না ভাই!' গানের সুরের পিছু-পিছু আমার পিপাসিত চিত্ত হওয়ার পরে কোন দিশেহারা উত্তরে ছুটে চললো। তারপর ....কেউ কোথাও নেই। একা—একা—শুধু একা! ওগো, কোথায় আমার অশ্রু-নদী? কোথায় তার সুদূর পার? কোথায় বা তার ঘাট, আর সে কে কার দ্বারে? দিকহীন দিগন্ত সারা বিশ্বের অশ্রুর অতলতা

নিয়ে আরেক সীমাহারার পানে মৌন ইঙ্গিত করতে লাগলো,—'ঐ—ঐ দিকে গো, ঐ দিকে।'....

হায়! কোথায় কোন দিকে কে কি ইঙ্গিত করে?

আসল-আঁখির উদাস-চাওয়া আমার সারা অঙ্গে বুলিয়ে মলিন কণ্ঠে কে এসে বিদায়-ডাক দিল, 'পথিক, উঠ! আমার যাবার সময় হয়ে এল!' আমি ঘুমের দেশের বাদশাজাদীর পেশোয়াজ-প্রান্ত দু'হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে বললাম, 'না-না, এখনও ত আমার ওঠবার সময় হয় নি।....কে তুমি ভাই? তোমার সব কিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে উঠছে কেন?' তার গলার আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল! ভেজা কণ্ঠে সে বললে, 'আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ডো নিবিড় করে পেয়েছিলাম।....এখন আমি যাই, তুমি উঠ! আয় সই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে!'

জেগে দেখি, কেউ কোথাও নেই, আমি একা। তখন সাঁঝের রানীর কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর-বুকে নেমেছে।...জানটা কেমন উদাস হয়ে গেল!....যারা আমার সুপ্তির মাঝে এমন করে জড়িয়ে ছিল, তাদের চেতনার মাঝে হারালাম কেন? এই জাগরণের এক-জীবন কী দুর্বিষহ বেদনার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত, কী নিষ্করুণ তিক্ততায় ভরা! সেইদিন বুঝলাম, কত কষ্টে ক্লান্ত পথিকের ব্যর্থ সন্ধ্যা-পথে উদাস পূরবীর অলস ক্রন্দন এলিয়ে এলিয়ে গায়,—

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে,
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে
নাও খেয়ার নেয়ে।'

হায়রে উদাসীন পথিক! তোর সব ব্যর্থ ভাই, সব ব্যর্থ! কোথায় খেয়ার নেয়ে ভাই? কোন অচিন মাঝিকে এমন বুক-ফাটা ডাক ডাকিস তুই? কোথায় সে? কার পথ চেয়ে তোর বেলা গেল? কে সে তোর জন্ম-জন্ম ধরে চাওয়া না পাওয়া ধন? কোন ঘাটে তুই একা বসে এই সুরের জাল বুনছিস্? এ ঘাটে কি কোনদিন সে তার কলসীটি কাঁখে চলতে গিয়ে দু'হাতে ঘোমটা ফাঁক করে তোর মুখে-চোখে বধূর আধখানা পুলক-চাওয়া থুয়ে গিয়েছিল? না কি—সে তার কলম-পায়ের জল-ভেজা পদচিহ্ন দিয়ে

তোর পথের বুকে স্মৃতির আলপনা কেটে গিয়েছিল? কখনো কাউকে জীবনভরে পেলি নে বলেই কি তোর এত কষ্ট ভাই? হায় ও-পারের যাত্রী, তোমার সেই 'কবে কখন-একটুখানি-পাওয়া' হৃদয়-লক্ষ্মীর চরণ-ছোঁওয়া একটি ধূলিকণাও আজ তোমার জন্যে পড়ে নেই। বৃথাই সে রেণু পরিমল পথে-পথে খোঁজা ভাই, বৃথা!

অবুঝ মন ওসব কিছু জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার মুখে ক্ষ্যাপা মনসুরের একটি কথা 'আনল্ হক্-এর মতো যুগ-যুগান্তের ওই একই অতৃপ্ত শোর উঠছে, হায় হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! হায় আমার হারানো লক্ষ্মী!

ঘুমিয়ে বরং থাকি ভালো। তখন যে আমি স্বপ্নের মাঝে আমার না-পাওয়া লক্ষ্মীকে হাজার বার হাজার রকমে পাই। তাকে এই যে জাগরণের মধ্যে পাবার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা—বুকে-বুকে মুখে-মুখে চেপে নিতে, সেই তার উষ্ণ পাওয়াকে আমি ঘুমের দেশে স্বপনের বাগিচায় বড় নিবিড় করেই পাই। মানুষের মন মস্ত প্রহেলিকা। মন নিক্তির মতন, যখন যেদিকে ভার বেশী পায়, সেই দিকেই নুয়ে পড়ে। তাই কখনো মনে করি পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা। আবার পরক্ষণেই না—না পাওয়াটাই পাওয়া, ওই না পাওয়াতেই সকল পাওয়া লুপ্ত রয়েছে। এ সমস্যার আর মীমাংসা হ'ল না। অথচ দুই পথেরই লক্ষ্য এক। দুই স্রোতেরই লক্ষ্য সাগর-প্রিয়ার সীমা-হারা বুকে নিয়ে সমস্ত বেগ সমস্ত গতি সমস্ত স্রোত একেবারে শেষ করে ঢেলে দেওয়া, তারপর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া শুধু এক আর এক! কিন্তু এই প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' কথাটার এমন একটা নেশা আর মাদকতা রয়েছে, যেটা অনবরত আমার মনের কামনা-কিশোরীকে শিউরিয়ে তুলছে এবং বলছে, 'বন্ধনেই মুক্তি'—এই যে মানব-মনের চিরন্তনী বাণী সেটা কি মিথ্যা? না, এ সমস্যার সমাধান নেই।

আবার মনটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হ'ল না। আর তাই কাউকে জীবনভরে পাওয়াও হ'ল না।

তবে ?····

কাউকে না পেয়েও আমার মনে এ কোন আদিম বিরহী ভুবনভরা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক পুরে মুলুকে মুলুকে ছুটে বেড়াচ্ছে ? ক্ষ্যাপার পরশমণি খোঁজার মতন আমিও কোন পরশমণির ছোঁওয়া পেতে দিকে দিকে দেশে দেশে ঘুরে মরছি ? কোন লক্ষ্মীর আঁচলপ্রান্তে বাঁধা রয়েছে সে মানিক ? কোন তরুণীর গলায় রক্ষা-কবচ হয়ে ঝুলছে সে পাথর ?

ভাবতে-ভাবতে চোখে জল গড়িয়ে এল। সেই জলবিন্দুতে সহসা কার দুষ্টু হাসির চপল কিরণ ছল-ছলিয়ে উঠলো। আমি চমকে সামনে চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে প্রদীপ-হাতে সাঁজের তারা দাঁড়িয়ে তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে-কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকোচুরি খেলছে। বারে বারে উছলে-উঠা নিলাজ হাসি ঠোঁটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল-প্রদীপ কেঁপে-কেঁপে লোলুপ শিখা বাড়িয়ে সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। পাগলা হাওয়া বারে বারে তার বুকের বসন উড়িয়ে দিয়ে বেচারীকে আরো অসম্বৃত আরো বিব্রত করে তুলছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেও আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও তার পানে চেয়ে রইলাম। আমার কণ্ঠ তখন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সে ক্রমেই অস্তপারের পথে পিছু হেঁটে যেতে লাগলো। তার চোখের চাওয়া ক্রমেই মলিন সজল হয়ে উঠতে লাগলো। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার দরুন তার বুকের কাঁচলি বায়ুর মুখে কচি পাতার মতো থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। যতই সে আকাশ-পথ বেয়ে অস্ত-পল্লীর পথে চলতে লাগলো, ততই তার মুখ-চোখ মূর্ছাতুরের মতন হলদে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগলো। তারপর পথের শেষ বাঁকে দাঁড়িয়ে সে তার শেষ অচপল অনিমেষ চাওয়া চেয়ে আমায় একটি ছোট সেলাম করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিয়ায় হিয়ায় আমার শুধু একটি কাতর মিনতি মূঢ়ের মতো না-কওয়া ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছিল—'হায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মী আমার, হায় !'

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আমি কত বছর ধরে যে এই রকম করে রোজ

সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর পানে চেয়ে-চেয়ে আসছি তা কিছুতেই স্মরণ হয় না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, সে-কোন যুগে যেন আমি আজিকার মতনই এমনি করে প্রভাতের শুকতারাটির পানে শুধু উদয়-পথে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত সকাল যেন কোন প্রিয়তমার আসার আশায় নিবিড় সুখে ভরে উঠতো। রোজ প্রভাতে উদয়-পথে মুঠি মুঠি করে ফাগ-মাখা ধূলি-রেণু ছড়াতে ছড়াতে সে আসতো। তারপর আমার পানে চেয়েই সলজ্জ তৃপ্তির হাসি হেসে যেন বারে বারে আড়-নয়নের বাঁকা চাউনি হেনে বলতো, 'ওগো পথ-চাওয়া বন্ধু আমার, আমি এসেছি!' আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম, তার চাওয়ার কওয়া শুনতে পেতাম। তারপর অরুণদেব তাঁর রক্ত-চক্ষু দিয়ে আমাদের পানে চাইতেই সে ভীতা বালিকার মতো ছুটে আকাশ আঙিনা বেয়ে উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে উধাও হয়ে যেত। ছুটতে-ছুটতেও কত হাসি তার! সারাদিন আমি শুনতে পেতাম তার ঐ পালিয়ে যাওয়া পথের বুকে তার কটি-কিঙ্কিণীর রিণিঝিণি, হাতের পান্নার চুড়ির রিণিঝিণি আর পায়ের গুজ্‌রী পাঁইজোরের রুমুঝুমু। এমন করে দিন যায়। একদিন আমি বললাম, 'তুমি কি আমার পথে নেমে আসবে না প্রিয়?' সে আমার পানে একটু তাকিয়েই সিঁদুরে আমের মতো রেগে উঠে আধফোটা কথায় কেঁপে বললে, 'না প্রিয়, আমায় পেতে হলে তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে। আমি নেমে যেতে পারি নে, তোমাকে আমার পথেই উঠে আসতে হবে।' বলবার সময় অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে তার বেনারসী চেলীর আঁচলপ্রান্ত যেমন সে আনমনে জড়িয়ে যাচ্ছিল, তার চোখের চাওয়া মুখের কথা সেদিন যেন তেমনি করেই অসহ্য ব্যথা-পুলকে জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম, সে বিশ্বের চিরন্তন ধারাটি বজায় রেখেই আমার সঙ্গে মিলতে চায়। আমার সৃষ্টিছাড়া পথে বেরিয়ে পড়তে তার কোমল বুকে সাহস পাচ্ছে না। যতই ভালবাসুক না, আমার পথহারা পথে চলতে আমার বিপুল ভার বয়ে সেই অজানা ভয়ের পথে চলতে—সে যেন কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু তাই কি?

হয়ত তা ভুল। কেননা, একদিন যে সে বলেছিল, 'প্রিয়তম, এ যে

তোমার ভুলের পথ, এ পথ ত মঙ্গলের নয়। আঘাত দিয়ে তোমায় এ পথ হতে ফিরাতে হবে। তোমায় কল্যাণের পথে না আনতে পারলে ত আমি তোমার লক্ষ্মী হতে পারি নে!' সেকথা যেন আজকের নয়, কোন অজানা-নিশীথে আমি ঘুমের কানে শুনেছিলাম। তখন তা বুঝতে পারি নি।

আমি যেন কিছুতেই তার চিরন্তন ধারাটির একগুঁয়েমি সইতে পারলাম না, সেও তেমনি নিচে নেমে আমার পথে এল না।

বিদায় নেবার দিনও সে তেমনি করে হেসে গেছে। তেমনি করেই তার দুষ্টু চটুল চাউনি দিয়ে সে আমায় বারে বারে মিষ্টি বিদ্রূপ করেছে। শুধু একটা নতুন কথা শুনিয়ে গেছল, 'আর এ পথে আমাদের দেখা হবে না প্রিয়, এবার নতুন করে নতুন পথে নতুন পরিচয় নিয়ে আমাদের পূর্ণ করে চিনবো।'

তার বিদায় বেলায় দীঘল শ্বাসটি শুনেও শুনি নি, আজ আমি সারা বাতাসে যেন সেই ব্যথিত কাঁপুনিটুকু অনুভব করছি। এখন সে বাতাস নিতেও কষ্ট হয়। কবে আমার এ নিশ্বাস প্রশ্বাস টেনে নেওয়া বায়ুর আয়ু চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাবে প্রিয়? তার বিদায় চাওয়ার যে ভেজা দৃষ্টিটুকু আমি দেখেও দেখি নি, আজ সারা আকাশের কোটি কোটি তারার চোখের পাতায় সেই অশ্রুকণাই দেখতে পাচ্ছি। এখন তারা হাসলেও মনে হয়, শুধু কান্না আর কান্না। তারপর রোজ আসি রোজ যাই, কিন্তু উদয়-পথে আর তার রাঙা চরণের আলতার আলপনা ফুটলো না। এখন অরুণ রবি আসে হাসতে-হাসতে। তার সে হাসি আমার অসহ্য। পাখির কণ্ঠের বিভাস সুর আমার কানে যেন পূরবীর মতো করুণ হয়ে বাজে।

আমি বললাম, 'হায় প্রিয়তম, তোমায় আমি হারিয়েছি! দেখলাম আকাশ-বাতাস আমার সে কান্নায় যোগ দিয়ে বলছে, 'তোমায় হারিয়েছি!' তখন সন্ধ্যা—ঐ সিন্ধুবেলায়।

হঠাৎ ও কার চেনা কণ্ঠ শুনি? ও কার চেনা চাওয়া দেখি? ও কে রে, কে? বললাম, 'আজ এ বধূর বেশে কোথায় তুমি প্রিয়?' সে বললে, 'অস্ত পথে।'

সে আরও বলে গেছে, সে রোজই তার ম্লানমূর্তি নিয়ে এই অস্তপারের আকাশ আঙিনায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে আসবে। আমি যেন আর তার দৃষ্টির সীমানায় না আসি।

বুঝলাম, সে যতদিন অস্তপারের দেশে বধূ হয়ে থাকবে ততদিন তার দিকে তাকাবারও আমার অধিকার নেই। আজও সে জগতের সেই চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চলেছে। সে ত বিদ্রোহী হতে পারে না। সে যে নারী কল্যাণী। সেই না বিশ্বকে সহজ করে রেখেছে, তার অনন্ত ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে!

শুধোলাম, আবার করে দেখা হবে তবে? আবার কখন পাব তোমায়?'

সে বললে, 'প্রভাত বেলায় ওই উদয়-পথেই।'

আজ সে বধূ তাই তার সাঁজের-পথে আর তাকাই নি। জানি নে, কবে কোন উদয়-পথে কোন নিশিভোরে কেমন করে আমাদের আবার দেখা-শুনা হবে। তবু আমার আজো আশা আছে, দেখা হবেই, তাকে পাবই!

সিন্ধু পেরিয়ে ঘরের আঙিনায় যখন একা এসে ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম, তখন ভাবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি বে' করেছ?' আমি মলিন হাসি হেসে বললাম, 'হাঁ! তিনি হেসে শুধোলেন, 'তা বেশ করেছ। বধূ কোথায়? নাম কি তার?'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। শ্রীরাগের সুরে সুর-মূর্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোমটার কালো আবছায়া যেন সিয়াল কাফনের মতো পশ্চিমমুখী ধরণীর মুখ ঢেকে ফেলতে লাগলো। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর অতি কষ্টে ঐ পশ্চিম-পারের পানে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, 'অস্তপারের সন্ধ্যা-লক্ষ্মী।'

ভাবীজানের ডাগর আঁখিপল্লব সিক্ত হয়ে উঠল; দৃষ্টিটুকু অব্যক্ত ব্যথায় নত হয়ে এলো। কালো সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এলো।

রাক্ষুসী

বীরভূমের বাগ্দীদের ভাষায়

আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি,—আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন! পুরুষেরা, যাঁরা সব পর্দার আড়ালে গিয়ে মেয়েমহলে খুব জাঁদরেল রকমের শোরগোল আর হল্লা করেন, আর যাঁদের সেই বিদ্‌ঘুটে চেঁচানির চোটে ছেলেমেয়েরা ভয়ে "নফসি নফসি" করে, সেই মদ্দরাই আবার আমায় দেখলে হুঁকো হাতে দাওয়া হতে আস্তে আস্তে সরে পড়েন, তখন নাকি তাঁদের অন্দরমহলে যাবার ভয়ানক হাজত হয়! মেয়েরা আমাকে দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসী ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা ত নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে! হাজার গজ দূর থেকে বলে, "ওরে বাপ্‌রে, ঐ এল পাগলী রাক্ষুসী মাগী, পালা—পালা! খেলে, খেলে!"—কেনে? আমি কোন উনোমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগী আবাগীর বেটীর বুকে বসে তপ্তখোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুলকাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি? বলত বুন, তাদের কি "সরোকার" আছে আমায় যা-তা বলবার? কে তারা আমার? মেরেছি? - বেশ করেছি, নিজের সোয়াবীকে মেরেছি! ...শুধু মেরেছি? দা দিয়ে কেটেছি! তাতে ওদের এত বুক চড় চড় করবে কেনে? ওদের কারুর বুক থেকে ত সোয়ামীকে কেড়ে নি নাই, আর হত্যেও করি নাই, তাতে ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কি আছে? ওরা কি আমার সাতপুরুষের কুটুম না গিয়াত? যদি এই রকমই করতে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে রাখছি তখন! এক এক দা-এর কোপে ওদের সোয়ামীর মাথাগুলো ধড় থেকে

আলাদা করে দেব, মেয়েগুলোর বুক কেঁড়ে কলজেগুলো ধরে পিষে দেব; তবে না সে আমার নাম সত্যি-সত্যিই রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে!

আমায় পাগল করলে কে? এই মানুষগুলোই ত—আমি ত ফের তেমনি করেই—যেন কিছুই হয় নাই—ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে-কানাচে, পথে-ঘাটে, কাজে-কর্মে, মজলিসে-জৌলুসে আমার নামে রাক্ষুসী-রাক্ষুসী বলে কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি—এই সব মিলেই ত আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল। যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার জাগিনে তুলে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে ত এরাই! আচ্ছা তুই-ই বল ত বুন, এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভালমানুষকে খোঁচা মেরে ক্ষেপিয়ে তুললে সে দোষটা কি সেই ভালমানুষের, না, যে ভাল-মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে তাদের?

আমার সোয়ামী ছিল সিদেসাদা মানুষ, সে ত সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জানত না। সে চাষ করত, কিরষাণি করত, আমি সারাটি দিন মাছ ধরে, চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে আনতুম। তা না হলে চলবে কি করে দিদি? তখন আমাদের তিনটি পুষ্যি—বড় ছেলে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, বে-থা না দিলে উপর-নজর হবে, মেয়েটাও ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে বেড়ে উঠেছিল, আর আমার কোলপুঁছা ছোট মেয়েটিরও তখন হাঁক্কো হাঁক্কো করে দু-একটি কথা ফুটছিল। ছা-পোষা মানুষ হলেও দিদি, আমাদের সংসারে ত অভাব ছিল না কোনো কিছুর, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে। এই বিন্দি তখন নাই-নাই করে দিনের শেষে তিনটি সের চাল, তরকারির জন্যে মাছ রে, শামুক রে, গুগলি রে, পিথিমোর জিনিস যোগাড় করে আনত। তা ছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শীচরণের আশীর্বাদে করে-কর্মে দু'পয়সা ঘরে আনছিল। মেয়েটাও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু-চারটা শাক মাছ আনতো তাতেও নেহাৎ কম পয়সা হ'ত না, লুন-তেলের খরচাটা ওর বেশ দিব্যি চলে যেত। এ সবের উপর সোয়ামী বছরের শেষে চাসবাস আর কিরষাণি করে যা ধান চাল আনত, তাতে সারা বছর খুব 'মচল বচল' করে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কী ছিরিই ছিল। লক্ষ্মী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন!

এত সব কার জন্যে—ঐ ছেলেমেয়েগুলির জন্যেই ত? সারা দিনরেতে একটি সেরের বেশী চাল রাঁধতুম না। বলি, আহা, শেষে আমার ছেলেরা কষ্ট পাবে! সোয়ামী আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড়সুদ্ধু ভাতের ফেন! মেয়েমানুষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান ঠাণ্ডা। নাইবা হলুম জমিদার। আমরা ত কারুর কাছে ভিক্ষে করতুম না, চুরিদারিও করতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে-চেড়ে খেতুম। নিজেরা খেতুম, আর পালেরে পার্বণেরে যেমন অবস্থা দু-দশটা অতিথি-ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা, ওতেই ত আমার বুক ভরে ছিল দিদি। লোকে বলত, আমি নাকি বড্ডো 'কিরপণ', কারণ আমি একটি পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বললে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না। তারা ত জানত না, আমার মাথায় কী বোঝা চাপানো রয়েছে! দু-দুটো মেয়ে আর একটি ছেলের বিয়ে দিতে হবে। বাড়িতে বউ আসবে, জামাই আসবে, আমার এই মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরী হয়ে উঠবে। দুটো সাদ-আহ্লাদ আছে তাতে কত খরচ বল দিকিনি বুন? দায়ে ঠেকলে কেউ একটা পয়সা কর্জ দিয়ে চালাবে? বাপরে বাপ, এই বিন্দির অজানা নেই গো, গলায় সাপ বেঁধে পড়লেও কোন বেটী একটি ক্ষুদকণা দিয়ে শুধোয় না। তার আবার গুমোর! আমার কাছে ও-সব শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না বাপু। তবে বুঝতুম, অনেক কড়ুই রাঁড়ীর বুক চচ্চড় করত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে।

এমনি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের। আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামীর সেবা করে, ছেলেমেয়ে চরিয়ে, নাতি-পুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আর পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হয়ে গেল। আমার এত আশা ভরসা সব-তাতে চুলোর ছাই-পাঁশ পড়ল! শুনে যা দিদি, শুনে যা সব, আর যদি দোষ দেখিস ত তোর ঐ মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস, সাত উনুনের বাসী ছাই আমার পোড়া মুখে দিয়ে দিস! হায় বুন, আমার 'দুখ্‌খুর' কথা শুনলে পাথর গলে মোম হয়ে

যায়, কিন্তু গাঁয়ের এই বেদিল মানুষগুলো আমায় এতটুকু 'পেরবোধ' ত দেয়ই না, তার উপর রাত্তির-দিন নানান কথা বলে জানটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। মনে করি আমার সব পেটের কথা কারুর কাছে তন্ন-তন্ন করে বলি আর খুব একচোট কেঁদে নিয়ে মনটাকে হালকা করি। তা যারই কাছে ঘেঁসতে চাই সে মনে করে এই আমায় খেলে রে! আমি যেন ডাইনী কুহুকীরও অধম! এই "হেনেস্থা" আর ভয় করার দরুনে আমার সমস্ত মগজটা চমচম করে ধরে যায়, কাজেই আমার পাগলামি তখন আরও বেড়ে যায়। সাধে কি আমার মুখ দিয়ে এত গালিগালাজ শাপমুন্থি বেরোয় বুন? তুই সব কথা শুন আর নাথি মেরে আমার থেঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যা'!

তুই ত বরাবরই জানতিস দিদি, আমানের পাঁচুর বাপ ছিল বরাবরকার সিদেসাদা মানুষ, সে হের-ফের বা কথার প্যাঁচ বুঝত না। নাকটা সোজা-সুজি না দেখিয়ে হাতটা পিঠের দিক দিয়ে বাঁকিয়ে এনে দেখানোটা তার মগজে আদৌ ঢুকত না। কত আঁটকুড়ো নদী-ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়ে নেত, হাত হতে পয়সা ভুলিয়ে নেত, তার আর সংখ্যা নেই। ঐ নিয়ে বেচারাকে আমি কতদিন গালমন্দ দিয়িছি, কত বুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। কথায় বলে, "স্বভাব যায় না মলে"—ওর আর একটা বদ-অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, "তুমি মদ খাও ক্ষতি নেই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়!" কিন্তু সে তা শুনত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত। যাক, ওরকম দু-চারটে বদ-অভ্যাস পুরুষ-মানুষের থেকেই থাকে—ওতে তেমন আসত যেত না, কিন্তু অমন শিবের মতো সোয়ামী আমার শেষে এমন কাজ করে ফেললে, যা বুন, তুই কেন—আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মতো অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।

'জানিস ওপাড়ার রঘো বাগ্দীর ছু-তিনটে "শ্যাঙ্গা করা" কড়ুই রাঁড়ীর মেয়েটা কি-রকম পাড়া মাথায় করে তুলেছিল! ছুঁড়ী কখনও সোয়ামীর ঘর ত করেই নাই, মাঝ থেকে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর তার বাপ-মাকেই বা কি বলব,—ছি, আমারই মনে হ'ত যে, বিষ খেয়ে মরি! মাগো মা, বাগ্দী জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

তুই ত জানিস মাখন-দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগ্দীগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুতখাগীর বেটীরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বলত বুন, এতে হাসি পায় না?

হে,—আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ "ষাঁড় হয়ে ধাঁড় হওয়া" ছুঁড়ীটা ঐ শিবের মতো সোজা ভোলানাথ সোয়ামীকে আমার পেয়ে বসল। আর সত্যি বলতে কি, মিনসের চেহারাও ত আর নেহাৎ মন্দ ছিল না। ধুতি চাদর পরিয়ে দিলে মনে হ'ত একটি খাসা "ভদ্দরনুক"।

ওর যেদিন আমি পেথম এই কথাটি শুনলুম, তখন আমার মনটা যে কেমন হয়ে গেল তা বুন, তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় লোকে অত বেথা পায় না! আমি সেদিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম। অ বুন!—যে অমন মাটির মানুষ, সাত চড়ে যার রা বেরোত না সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে একটা চেলাকাঠে করে উঃ সে কী মার মারলে! কাঠটার চেয়েও বেশী ফেটে ফেটে আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল! কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তা ত আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা আমার বুকটা তখন আরো বেশী ফেটে গিয়েছিল আমি যে দিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামী আজ পর হ'ল, আমি দেখতে পেলুম আমার কপাল পুড়েছে, তখন ঠিক যেন কেউ তপ্ত লোহা দিয়ে আমার বুকের ভিতরটায় ছেঁকা দিচ্ছিল—আমি ফুঁপিয়ে উঠলুম।

সে সঙ্গে আমার যত রাগ হ'ল সেই হারামজাদী বেটীর উপর। মনে হতে লাগল এখন যদি তাকে পাই ত নখে করে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু

কোনাদিনই তার নাগাল পাই নাই। সে আমাকে দেখলেই সরে পড়ত।

গ

ক্রমেই আমার সোয়ামী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। সে আর প্রায়ই ঘরে আসত না। মুনিব-ঘরে খাটত, খেত, আর ওদের ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে থাকত। আমি, আমার ছেলে, পাড়ার সব ভাল লোক মিলে কত বুঝালুম তাকে, কিন্তু হায়, তাকে আর ফিরাতে পারলুম না, ছুঁড়ী যে ওকে যাত্ব করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল! তখন বুঝলুম এতদিনে মিনসের ভীমরতি ধরেছে! ওকে 'উনপঞ্চাশে' পেয়েছে; না নইলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোক! একদিন পায়ে ধরে জানালুম, সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেল। আমার সারা দেহ দিয়ে আগুনের মতো গরম কি একটা ঠিকরে বেরুতে লাগলো; বুঝলুম সে এত বেশী এগিয়ে গিয়েছে নরকের দিকে যে, তাকে ফেরানো যায় না।

তার উপর রাস্তায় ঘাটে ঐ বিশ্রী কথাটা নিয়ে আমার গঞ্জনা—খোঁচা। আমি ক্ষেপার মতো হয়ে পেতিজ্ঞা করলুম, শোধ নেব, শোধ নেব! তবে আমার নাম বিন্দি!

আর একদিন মাঠ হতে এসে শুনলুম, মিনসে নাকি আমার বাকস ভেঙে, জোর করে যা তু-চার পয়সা জমিয়েছিলুম সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, একটা কানাকড়িও থুয়ে যায় নাই। আরও শুনলুম, তার তু-দিন পরেই নাকি ঐ ছুঁড়ীর সঙ্গে তার সাঙ্গা হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে নাকি ঐ সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গিয়ে তার হবু শ্বশুরের 'শ্রীপাদপদ্মে' ঢেলেছে। হায়রে আমার রক্তের চেয়েও পিয়ারা টাকা! তার এই দশা হ'ল শেষে! মানুষ এত নীচুদিকে যেতে পারে? তখন ভাববার ফুরসৎ ছিল না, ঐ তু'দিনের মধ্যেই যা করবার একটা করে নিতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। ভাবতে লাগলুম কি করা যায়। দেবতার মতো লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক পা এক পা করে, আর বেশী দূরে নাই অথচ ফিরাবার

কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? তাছাড়া আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও ত একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামী যদি বেপথে যায় ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মতা আমি ত দায়ী। ধর, আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার ত আর কোনো পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক, সোয়ামীর পাপ তার 'ইস্ত্রি' নেবে না ত কি নেবে এসে শেওড়াগাছের ভূত?

আমি মনকে শক্ত করে ফেললুম। হাঁ—হত্যেই করব, যা থাকে কপালে! ভগবান, তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মতো "উচ্ছুগু" করব, তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডন করে আমাকে শুধু দুখ্খু আর কষ্ট দাও! আমার তাই আনন্দ!

সে সাঁজে একটু ঝিমঝিম বিষ্টির পর মেঘটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখতে পেলুম, আমার সোয়ামী একা। ঐ আবাগীদের বাড়ির পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খাটের খুরোয় র‍্যাঁদা বুলোচ্ছে! কি করতে হবে ঝাঁ করে ভেবে নিলুম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগলের মতো ছুটে এসে দা-টা বের করে নিলুম। সাঁজের সূর্যটার লাল আলো দা-টার উপর পড়ে চকমক করে উঠল—ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল—ঝিম ঝিম ঝিম! বাড়ির পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল,—

রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।

আমি আঁচলে দা-টা লুকিয়ে দৌড়ে বাঘিনীর মতো গিয়ে, ওঃ কী যে জোরে তার বুকে চেপে বসলুম! সে হাজার জোর করেও আমায় উলটিয়ে ফেলতে পারলে না। তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে গেল। তখন সে দৌড়ে পাশের পাটক্ষেতটায় গিয়ে চিৎকার করে পড়ল। আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে

ছুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হতে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর খালি লাল আর লাল! আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে বেড়াতে লাগল। তারপর কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই।

যেদিন আমার বেশ জ্ঞান হ'ল, সেদিন দেখলুম আমি একটা নতুন জায়গায় রয়েছি, আর তার চারিদিকে সে কতই রং বেরং-এর লোক! আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই দেখে যে, আমিও তাদের মাঝে খুব জোরে জাঁতা পিষছি! এতদিনের পর সূর্যের আলো—ওঃ, সে কত সুন্দর সাদা হয়ে দেখলো! এর আগে চোখের পাতায় শুধু একটা রং ধু ধু করত। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ওটা সিউড়ির জেলখানা। আমার সাত বছরের জেল হয়েছে। এই মাত্তর তিন মাস গিয়েছে। আমি নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে সব কথা নিজে মুখে স্বীকার করেছিলুম। তবে আমার শাস্তি অত হ'ত না—দারোগাবাবু গাঁয়ে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করায় আমি নাকি তাকে খ্যাংরাপেটা করে বলেছিলুম, সে যেন জোর-জুলুম না করে গাঁয়ে, সে-ই নাকি সাহেবকে বলে এত শাস্তি দিইয়ে দিয়েছে।

মাগো মা! সে কী খাটুনি জেলে! তবু দিদি, যতদিন মনে ছিল না কিছু, ততদিন যে' বেশ ভাল ছিলুম। জ্ঞান হয়ে সে কী জ্বালা! তখন কাজের অকাজের মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেই ফিং দিয়ে ওঠা হালকা রক্ত। ওঃ, কত সে রক্তের তেজ! বাপরে বাপ, সে কথা মনে পড়লে আমি এখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ি! মাথাটা যখন কাটা গেল, তখন ঐ আলাদা ধড়টা, কাৎলা মাছকে ডেঙায় তুললে যেমন করে ঠিক তেমনি করে কাৎরে কাৎরে উঠছিল। এত রক্তও থাকে গো একটা এতটুকু মানুষের দেহে! আমি একটুকুও আঁধারে থাকতে পারতুম না ভয়ে। কেননা তখন স্পষ্ট এসে দেখা দিত সেই মাথাছাড়া দেহটা আর দেহছাড়া মাথাটা! ওঃ —

তারপর দিদি, কোন জাত নাকি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসে দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌তে বসলেন, তার সব কয়েদীরা খালাস পেল। আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম।

দেখলি দিদি, ভগবান আছেন! তিনি ত জানেন আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামী দেবতাকে নরকে যাবার আগেই

ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার! আর পুরুষেরা ওরকম চেঁচাবেই;—কারণ তারা দেখে আসছে যে সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম পেথম এই পুরুষদের মতোই চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামী ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত তাতে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, 'হ্যাঁ, ও রকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত!' কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ।

তা ছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদাসর্বদা কি রকম মোচড়ে মোচড়ে উঠত তা কে বুঝত বল দেখি বন? নিজে হাতে কাটলেও সে ত ছিল আমার নিজেরই সোয়ামী! কোন জজ নাকি তাঁর নিজের ছেলের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তা হলেও—অত শক্ত হলে—তাঁর বুকে কি এতটুকুও লাগে নাই ঐ হুকুমটা দিবার সময়? আহা, যখন তার বুকে বসে একটা পেরকাণ্ড রাক্ষসীর মতোই তার গলায় দা-টা চেপে ধরলুম, তখন আঃ, কী মিনতিভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল! চোখে কী সে একটা ভীত চাউনি, আমার কাছে ক্ষমা চাইছিল—আঃ—আঃ!

জেলে রাত্তির-দিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কোনো কিছু ভাববার সময় পেতুম না। মনটাকেও ভাববারই যে সময় দিতুম না। কাজের উপর কাজ চাপিয়ে তাকে এত বেশী জড়িয়ে রাখতুম যে, শেষে কখন যে ঘুম এসে আমাকে অবশ করে দিয়ে যেত, তা বুঝতেই পারতুম না। এখন, যেদিন ছাড়া পেলুম, সেদিন আমার সমস্ত বুকটা কিসের কান্নায় হা-হা করে চেঁচিয়ে উঠল। এতদিন যে বেশ ছিলুম এই জেলের মাঝে। এতদিন আমার মনটা যে খুব শান্ত ছিল। এখন এই ছাড়া পেয়ে আমি যাই কোথা? ওঃ, ছাড়া পাওয়ার সে কী বিষের মতন জ্বালা!

ঘরেই এলুম। দেখলুম, আমার ছেলে বে করেছে। বেশ টুকটুকে বেণীপরা বৌটি! আমি ফিবে এসেছি শুনে গাঁয়ের লোকে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল; বললে, গাঁয়ে এবার মড়কচণ্ডী হবে। বাপরে, সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী এবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে, এবার আর রক্ষা নাই—নির্ঘাত যমালয়! পেথম পেথম আমি তাদের কথায় কান দিতুম না। মনে করলুম, 'কান করেছি ঢোল, কত বলবি বল।' শেষে কিন্তু আর কান না দিয়েও যে পারলুম না। তাদের বলার মাঝে যে একটুও থামা ছিল না। যেন কিছুই হয় নাই এই ভেবে আমি আমার বৌ বেটা নিয়ে ঘর-সংসার নতুন করে পাতলুম, লোকে তা লণ্ডভণ্ড করে দিলে। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলুম, কেউ বিয়ে করলে না, বললে, 'রাক্ষসীর মেয়ে রাক্ষসী হবে, এ ডাহা সত্যি কথা।' এতদিন যে বেথাটা আমি দু'হাত দিয়ে চাপা দিতে চাইছিলুম সেইটাই দেশের লোক উসকে উসকে বের করে চোখের সামনে ধরতে লাগল। সোনার চাঁদ ছেলে আমার একটি কথাও শুনলে না, আমার যে কেমন করে কি হ'ল তা ভুলেও কোনো কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলে না, খুশী হয়ে আমাকে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিলে, কেননা সে বুঝেছিল যা গিয়েছে তার খেসারতের জন্যে আর একজনকে হারাব কেন? আর এই কড়ুই রাঁড়ী আঁটকুড়ীরা যারা আমার সাতপুরুষের গিয়াত কুটুম নয়, তারা কিনা রাত্তির-দিন খেয়ে না-খেয়ে লেগে গেল আমার পেছনে। দেবতাদের শাপের মতো এসে আমার সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে। আমার ছেলেকে তারা একঘরে পতিত করলে, তাতেও তাদের সাধ মিটল না। নানান পেকারে—নানান ছুতোয় এই দুটো বছর ধরে কি না কষ্টই দিয়েছে এই গাঁয়ের লোকে! দিদি, পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না। এতে যে ভালমানুষেরই মাথা বিগড়ে যায়, আমার মতো শতেকখুয়ারী ডাইনী রাক্ষসীর ত কথাই নাই। তাও দিদি, খুবই সয়ে থাকি, নিতান্ত বিরক্ত না করে তুললে ওদের গালমন্দ দিই না। বত্রিশ নাড়ী পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয়!

এই ত তুই সব শুনলি দিদি, এখন বল, দোষ কার? আর তুই ঐ হাতের মালসাটা আমার মাথায় ভেঙে আমার মাথাটা চৌচির করে দে—সব পাপের শাস্তি হোক্!···ওঃ ভগবান!!

আজকার প্রভাতের সঙ্গে শহরে আবির্ভূত হয়েছেন এক অচেনা দরবেশ। সার মস্থনের মতো হুজুগে, লোকের কোলাহল উঠেছে পথে, ঘাটে, মাঠে—বাইরে সব জায়গায়। অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যম্পশ্যা জেনানাদের হেরেম নিস্তব্ধ নীরব—যেমন রোজই থাকে তুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল'র একটেরে! বাইরে উঠছে কোলাহল—ভিতরে ছুটছে স্পন্দন!

সবারই মুখে এক কথা, 'ইনি কে? যাঁর এই আচমকা আগমনে নূতন করে আজ নিশিভোর উষার পাখির বৈতালিক গানে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁপে উঠল আগমনীর আনন্দ ভৈরবী আর বিভাস?' ছুটেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই একই পথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দরবেশকে দেখতে। তবুও দেখার বিরাম নাই। তুঃশাসন টেনেই চলেছে কোন দ্রৌপদীর লজ্জাভরণ এক মুক বিস্ময়-বিস্ফারিত-অক্ষি বিশ্বের চোখের স্থমুখে, আর তা বেড়েই চলেছে। তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ওগো, অলক্ষ্যে যে এমন একটি দেবতা রয়েছেন যিনি গোপনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন না।

দরবেশ কথাই কয় না, একেবারে চুপ।

অনেকে বায়না ধরলে, দীক্ষা নেবে; দরবেশ ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। যে নিতান্তই ছাড়ে না, তাকে বলে, কাপড় ছেড়ে আয়। সে ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব আমিরানাপানের জামা-জোড়া পরে আসে। দরবেশ শুধু হাসে আর হাসে, কিছুই বলে না।

শহরের কাজী শুনলেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে শুরু করলেন দরবেশের কাছে। দরবেশ যতই আমল দিতে চায় না, কাজী-সাহেব ততই নাছোড়-বান্দা হয়ে লেগে থাকেন। দরবেশ বুঝলে এ ক্রমে 'কমলিই ছোড়তা নেই' গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার মুখে ফুটে উঠল ক্লান্ত সদয় ঈষৎ রেখা।

খ

দরবেশ বললে, 'শুন কাজী সাহেব, আমি যা বলব তাই করতে পারবে?'
কাজী সাহেব আস্ফালন করে উঠলেন, 'হাঁ হুজুর, বান্দা হাজির।'
দরবেশ হাসলে, তারপর বললে, 'দেখ কাল জুম্মা মুল্লুকের বাদশা আসছেন এখানে। নামাজ পড়বার সময় তোমায় ইমারতি করতে বলবেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ করতে পারবে?' কাজী সাহেব বলে উঠলেন, 'আলবৎ! কি করতে হবে?'
দরবেশ বললে, 'তোমার দু'বগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারপর যেই নামাজে দাঁড়াবে, অমনি মদের বোতল দুটি দিব্যি জায়-নামাজের উপর ভেঙে দেবে।'
কাজী সাহেবের মুখ হয়ে গেল ভয়ে নীল। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'হুজুর, তাহলে আপনি আমা হতে মুক্তি পাবেন সত্যি কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধড় হতে আলাদা হয়ে যাবে—কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?'
দরবেশ বললে, 'অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও ত দেখতে হবে!'
কাজী সাহেব চলে এলেন। ভাবলেন, যা থাকে অদৃষ্টে, কাল নিয়ে যাওয়া যাবে দুটো মদের বোতল মসজিদে। দরবেশ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী জানে!

গ

বাদশাহ এসেছেন। সঙ্গে আছে সেনা-সামন্ত উজির-নাজির সব। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। 'এনাম' (আচার্য) হয়েছেন কাজী সাহেব। একটু পরেই কাজী সাহাবের বগলতলা হতে খসে পড়ল দুটি ধেনো মদের বোতল। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মসজিদ ভরিয়ে তুললে তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলে যে, কাজী সাহেবের মতো মাতাল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়নি, হবেও না। যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যাকে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই নিস্তারও নেই।
বৈঠক বসল, এ অসমসাহসিক মাতালের কি শাস্তি দেওয়া দরকার। উজির

ছাড়া সভাস্থ সকলেই বললে, 'এর আর বিচার কি জাঁহাপনা? শূলে চড়ানো হোক্।' মন্ত্রী উঠে বললেন, 'এ বান্দার গোস্তাকী মাফ করতে আজ্ঞা হয় হুজুর। আমার বিবেচনায় এর মতো পাপিষ্ঠলোকের মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। সবচেয়ে বেশী শাস্তি দেওয়া হবে যদি তার পদ আর পদবী কেড়ে নেন, আর যা কিছু সম্পত্তি তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। মৃত্যুদণ্ড হলে ত সব ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু এই যে তার জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা তা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারবে।' বাদশা সমেত সভাস্থ সকলেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তাই ভাল।'

পাশ দিয়ে উড়ো খইয়ের মতো একটা পাগল যা তা বকে যাচ্ছিল, 'এই সব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই ত চন্দন। আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না ভাই স্নিগ্ধই হয়।'

ঘ

বাদশার দরবারে কাজী সাহেব যখন এই রকম লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে সব হারিয়ে একটা অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে পথের কুকুরও কাঁদে। "হাতী আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।" তিনি যখন শহরের কাজী ছিলেন, তখন হয়তো ন্যায়ের জন্যেও যাদিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই সময় পেয়ে উত্তম মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যাদিগকে অবিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তার চেয়ে শূলে চড়ে মৃত্যুও ছিল শ্রেয়ঃ।

এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছুঁয়ে গেল। আচমকা একে ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মতো। কাজী সাহেব বুকের শুকনো হাড়গুলোকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'খোদা! এমনি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে!'

'ওগো দরবেশ, কোথায় তুমি? কোন সুদূরের পারে?'

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মতো বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে

কাজী সাহেব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে পৌঁছলেন তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগভরা ছোঁয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে। তবুও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দরবেশ, দীক্ষিত কর।—আমি এসেছি, আর যে সময় নাই!'

পূরবীর মীড়ে, সন্ধ্যা-গোধূলির সম্মিলনে যে একটা ব্যথার কাঁপুনি বয়ে গেল তা কেউ লক্ষ্য করলে না।

কার শান্ত শীতল ক্রোড় তাকে জানিয়ে দিলে, 'এই যে বাপ! এস! এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার সব চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে।'

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠল,—

> বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন কুঁন গরং পীরে মাগা গোয়েদ।
> কে সালেক বেখবর না বুদ জেরাহোরসমে মঞ্জেল হা।
> জায়নামাজে শারাব-রঙিন কর, মুর্শেদ বলেন যদি।
> পথ দেখায় যে, জানে যে সে পথের কোথায় অন্ত আদি।

সৎমা-তাড়ানো মাতৃহারা মেয়ের মতো অশ্রু আর অভিমান-আর্দ্র মুখে একটা ভারী কালো মেঘ সব ঝাপসা করে ক্রমে অন্ধকার করে দিলে।

কাজী সাহেব প্রাণের বাকি সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে ভাঙা গলায় বললেন, 'কে? ওগো পথের সাথী! তুমি কে?'

অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে গেল আর্ত-গভীর প্রতিধ্বনি, তু—মি—কে?

খেয়া পার হতে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কয়ে গেল, 'মাতাল হাফিজ।'

'ওঃ! কী বুক-ফাটা পিয়াস! সালিমা! একটু পানি খাওয়াতে পারিন বোন? আমার কেন এমন হল, আর কি করেই এ কপাল পুড়ল, তাই জিজ্ঞেস করছিস—না? তা আমার সে 'দরগ'-মাথা-রোনা শুনে আর কি হবে বহিন? খোদা করে, তুই চির-এয়োতি হ। এ সব পোড়াকপালীর কথা শুনলেও যে তোদের অমঙ্গল হবে ভাই। খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়! তোর যদি মেয়ে হয় সামিমা, তাহলে তখনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস, বুঝলি? নইলে চিরটা কাল আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটার্তে হবে!

তুই ত আজ দশ বছর এ গাঁ ছাড়া, তাই সব কথা জানিস না। সেই ছোট্টটি গিয়েছিলি, আজ একেবারে খোকা কোলে করে বাপের বাড়ি এসেছিস··· আমি পাগল হয়ে গেছি ভেবে সবাই দূর হতে দেখেই পালায়। আচ্ছা তুই ত জানিস ভাই, আর আমায় এখনও ত দেখছিস, সত্যি বল ত আমি কি পাগল হয়েছি? হাঁ, ঠিক বলেছিস, আমি পাগল হই নি,—নয়?

সে বার—ঠিক মনে পড়ে না কতকাল আগে—বিধাতার অভিশাপ যেন কলেরা আর বসন্তের রূপ ধরে আমাদের ছোট্ট শান্ত গ্রামটির উপর এসে পড়েছিল, আর ঐ অভিশাপে পড়ে কত মা, কত ভাই বোন, কত ছেলে মেয়ে গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ-খাঁ মহাশূন্যতা রেখে কোন সে অচিন মুল্লুকে উধাও হয়ে গেল তা মনে পড়লে—মাগো মা—জানটা যেন সাত পাক খেয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। কত যে ঘরকে ঘর উজার হয়ে তাতে তালাচাবি পড়ল—আর গ্রামে যেমন এক-একটি করে ভিটে নাশ হতে লাগল, তেমনি এই গোরস্থানে গোরের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে উঠল যে, আর তার দিকে তাকানই যেত না।

আচ্ছা ভাই, এই যে দীঘির গোরস্থান, আর এই যে হাজার হাজার কবর, এগুলো কি তবে আমাদের গাঁয়ের একটা নীরব মর্মন্তুদ বেদনা—অন্তঃসলিলা ফল্গুনিঃস্রাব—জমাট বেঁধে অমন গোর হয়ে মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে? না কি আমাদের মাটির মা তাঁর এই পাড়াগাঁয়ে চির দরিদ্র জরাব্যাধি-প্রপীড়িত ছেলেমেয়েগুলির দুঃখে ব্যাথিত হয়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরাম-দায়িনী জননীর মতো মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছেন? তাঁর এই মাটির রাজ্যে ত দুঃখ ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আসতে পারে না। এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্ত শান্তি—কর্মক্লান্ত মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি—এ একটা ঘুমের দেশ নিঝুমের রাজ্যি! আহা, আজ সে কত যুগের কত লোকেই যে এই গোরস্থানে ঘুমিয়ে আছে তা এখন গাঁয়ের কেউ বলতে পারবে না। আমি আর কতজনকেই বা মরতে দেখলুম? এরা যখন মরেছিল আমি তখন হয়ত এমনি একটা অ-দেখার "কোকাফ মুল্লুকে" ঘুরছিলুম, তারপর যখন আমায় কে এই দুনিয়াই এনে ফেলে দিলে—আর দুনিয়ার এই আলোকের জ্বালাময় স্পর্শে আমার চক্ষু ঝলসে গেল, তখন আমি নিশ্চয় অব্যক্ত অপরিচিত ভাষায় কেঁদে উঠেছিলুম, ওগো, এ মাটির —পাথরের দুনিয়ায় কেন আমায় আনলে? কেন, ওগো, কেন? তারপর মায়ের কোলে শুয়ে যখন তার দুধ খেলুম, তখন প্রাণে কেমন একটা গভীর সান্ত্বনা নেমে এল। আমি আমার সমস্ত অতীত এক পলকে ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরানো। তখন ছিল বাদশাহী আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল "ওলীনগর" বলে একটা মাঝারি গোছের শহর। ঐ যে সামনে "রাজার গড়" আর "রানীর গড়" বলে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাকতেন তখনকার রাজা রানী—রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন লাল জওয়াহের। আর কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ঐ যে পীর সাহেবের দরগা ওরই বর্দোয়ায় নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুলি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই।

পশ্চিম হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে উড়ে হয়ত এই গোরস্থানের উপর এসে পড়েছে। আচ্ছা ভাই, খোদার কী আশ্চর্য মহিমা! রাজা, যার অত ধন, মালমত্তা, অত প্রতাপ, সেও মরে মাটি হয়, আর যে ভিখারী খেতে না পেয়ে তালপাতার কুঁড়েতে কুঁকড়ে মরে পড়ে থাকে সেও মরে মাটি হয়! কী সুন্দর জায়গা এ তবে বোন?

তুই ঠিক বলেছিস ভাই সালিমা, কেঁদে কি হবে, আর ভেবেই বা কি হবে! যা হবার নয় তা হবে না, যা পাবার নয় তা পাব না। তবু পোড়া মন ত মানতে চায় না। এই যে একা কবরস্থানে এসে কত রাত্তির ধরে শুধু কেঁদেছি কিন্তু এত কান্না এত ব্যাকুল আহ্বানেও ত কই তাঁর এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি কি এতই ঘুমুচ্ছেন? কী গভীর মহানিদ্রা সে? আমার এত বুকফাটা কান্নার এত আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কি তাঁর কানে গেল না? সে কোন মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায় বিভোর তিনি? আমিও কেন অমনি জড়ের নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়িনি? আমারও প্রাণে কেন মৃত্যুর ঐ রকম শান্তশীতল ছোঁয়া লাগে না? আমিও কেন দুপুর রাতের গোরস্থানের মতোই নিথর নিঝুম হয়ে পড়ি না? তা হলে ত এ প্রাণপোড়ানো অতীতটা জগদ্দলশিলার মতো এসে বুকটা চেপে ধরে না। সেই সে কোন ভুলে-যাওয়া-দিনের কুলিশকঠোর স্মৃতিটা তপ্ত-শলাকার মতো এসে এই ক্ষত কক্ষটায় ছ্যাঁকা দেয় না। জোবেহ্ করা জানোয়ারের মতো আর কতদিনে এ নিদারুণ জ্বালায় ছটফট করে মরব! কেন মৃত্যুর মাধুরী মায়ের আশীষধারার মতো আমার উপর নেমে আসে না? এ হতভাগিনীকে জ্বালিয়ে কার মঙ্গল সাধন করছেন মঙ্গলময়? তাই ভাবি—আর ভাবি কোন কূলকিনারা পাই, না, এর যেন আগাও নেই, গোড়াও নেই। কি ছিল—কি হ'ল,—এ শুধু একটা বিরাট গোলমাল।

সেদিন সকালে ঐ পাশের চারাধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে একটি রাখাল বালক কোথা হতে শেখা একটা করুণ গান গেয়ে যাচ্ছিল। গানটা আমার মনে নেই, তবে তার ভাবার্থটা এই রকম,

কত নিশিদিন সকাল সন্ধ্যা হয়ে গেল, কত বার মাস কত যুগ-যুগান্তরের অতীত ঢলে পড়ল, নদ-নদী সাগরে গিয়ে মিশল, আবার কত সাগর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল, কত নদী পথ ভুলে গেল, আর সে কত গিরিই না গেল, তবু ওগো বাঞ্ছিত, তুমি তো এলে না। গানটা শুনছিলুম আর ভাবছিলুম, কি করে আমার প্রাণের ব্যাকুল কান্না এমন করে ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। ওগো, ঠিক এই রকমই যে একটা মস্ত অসীম কাল আমার আঁখির পলকে পলকে যেন কোথা দিয়ে কোথা চলেছে, আর আমি কাকে পাবার—কি পাবার জন্যে শুধু আকুলিবিকুলি মিনতি করে ডাকছি, কিন্তু কই, তিনি ত এলেন না—একটুকু সাড়াও দিলেন না। তবে দুপুর রোদ্দুরে ঘুনঘুনে মাছির মুখে ঐ যে খুব মিহি করুণ গুন্‌গুন্‌ সুর শুনি এই গোরস্থানে, ও কি তাঁরই কান্না? দিনরাত ধরে সমস্ত গোরস্থান ব্যেপে প্রবল বায়ুর ঐ যে একটানা হু-হু শব্দ, ও কি তাঁরই দীর্ঘশ্বাস? রাত্তিরে শিরিষফুলের পরাগমাখা ঐ যে ভেসে আসে ভারি গন্ধ, ও কি তাঁরই বর অঙ্গের সুবাস? গোরস্থানের সমস্ত শিরিষ, শেফালি আর নীল ভুঁই-কদমের গাছগুলিকে আর্দ্র করে ঐ যে সন্ধ্যে হতে সকাল পর্যন্ত শিশির ক্ষরে, ও কি তাঁরই গলিত বেদনা? বিজুলীর চমকে ঐ যে তীব্র আলোকচ্ছটা চোখ ঝলসিয়ে দেয়, ও কি তাঁরই বিচ্ছেদ-উন্মাদ হাসি? সৌদামিনীর স্ফুরণের একটু পরেই ঐ যে মেঘের গভীর গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই, ও কি তাঁর পাষাণবক্ষের স্পন্দন? প্রবল ঝঞ্ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকে, ও কি তাঁরই অশরীরী আত্মার ব্যাকুল আলিঙ্গন? গোরস্থানের পাশ দিয়ে ঐ যে "কুসুর" নদী বয়ে যাচ্ছে; আর তার চরের প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশফুলের বনে বনে দোলদোলা দিয়ে ঘন বাতাস শনশন করে ডেকে যাচ্ছে, ও কি তাঁর কম্পিতকণ্ঠের আহ্বান? আমি কেন ওঁরই মতো অমনি অসীম, অমনি বিরাট-ব্যাপ্ত হয়ে ওঁকে পাই না? আমি কেন অমনি সবারই মাঝে থেকে ঐ অ-পাওয়াকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করি না? এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন যে দিন শেষ হয়ে এল, ঐ শুন নদীপারের বিদায়গীত শুনা যাচ্ছে খেয়াপারের ক্লান্ত মাঝির মুখে,—

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—
এবার তবে গভীর করে ফেলগো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে !

খ

এই যে গোরস্থান যেখানে আমার জীবনসর্বস্ব দেবতা শুয়ে রয়েছেন, শেশব হতে এই জায়গাটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। ঐ যে অদূরে ছোট ছোট তিনটি কবর দেখতে পাচ্ছ প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে মিশে সমান হয়ে গেছে, আর উপরটা কচি দূর্বা ঘাসে ছেয়ে ফেলেছে, ওগুলি আমার ছোট ভাই-বোনদের কবর ! ওরা খুব ছোটতেই মারা গিয়েছিল—আমের কচি বৌল ফাগুনের নিষ্ঠুর করকাস্পর্শে ঝরে পড়েছিল। ওই যে ওদের শিয়রে বকম ফুলের গাছগুলি দেখতে পাচ্ছ, ওগুলি আমিই লাগিয়েছিলুম, আমি তখন খুবই ছোট। এখন অযতনে বোয়ার ঝোপ আর আলগা লতায় ও জায়গাটা ভরে উঠেছে। আগে ওদের কবরের উপর ওদেরই মতো কোমল আর পবিত্র রকম ও শিরিষফুলের হলদে রেণু ঝরে পড়ত সারা বসন্ত আর শরৎকালটা ধরে। আর তার চেয়ে বেশী ঝরে পড়ত ঐ তিনটি ক্ষুদ্র সঙ্গীতের বিচ্ছেদ-ব্যথিত অন্তর-দরিয়া মথিত করে আকুল অশ্রুর পাগলা-ঝোরা ! বাবা আমার মাকে ধরে ধরে নিদাঘের বিষাদগভীর সন্ধ্যায় এই সরু পথ বেয়ে নিয়ে যেতেন, আর আমার 'টুনু'র 'তাহেরা'র অরে আবুলের ঘাসে চাপা ছোট কবরগুলি দেখিয়ে বলতেন, এইখানে তারা ঘুমিয়ে আছে, তারা আর উঠে আসতে পারে না। অনেক দিন বাদে আমরাও সব এসে ওদেরই পাশে শুব—আমাদেরও অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গাঁয়ের লোকে। সেই সময় সেই বেদনাপ্লুত বিয়োগ-বিধুর সন্ধ্যায় কি একটা আবছায়া আবেশ করুণ সুরে যে আমার সারা বক্ষ ছেয়ে ফেলত, তা প্রকাশ করতে পারতুম না, তাই বাবার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন, ডুকরে কেঁদে উঠতুম। বাবা অপ্রতিভ হয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমলস্পর্শে সান্ত্বনা দিতেন। সেই থেকে জায়গাটার উপর

আমার এত মায়া জন্মে গেছিল যে, আমি রোজ মাকে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে এসে আমার ভাই-বোনদের ঐ ছোট্ট তিনটি কবরের দিকে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে থাকতুম—আচ্ছা ভাই, রক্তের টান কি এত বেশী ? সেখানে আমার কচি ভাই-বোনগুলির ফুলের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে গেছে, সেই ভীষণ করুণ জায়গাটি দেখবার জন্যেও প্রাণে এমন ব্যাকুল আগ্রহ উপস্থিত হ'ত কেন ? শুনেছি যে জায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের পয়দা করেন, নাকি ঠিক সেই জায়গাতেই আমাদের কবর হয়, আর তাই আমরা স্বতঃই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। এখন তাহেরার কবরটি যেমন ধ্বসে পড়েছে আর ওর মধ্যে একটি ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়ত সে কত বছর বাদে আমারও কবর এরকম ধ্বসে যাবে আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট হয়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে ! হায় রে মানুষের পরিণতি ! তবু মানুষ এত অহঙ্কার করে কেন আমি তাই ভাবি—আর ভাবি ! আমার দু-এক সময় মনে হয় সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে, সে কোন অজানা দেশে চ'লে যেতে হবে, মনে হ'লে জানটা যেন গুরুবেদনায় টন-টন করে ওঠে, পৃথিবীর প্রতি এক অন্ধ মূঢ় নাড়ীর টান আমাদের। তারপর বাবাও আবুলের পাশে গিয়ে শয়ন করলেন, বড় ঝোপের পাশের ঐ বড় কবরটা বাবার। বাবা মরে যাবার পর আমি আরও বেশী করে কবরস্থানে যেতুম, স্তব্ধ হয়ে বসে রইতুম আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের মৌন সাদরের ভাষা শুনব বলে ; একটা নিবিড় বেদনায় চোখের পাতা ভরে উঠত। এই সব বেদনা, অপমান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মা আমার দিন-দিন রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছিলেন। উপর্যুপরি অত আঘাত তিনি আর সইতে পারছিলেন না। ক্রমে তাঁকে ভীষণ যক্ষ্মারোগ ধরল। আমি বুঝলুম আমার কপাল পুড়েছে, মাও আমায় ছেড়ে চলেছেন, তাঁর ডাক পড়েছে। আমি আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেও সাহস করলুম না—উঃ, সে কী সূচীভেদ্য অন্ধকার !

এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় সইমা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'সই, আমার ছেলে গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সে তোদের দোওয়াতে এবার খুব সম্মানের সঙ্গে বি-এ পাস করেছে।

এবার ছেলের বিয়েটা দিয়ে বৌকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে সংসার হতে সরে পড়ি। আর তা ছাড়া একা—ধর, বৌ নেই, বেটী নেই, দিন-রাত ঘরটা যেন পোড়োবাড়ির মতো খাঁ-খাঁ করছে। খোদা ত দেননি আমায় যে দু'দিন জামাই-বেটী নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করব। ছেলে এতদিন জেদ ধরেছিল বি. এ. পাস করে বিয়ে। তা খোদা তার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতদিন আমার ছেলে বে' করলে দু-একটি খোকা-খুকী হ'ত না কী তার ঘরে? আর আমারও ঘরটা তা হলে অনেক মানাত, তা যখনকার তখন না হলে তোর আমার কথায় ত কিছু হয় না। আমার হাতের কাছে লক্ষ্মী শান্ত মা আমার··হীরের টুকরো বৌ থাকতে আবার কোন গরীবের বেটীকে আনতে যাব ঘরে, বলেই আমার মাথাটা সস্নেহে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা আর আমি বোকার মতো শুধু অবাক বিস্ময়ে সইমার দিকে চেয়েছিলুম, একি পাগলের মতো তিনি বলে যাচ্ছিলেন! মার দুর্বল বক্ষ স্পন্দিত করে ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। সইমা মায়ের বুকে খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে-দিতে তেমনি সহজভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'আমার ছেলের উপর বরাবরই বিশ্বাস আছে, সে কখনও আমার একটি কথা অমান্য করেনি। যেমন বললুম, ওরে আজিজ, তোর সইমা যে তোর শাশুড়ী হবে রে, "বেগম"কে আমার বৌ করে ঘরে আনতে চাই, তোর বৌ পছন্দ হবে ত আবার? আজকাল ত বাবা তোরা মা বাপের পছন্দে বে' করিস না কিনা তাই—আমাকে আর বেশী বলতে হ'ল না। সে খুব খুশী হয়েই বললে, বেশ ত মা-জান, তোমার কথার ত আর কখনও অবাধ্য হইনি, আর তুমি যে আমার কোনো জমিদারবাড়িতে বে' না দিয়ে একটি অনাথ গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ, এতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে দুনিয়ার লোককে জড় করে দেখাই আমার মায়ের মতো উঁচু মন আর কার আছে। আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে কিনা, আর সে যে আবদার ধরেছে যখন, তখনই তাই পূর্ণ করেছি কিনা, তাই ওর চোখে আমার মতো মা নাকি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যায় না। সে যাক, এখন বোন, আমি আজই বেগমকে দোওয়া করে যাব, কেননা হায়াত মউত গালি না, কখন কি হয় বলা ত যায় না—তোর আবার এই

রকম খাটে-মাত্নরে অবস্থা। আমি মনে করছি এই মাসের মধ্যেই ব্যাটাকে-বৌকে বরণ করে ঘরে তুলি। শুভকাজে বিলম্ব করা ভাল নয়, আর তাতে গ্রামের অনেকে অনর্থক কতকগুলো বাধা-বিপত্তি করবে সই। মা বেগম আমার শূন্যপুরী পূর্ণ করুক যেয়ে!" সইমা আর কি বলেছিলেন ঠিক মনে নাই, কেননা আমার মাথা তখন বন-বন করে ঘুরছিল। মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা তীব্র উত্তেজনা ঘুরপাক খাচ্ছিল,—একটা হঠাৎ-পাওয়া নিবিড়-বেদনায় আনন্দের আঘাতে কে যেন আমার সমস্ত শরীরে নিশা করে দিচ্ছিল।

গ

খুব ধুমধামে আমাদের বে' হয়ে গেল। ধুমধাম মানে আতসবাজি, বাজনা, বাইনাচ, থিয়েটার প্রভৃতি যে সকল অসাধু কলুষ আনন্দের কথা বুঝ তোমরা তার কিছুই হয়নি, আর যদি ধুমধাম মানে নির্দোষ পবিত্র আনন্দের বিনিময় বুঝায়, তা হলে তার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। গ্রামের সমস্ত গরীব-দুঃখীকে সাতদিন ধরে সুন্দররূপে ভাল-ভাল খাবার খাওয়ান হয়েছিল। অনেকের পুরানো ঘর নূতন করে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাদের হালের গরু না থাকায় সমস্ত জমিজমা পতিত হয়েছিল, তাদের গরু কিনে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের তাঁতী দু-ঘরকে দুটি তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাদের দেশী কাপড় বুনায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার এতিমখানায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সে সব আরও কত জায়গায় কত টাকা দিয়েছিলেন মা যে, তা আমার এখন সব মনে নেই।

সইমা আমায় বধূ করে যত খুশী হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখিত হয়েছিল গ্রামের লোকেরা, আর ওঁর আত্মীয়-কুটুম্বেরা। ওঁদের অনেক আত্মীয় ছোট ঘরে বে' দেওয়ার জন্যে বে-র নিমন্ত্রণে একেবারেই আসেননি। এমন কি, এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। অনেক হিতৈষী মিত্রও শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তবে পয়সার খাতির সব জায়গাতেই, তাই অনেক চতুর মাতব্বর লোক এদের সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব

রেখে ভিতরে-ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগল। সমাজে পতিত না হলেও বিশেষ কাজ বনাম স্বার্থ ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে আসত না। কিন্তু যে সব সহায়হীন গরীব বেচারারা জন্মাবধি এ বাড়ির সাহায্যে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে তারা সমাজের এ চোখরাঙানি দেখে শুধু উপরে-উপরে ভয় করে চলত। তারা জানত, সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্বল তার তত জোরে টুঁটি চেপে ধরতেই সমাজ ওস্তাদ। যেখানে উল্টো সমাজকেই চোখ রাঙিয়ে চলবার মতো শক্তিসামর্থ্যওয়ালা লোক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সমাজ নিতান্ত শান্তশিষ্টের মতোই তার সকল অনাচার আবদার বলে সয়ে নিয়ে থাকে। তাই উনি আর ওঁর মা বললেন, 'আমাদের সমাজই নাই ত সমাজচ্যুত করবে কে?' সমাজ তবুও সুবোধ শিশুর মতো কোনো সাড়াই দিলে না, কিন্তু ওঁদের বাড়িতে যে সব গরীব বেচারারা আসত তাদের খুব কড়াভাবেই শাসন করা হ'ল, যেন কেউ ওঁদের বাড়ির ছায়াও না মাড়ায়।

লোকের এরূপ ব্যবহারে আদৌ দুঃখিত না হয়ে ওঁরা বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্রদের সেই আনন্দোদ্ভাসিত মুখে অশ্রু ছল-ছল চোখে যে একটা মধুর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছিল, তারই জ্যোতি ওঁদের হৃদয় আলোয় আলোময় করে দিয়েছিল; উল্টোদিকে পরশ্রীকাতর লোকদের চোখ-মুখ ভয়ানকভাবে ঝলসে দিয়েছিল।

ওঃ, সে কী অমানুষিক শক্তি ছেয়ে ফেলেছিল মায়ের ঐ ঝাঁঝরা বুক, আমার বিদায়ের দিনে! মায়ের আনন্দের আকুল ধারা যেন কোথাও ধরছিল না সেদিন! হাজার কাজের ভিতর হাসির মাঝে অশ্রু উথলে পড়েছিল তাঁর!

আমার জীবন কিন্তু সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই দিন—যে দিন বুঝলুম আমার হৃদয়-দেবতাও তাঁর মাতৃদত্ত আশীর্বাদ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন। আমার প্রাণের গোপন পূজা আরাধ্য দেবতার পায়ে বৃথা নিবেদিত হয় নাই।

আমার শুধু ইচ্ছা হ'ত আমি তাঁর পায়ে মাথা কুটি আর বলি, ওগো স্বামিন! ওগো দেবতা! এত আনন্দ দিয়ো না এ ক্ষুধিতাকে। প্রেমের এত

আকাশ ভাঙা ঘন বৃষ্টি ঢেলে দিও না এ চির মরুময় হৃদয়ে—সকল মন-দেহ-প্রাণ ছেয়ে ফেলো না তোমার ও ব্যাকুল ভালবাসার ব্যগ্র নিবিড় আলিঙ্গনে। আমার ছোট্ট বুক যে এত আনন্দ এত ভালবাসা সইতে পারবে না—কিন্তু হায়, তাঁর ও ভুজবন্ধনে ধরা দিয়ে আমার আর কিছুই থাকত না, আমি আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে যেতুম! এ যেন স্বপ্নে পরীস্থানে গিয়ে প্রিয়তমের অধীর বক্ষে মাথা রেখে সুপ্ত বধির হয়ে যাওয়া, প্রাণের সকল স্পন্দন, দেহের সমস্ত রুধির অবাক স্তব্ধ হয়ে থেমে যাওয়া - শুধু তুমি আর আমি—অনুভব করা, সে-কোন অসীম সিন্ধুতে বিন্দুর মতো মিশে যাওয়া!

তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের আলোর জ্যোতির মতো হয়ে ফুটে উঠত, তখন শুধু ভাবতুম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হতে পারে! এর এতটুকু ছোঁয়ায় সে কী কোমলতার স্নিগ্ধ পূত সুরধনী বয়ে যায় সারা বিশ্বের অন্তরের অন্তর দিয়ে। দেবতা বলে কী কোনো কথা আছে? কখ্‌খনো না, মানুষই যখন এই রকম উচ্চ হতে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব বলে কোনো কিছু একটা মনে থাকে না—সে দেখে,'সব সুন্দর আর আনন্দময়, তখনই মানুষ দেবতা হয়। দেবতা বলে কোনো আলাদা জীব নাই।

যাক ওসব কথা এখন—কি বলছিলুম? হাঁ, আমার বিয়ের মতো এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায়সম্বলহীন আমাদের ঘরে সৈয়দবংশের বি. এ. পাস করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপকথার ঘুঁটে-কুড়োনীর বেটীর সাথে বাদশা-জাদার বিয়ের মতোই ভয়ানক আশ্চর্য ঠেকেছিল সকলের চোখে! গ্রামের মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়েছিল—বাপ্‌রে বাপ্, মেয়েটার কি পাঁচপুয়া কপাল!' তারা এও বলতে কসুর করে নি যে, আমি আবাগী নাকি রূপের ফাঁদ পেতে অমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে বেমালুন কয়েদ করে ফেলেছিলুম। এত বলেও যখন তারা একটুও ক্লান্ত হ'ল না, তখন সবাই একবাক্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, বুনিয়াদী খান্দানে এমন একটা খটকা,

এও কি কখন সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না, সইবে না। কখন আমাদের কপাল পুড়ে আর তাদের দশজনের ঐ মহাবাক্যটা দৈববাণীর মতো ফলে যায়, তাই আলোচনা করে করে তাদের আর পেটের ভাত হজম হ'ত না, আমার কিন্তু তখন কিছুই শুনবার আগ্রহ ছিল না,—যে-দেবতা এমন করে তাঁর পরশমণির স্পর্শে আমার সকল ভুবন এমন সোনা করে দিয়েছিলেন, যার মাঝে আমার সকল সত্তা, সব আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু সেই দেবতাকেই নিত্য নূতন করে দেখছিলুম। তখন যে আমার ভাববার আর বলবার কিছুই ছিল না। তখন যে সব পেয়েছির আসরে আনন্দময় হয়ে যাবার মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু হায়, কালের অত্যাচারে সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসবার আগেই এই সুন্দর বিশ্বের সে কী শক্ত দিকটা চোখে পড়ে গেল! প্রাণে বিরাট শান্তি নেমে আসবার আগেই সে কী গোলমাল হয়ে গেল সব। আগে হতেই আমার প্রাণের নিভৃততম দেশে সে কী এক আশঙ্কা যেন শিউরে-শিউরে উঠত। মনে হ'ত যেন এত সুখের পেছনে সে কী বজ্র ওৎ পেতে রয়েছে! কখন আমার এ আকাশ-কুসুম ভেঙে যাবে! মনে হ'ত এ ক্ষণিকের পাওয়া যেন একটি রজনীর স্বপ্নে পাওয়া ছোট এক টুকরা আনন্দ, স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার!

মা আমার সম্প্রদান করেই আবার শয্যা আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর যে তখন আর চাইবার বা করবার কিছুই ছিল না, তখন যে মা মুক্ত! তাই তিনি আমায় সইমার হাতে দিয়ে যে দেশে কেউ খবর দিতে পারে না সেই কোন অজানার দেশে চলে গেলেন। বোধ হয় সেখানে আমার বাবা, খোকা-খুকীদের নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে পথের দিকে চেয়েছিলেন। যাবার সময় সে কী তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল মার পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটে! আমি যখন মার বুকে আছাড় খেয়ে কেঁদে উঠলুম, 'মাগো, যেয়ো না—আমার যে আর দুনিয়ার কেউ নেই মা', তখন মা আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'বলিসনে, বলিসনে রে অমন কথা বেগম, তোর অভাব কিসের? এমন মায়ের চেয়েও স্নেহময়ী শাশুড়ী, দেবতার চেয়েও উচ্চ স্বামী, এত পেয়েও রাক্ষুসী বলছিস কিছু নেই তোর? ছি মা, বলিসনে অমন অপয়া কথা!'

মাকে বাবার পাশেই গোর দেওয়া হ'ল। আজ তাহেরার আর আবুলের কবর যেন ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছে, দু'দিন বাদে মার কবরও অমনি সমান হয়ে মিশে যাবে, আজ কিন্তু আমার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনার এই যে একটা শক্ত গেরো বেঁধে গেল, সে কি মিলাবে কখনও?

এর পর হতে এই সব উপর্যুপরি শোকের আঘাতে আমায় মারাত্মক মূর্ছা-রোগে ধরলে। প্রায়ই আমি অচেতন হয়ে পড়তুম, আর যখনই চেতন হ'ত তখনই দেখতুম আমার ধূলিধূসরিত শির রয়েছে তাঁয়—আমার স্বামীর ঘন-স্পন্দিত বিশাল বক্ষে—তাঁর সব-ভুলানো ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মাঝে। ওঃ, সে কী ভীত করুণাঘন দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠত! সহানুভূতির সে কী কোমল স্নিগ্ধছায়ায় ছেয়ে ফেলত তাঁর স্বভাব-সুন্দর মুখখানি। আমার তখন মনে হ'ত এর চেয়ে মেয়েদের কী আর সুখ থাকতে পারে! এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ঈপ্সিত কী সে অপার্থিব জিনিস চাইতে পারে আমাদের মন্দভাগিনী স্ত্রী জাতিরা! হায়, সে সময়ে স্বামীর কোলে অমনি করে মাথা রেখে কেন আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়নি?

ঘ

এখন বলছি বোন তোকে আমার কাহিনীটা এও যে একটা 'কেসসা'। কে আমার এ কথা বিশ্বাস করবে আর কেইবা শুনবে? তার উপর নাকি আমার মগজ বিগড়ে গিয়েছে আর তাই মাঝে-মাঝে আমি খুব শক্ত বক্তিমা ছেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি। আমার এই রকম বকর-বকর করাটা কেউ পছন্দ করে না, তাই একটু শুনেই বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আচ্ছা বোন, বলত, মেয়ে মানুষে আবার কবে কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছে, আর খুব বেশী বলাই মেয়েদের স্বভাব কিনা। আমি কম কথায় কি করে আমার সকল কথা জানাব? তুই হয়ত বলবি তোকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোর কথা বলবার জন্যে? তাও বটে, তবে পেটের কথা, বুকের ব্যথা লোককে না জানালেও যে জানটা কেমন শুধু আনচান করে, বুকটা ভারী হয়ে ওঠে, এও ত একটা মস্ত জইর 'গজব'।

সইমা এত বড় রাশভারী লোক ছিলেন যে সবাই তাঁকে ভয় করে চলত। তিনিই ছিলেন ঘরের মালিক। কেউ তাঁর কথায় টু-টি করতে পারত না। তাই এত বড় একটা অঘটন, – আমার মতো পাতা-কুড়াদীর বেটীকে রাজবধূ করা সত্ত্বেও মুখ ফুটে কেউ আর কিছু বলতে পারল না তেমন। মেয়েরা প্রকারান্তরে আমার নীচু ঘরের কথা জানতে এলে তিনি জোর গলায় বলতেন, জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিকের মতো সেই ত, আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখ্‌খনো এমন বলবেন না যে তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার পাপ পুণ্যি কি তোমার নিঘ্‌ঘাত বেহেশত আর তুমি 'গালগজ্জা' শেখ, অতএব তোমার সব 'সাওয়াব' (পুণ্যি) বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে ত জাহান্নাম ধরা বাঁধা। আমি চাই শুধু গুণ তা সে যে জাতই হোক না কেন। দেখুক ত এসে আমার বৌকে—ঘর আলো করা রূপ, আশরাফের চেয়েও আদর তমিজ, লেখাপড়া জানা, কাজকর্মে পাকা এমন লক্ষ্মী বৌ আর কার আছে! আর কি জন্যই বা বড় ঘরের বেটীকে ঘরে আনব, সে যত না আনবে রূপ গুণ, তার চেয়ে বেশী আনবে বাপ-মায়ের গরব আর অশান্তি! আমার এই সোনার চাঁদ ছেলে বেঁচে থাক, ওর ঘরে ছেলেপিলে দেখি, তা হলেই আমি হাসতে-হাসতে মরব। মায়ের সেই স্নেহভরা কথায় যে কতই আনন্দে বুক ভরে উঠত। আমার চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়ত। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তির ভাষা বুঝি মর্মের অশ্রু।

স্বামীর সত্যিকারের ভালবাসা আর সইমার মেয়ের চেয়েও নিবিড় স্নেহ আমার ত আর কিছুই অপূর্ণ রাখেনি। দুনিয়ার যখন যা দেখতুম তাই সব যেন সুন্দর হয়ে ফুটে উটত। কই, ওর আগে ত এই মাটির দুনিয়াকে এত সুন্দর করে দেখিনি। ভালবাসার অঞ্জন কি মহিমা জানে, যাতে সব অসুন্দর অত সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।

এত সুখ, তবুও পোড়া মন কেন আপনা-আপনিই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। পাড়াপড়শী লোকের ঐ একটা কথাই যেন শাখচিল্লির মতো কানের কাছে এসে বাজত 'সইবে না, সইবে না!' চোরের মন বোঁচকার দিকে, তাই আমার মতো হতভাগীর মনে যে শুধুই অমঙ্গলের বাঁশী বাজবে, তাতে আর

আশ্চর্য কি? ঐ অত গভীর ভালবাসার আঘাতেই যে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল। মধু খুবই মিষ্টি, কিন্তু বেশী খাওয়াতেই গা জ্বালা করে। তাই আমার মনে হ'ত ওদের পায়ে মাথা কুটে বলি, 'ওগো দেবতা, ওগো স্বর্গের দেবী, তোমার এত স্নেহ এত ভালবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলো না আমায়। আমি যে আর সইতে পারছি না। স্নেহের ঘায়ে যে আমার হৃদয় ভেঙে পড়ল। একটু ঘৃণা কর, খারাপ বল, আমায় খুব ব্যথা দাও, তা না হইলে আমার বক্ষ নুয়ে যাবে যে! আর অমনি আবার সেই মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠত 'সইবে না'।

এমনি করে দেখতে-দেখতে দুটো বছর কোথায় দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, তা জানতে পারলাম না। এমন সময় ঐ যে প্রথমে বলেছিলুম, কলেরা আর বসন্ত জোট করে রাক্ষসের মতো হাঁ করে আমাদের গ্রামটা গ্রাস করে ফেললে। তাদের উদর যেন আর কিছুতেই পুরতে চায় না। সে কী ভীষণ বুভুক্ষা নিয়ে এসেছিল তারা! সমস্ত গ্রামটা যেন গোরস্থানেরই মতো খাঁ-খাঁ করতে লাগল। গ্রামের সকলে যে যেদিকে পারলে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে ছুটল। ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ যাঁরা, তাঁরা ত আর মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারেন না। তাঁদের একই রক্ত-মাংসের শরীর, তবে ভিতরে কোনো কিছু একটা বোধ হয় বড় জিনিস থাকবে। সবারই সঙ্গে সমান দুঃখে দুঃখী, সবারই দুঃখ-ক্লেশের ভাগ নিজের ঘাড়ে খুব বেশী করে চাপানতেই ওদের আনন্দ। ঐ বুঝি তাদের মুক্তি!

যখন সবাই চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, তখন গেলুম না কেবল আমরা। উনি বললেন, 'মৃত্যু নাই এরূপ দেশ কোথা যে গিয়ে লুকুব?' সবাই যখন মহামারীর ভয়ে রাস্তায় চলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে, তখন কোমর বেঁধে উনি পথে বেরিয়ে পড়লেন, বললেন, 'এই ত আমার কাজ, আমায় ডাক দিয়েছে!' সে কী হাসিমুখে আর্তের সেবার ভার নিলেন তিনি! তখন তিনি এম. এ পাস করে আইন পড়ছিলেন! কলকাতায় খুব গরম পড়াতে

দেশে এসেছিলেন। গরীয়সী শক্তির শ্রী ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রতিভা-উজ্জ্বল মুখে সেদিন!

আবার সেই বাণী 'সইবে না, সইবে না।'

দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আর্তের চেয়েও অধীর হয়ে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। আমি পায়ে ধরে বললুম, 'ওগো দেবতা! থাম, থাম, তুমি অনেকের হতে পার, কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই। ওগো আমার অবলম্বন, থাম, থাম।' হায়, যাঁকে চলায় পেয়েছে তাঁকে আর থামায় কে? বিশ্বের কল্যাণের জন্য ছুটছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সে দুনিয়া ভরা বিছানো প্রাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের কান্নার স্পন্দন ধ্বনিত হ'ত কি? যদি হ'ত সে শুধু ছুঁয়ে যেত, নুয়ে যেত না।

যে অমঙ্গলের একটু আভাস আমার অন্তরের নিভৃততম কোণে লুকিয়ে থেকে আমার সারা বক্ষ শঙ্কাকুল করে তুলেছিল, সেই ছোট্ট ছায়া যেন সেদিন কায়া হয়ে আমার চোখের সামনে বিকট মূর্তিতে এসে দাঁড়াল। সে কী বিশ্রী চেহারা তার!

মা কখন ওঁর কাজে বাধা দেননি। শুধু একদিন সাঁঝের নামাজ শেষে অশ্রু ছল-ছল চোখে তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন একমাত্র পুত্রকে খোদার "রাহায়" উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। ওঃ, ত্যাগের মহিমায়, বিজয়ের ভাস্বর জ্যোতিতে কী আলোময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সেই অশ্রুস্নাত মুখ সেদিন! মনে হ'ল যেন শতধারায় খোদার আশীষ; অযুত পাগলা ঝোরার বেগে মায়ের শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারও বক্ষ একটা মূঢ় বেদনা মাখা গৌরবে যে উথলে-উথলে পড়ছিল।

এই রকম লোককেই দেবতা বলে,—না?

৬

সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থগাছটায় একটা প্যাঁচা দিন-দুপুরে তিন-তিনবার ডেকে উঠল, মাথার উপরে একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে আমার মনটাকে

আরো অস্থির চঞ্চল করে তুলছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?

উনি সেই যে ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একটা লাশ কাঁধে করে নিয়ে, সারাদিন আর ফেরেননি। আমি কেবল ঘর আর বার করছিলুম।

বিকাল বেলায় খুব ঘনঘটা করে মেঘ এল, সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি। সে যেন মস্ত দুটো শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ওঃ, এত জল আর পাথরও ছিল সেদিনকার মেঘে! সামনে বিশ হাত দূরে বজ্র পড়ার মতো কি একটা মস্ত কঠোর আওয়াজ শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলুম।

যখন চেতনা হ'ল, তখন বাড়িময় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে হাহাকার, আর জল পড়ার ঝম-ঝম শব্দ। একটা মস্ত বড় বজ্র ঠিক আমার কপাল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে!

আমার স্বামী দেবতা তখন বিছানায শুয়ে ছটফট করছেন, আর মা পাষাণ প্রতিমার মতো তাঁর দিকে শুধু চেয়ে রয়েছেন। চোখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই, যেন হৃদয়ের সমস্ত অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে! দৃষ্টিতে কী যেন এক অতীন্দ্রিয় ঔজ্জ্বল্য! সে কী বিরাট নীরবতা! শুনলুম সে দিন আমাদের পাশের গাঁয়ের দশ-বারজন কলেরা রোগীকে গোর দিয়ে বহু জনকে ঔষধ পথ্য দিয়ে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তাঁকে ঐ রোগে আক্রমণ করলে। একটা পুরানো বটগাছের তলায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, একটু আগে উঠিয়ে আনা হয়েছে। আবার বৃষ্টি এল, সমস্ত আকাশ ভেঙে ঝম-ঝম-ঝম!...

তাঁকে ধরে রাখবার ক্ষমতা আর কারুর ছিল না—তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছিল, আর থাকবেন না? তিনি চলে গেলেন। যার যতটা ইচ্ছা গেল কাঁদলে। আমাদের ঘরের আঙিনার নিমগাছটার পাতা ঝরে পড়ল ঝর ঝর ঝর। গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটল! দ্বারে কাকাতুয়াটি শুধু একবার একটা বিকট চিৎকার করে অসাড় হয়ে নীচের দিকে মুখ করে ঝুলে পড়ল। চারিদিকে মুমূর্ষুর ক্ষীণ একটা আহা-আহা

শব্দ রহিয়ে-রহিয়ে উঠতে লাগল। সব ব্যেপে উঠতে লাগল শুধু একটা বীভৎস কান্নার রব। কান্নায় যেন সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, ঝম-ঝম-ঝম।

শুধু তেমনি অচল অটল হয়ে একটা বিরাট পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন মা।

শুধু তাঁর শেষ সময়ে বলেছিলেন, 'বাপরে, আমাকে ত কাঁদতে নেই, তুই ত আর আমার ন'স, তোকে খোদার কাছে কোরবাণী দিয়েছি। খোদার নামে উৎসর্গীকৃত জিনিসে ত আমার অধিকার নেই! তবে চল বাপ, তুই ত আমায় ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারিসনি, আমিও তোকে কখনও চোখের আড়াল করিনি। তোর কাজ ফুরিয়েছে, আমারও কাজ ফুরাল আজ।'

কতকগুলো লোকের মগজ নাকি এমনি খারাপ হয়ে যায় যে, তারা এক-একটা ছোট্ট মুহূর্তকেই একটা অখণ্ড কাল বলে ভাবে, তবে কি আমারও মাথা সেই রকম খারাপ হয়ে গেছে, তা না হলে আমার বোধ হচ্ছে কেন যে এসব ঘটনা যেন বাবা আদমের কালে ঘটে গেছে আর আমি এমনি করে গোরস্থানে বসেই আছি। তুই কিন্তু বলছিস, এই সেদিন তাঁরা মারা গেছেন! তবে ত আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি!

কি বলছিস, এ গোরস্থানে এলুম কেন? আহা, কথার ছিরি দেখ! এই গোরস্থানে যেখানে সব সত্যিকার মানুষ শুয়ে রয়েছেন, সেখানে না এসে যাব কি তবে বন-জঙ্গলে, যেখানে এক রকম জন্তু আছে যাদের শুধু মানুষের মতো হাত-পা আর অন্তরটা শয়তানের চেয়েও কুৎসিত কালো? আমার বেশ মনে পড়ে, যখন তাঁর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হ'ল তখন ওদেরকে কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে যে, শয়তানী, বেরো ঘর থেকে এখনি! তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদী খানদানের উপর নাক চড়ান, এ সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইল না কেউ! বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না! আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি! অত মার-গাল কিছুই বাজে নাই আমার প্রাণে, যত বেজেছিল ঐ একটা নেকার কথায়। ঐ বিশ্রী

কথাটা একটা মস্ত আঘাতের মতো বেজেছিল আমার চূর্ণ বক্ষে। ওগো, নেকা কি? সে কি দু'বার অন্যের গলায় মালা দেওয়া? শাস্ত্রে নেকার কথা আছে, সে কাদের জন্যে? আচ্ছা ভাই, যারা বাধ্য হয়ে অন্নবস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে ওরকম করে ভালবাসার অপমান করে, তাদের কি হৃদয় বলে কোনো একটা জিনিস নাই? তা হলেও তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা শুধু কামনার বশবর্তী হয়ে পবিত্রতাকে, নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে যায় তাদের কোথাও ক্ষমা নাই। ভালবাসা—স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে, তার উপযুক্ত বোধ হয় এখনও কোনো নরকের সৃষ্টি হয় নাই।

মৌলবী সাহেবরা হয়ত খুব চটে, আমার "জানজা"র নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবীতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয়ে অনেকটা তফাৎ।

চ

যেখানে শুধু এই রকম অবমাননা, সেখান থেকে সরে এসে মরার দেশে থাকাই ভাল।

ওকি, তুমি এমন করে আঁতকে উঠলে কেন? আমি মূর্ছা গেছলুম বলে? কি বলছ, আমি বিষ খেয়েছি? তাহলে তুমিও পাগল হয়েছ! আমার চেহারা এমন নীল হয়ে গেছে দেখে তুমি হয়ত মনে করছ আমি বিষ খেয়েছি। না গো, না, আমি পাগল হই আর যাই হই, ওরকম দুর্বলতা আমার মধ্যে নেই। কেরোসিনে পোড়া, জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া মেয়েদের জাতটার যেন রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। আমার কপাল পুড়লেও আমি ওরকম "হারামি মওয়াত্তকে" প্রাণ থেকে ঘৃণা করি। এ মরায় যে দুনিয়া ও আখের উভয়ের খারাবি বোন!

কাল রাত্রে ভয় পেয়ে যখন তুই আমার কাছ হতে চলে গেলি তার একটু পর থেকেই আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে। এই একটু আগে আমার জ্ঞান হ'ল।

আমি বুঝতে পেরেছি বোন, আমার আর সময় নাই। আর কারুর চোখের জলের বাধা আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না। ওঃ, এতদিনে ঐ নদী-পারের অলস-ঘুমে ভরা সুরটা আমার প্রাণে গভীর স্পর্শ করে গেল। সে কত গভীর দুঃখ-ভরা। পানি আমার চোখের কোলে ছেয়ে ফেলেছে দিদি। তার কোমল স্পর্শ আমার চোখের পাতায়-পাতায় অনুভব করেছি। কী শিহরণ আমার প্রতি লোমকূপে খেলে বেড়াচ্ছে!
কী পিপাসা, কী বুকফাটা তৃষ্ণা! একটু পানি দে ত বোন! না-না, আর চাই না। ঐ দেখতে পাচ্ছ "শরবান্ তহুরা" ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কী সহানুভূতি আর্দ্রকরুণ স্নেহময় গভীর দৃষ্টি তাঁর! আঃ! মাগো! আঃ!

কথিকা

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটা-ভরা পথ দিয়া। চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতা-ভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণ-ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই, তোমাদের এমন শক্তি-ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?' অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল, 'ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে!' উহার মধ্যে কাহার—স্নেহ-করুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল—হায়! এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য। অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত ঝঙ্কার গর্জন করিয়া উঠিল, 'চোপরাও ভীরু! এই ত মানবাত্মার সত্য-শাশ্বত পথ। পথিক দু'চোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল। তার সুপ্ত যত কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সাধা বীণার ঝঞ্চনার মতো সাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল—'আগে চল।' বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল, 'এই তোমায় যৌবনের রাজটীকা পরিয়ে দিলাম। তুমি চির-যৌবন, চির-অমর হলে।' দূরের আকাশ আনত হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহা'ক মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। দুই পাশে তাহার বনে শাখী শাখার পতাকা দুলাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণ-দ্বার পারাইয়া বোধন-বাঁশীর অগ্নি-সুর হরিণের মতো তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশীর টানে মুক্তির পথ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল। ওগো, কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, আলো দেখাও, পথ দেখাও।....বিশ্বের কল্যাণের মন্ত্র

তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, 'এখনও অনেক দেরি, পথ চল।' সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল, 'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ দরওয়াজা পার হতে হয়।' দুরন্ত পথিক তাহার চলায় দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই, তাহাই আমার লক্ষ্য।' দূরের বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল, পিছন হইতে নিযুক্ত তরুণ কণ্ঠে বিপুল বাণী শোর করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চল ভাই, আগে চল,— তোমারই পায়ে চলা পথ ধরে আমরা চলেছি।' পথিক আগে চলার গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল, 'এ পথে যে মরণের ভয় আছে।' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত আগুন যেন গর্জিয়া উঠিল, 'কুচ পরওয়া নেই। ও ত মরণ নয়, ও যে জীবনের আরম্ভ।' অনেক পিছনে পাঁজর-ভাঙা বৃদ্ধেরা মরণের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল। তাহার স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ চোখ ভ্যাঙচাইয়া বলিতেছিল, 'এই দেখ মরণ।' একটু দূরে চন্দন-কুণ্ডলী ধোঁয়া ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টি-চাহনি প্রতারিত করার চেষ্টা হইতেছিল। হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে সম্মুখের ধূলায় আগুনের দিকে দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, 'ঐ ত সামনে তোমাদের নির্বাণ কুণ্ড? এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? ও দুরন্ত পথিকদল ম'ল বলে!' বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল, 'হাঁ হুজুর, আলবৎ!' তাহার পাশে পাশে কাহার দুই কণ্ঠ বারে বারে সতর্ক করিতেছিল,—ওহো বেকুবদল, ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ। তোদের এরা নির্বাণ-কুণ্ডে পুড়িয়ে তিল-তিল করে মারবে। তাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল, 'না না, ওদের কথা শুনো না, ওদের পথ ভীতি-সঙ্কুল আর অবেক দূর, তাও আবার দুঃখ-কষ্ট কাঁটা-পাথর ভরা, তোমাদের মুক্তি ঐ সামনে।

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশীর সুর ধরিয়া। এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ার এক আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখন যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নূতন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল, 'এদেখ এদের পরিণাম।' সেই খুলি মাথায় করিয়া

নূতন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'আহা, এরাই ত আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এমনই পরিণাম চাই—আমার মৃত্যুতেই ত আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব।' বিভীষিকা বলে, 'তুমি কে?' পথিক হেসে বললে, 'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে তাদের কেউ মরেনি, আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি নূতন জীবন নূতন আলো নিয়ে এসেছে। এ মুক্তির দল অমর।' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমায় চেন না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বল, তেমোকে হত্যা করাই আমার ব্রত : মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে।' দুরন্ত পথিক দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারো,—বাঁধো কিন্তু আমাকে বাঁধতে পারবে না; আমার ত মৃত্যু নাই। আমি আসবো।' আবার বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল, 'আমার যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ তুমি যতবার আসো তোমাকে বধ করবো। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য করতে হবে।'

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথেরই বিগত সঙ্গেরা চির তরুণ জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। পথিক বলিল, 'কিন্তু এই জীবন দেওয়াই কি জীবনের সার্থকতা? মুক্ত বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মা স্নিগ্ধ আর্দ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, 'হাঁ ভাই! যুগ যুগ জীবন ত এই মৃত্যুরই বন্দনা গান গাইছে। সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই ত তোমার মরণের সার্থকতা। নিজে মরিয়া জাগানোতেই তোমার মৃত্যু যে চিরজাগ্রত অমর! নবীন পথিক—তবে চালাও খঞ্জর। পিছন হইতে তরুণ যাত্রীর দল দুরন্ত পথিকের প্রাণশূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি আবার এসো। অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের একতান সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি!

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানা-ঘুসা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি, তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটা ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খানদানী জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশী।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ী হইবে—ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে, দরিদ্র মক্তব শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপ-খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা। পিতার মন খুঁত-খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্‌ণা হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের "পয়" বলিয়া কোনো জিনিস আছে কি না জানি না, কিন্তু জোহরার মীর বাড়িতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয়রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্ব-পুরুষের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর বাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন!

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত-বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল, তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি

দিয়া ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মতো একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য-সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল। পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশী দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারিতেই হবে, নইলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!' বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার-কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধধবল গোখ্‌রো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দূর বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিস্‌নে, ও বাস্তু-সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখ্‌রো।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখ্‌রোরূপী বাস্তু-সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোনো কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে, সে রকম কোনো শব্দ ত শুনিনি!'

আরিফ বলিল, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের চারিটা ইট সরাইতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চকচক করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্য নয়। বিশেষ করিয়া তাঁহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসী বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসী উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসী উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে!'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথমেরই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখ্‌রো মারিতেও নাই।

কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখ্‌রো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসীর একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসী ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসী তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে আর কিছু করিল না। একমনে পান করিতে করিতে ঝিঁঝিঁ পোকার মতো এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, 'ওই আগের সাপটা। এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে। আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!'

আরিফ ও তাহার পিতা-মাতা বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদের মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে

পারে। এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসীতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবে—ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর-শাশুড়ী অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যি মা, তোর সাথে মীরবাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এল।'

কিন্তু এ সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমানে ক্ষুদ্র মীর পরিবারের সহজ জীবন যাপন স্বচ্ছন্দে চলিত পারিত। কিন্তু বধূর "পয়" দেখিয়াই বোধ হয় আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীরবাড়ির পুরাতন প্রাসাদ পরিপূর্ণ-রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কন্‌ট্রাক্টারী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোনো কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

২

এই অর্থপ্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখ্‌রো যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়ত দুধ-কলার লোভেই তাহারা পিছু-পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু-সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব-অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়!

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত-ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলা-ফেরা করিতে

লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ ত! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও একপ্রকার অসম্ভব। তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়ত রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ী দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শাশুড়ী খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু-সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোঁথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

ভয়ে শাশুড়ীর পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিতে লাগিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল! গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে, সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহিরবাটীতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মতো তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে, আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মতো নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগল যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই

করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয় মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয়-ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মতো সে ঐ সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহে তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ও নাই। তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যতা-ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে পুড়িয়া মরে। পয়মন্ত বধূ—তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না। রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার ত কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিল, 'জোহরা, তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্চর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশী শান্তিময় ছিল।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে। 'ওরা আমার ছেলে! ওরা ত কোনো ক্ষতি করে না; কাউকে কামড়াতে জানে না ত ওরা!'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি-সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশী সুখের হ'ত!'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা-পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছু দিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়ত সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যূষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দু-তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে

অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস।'

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতামাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণকান্তি স্বর্ণভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতামাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু-একদিন যাইতে-না-যাইতে পিতামাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁ রে, আরিফকে চিঠি লিখব আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না মা, উনি ত শনিবারই আসবেন!'

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখে মুখে পূর্বের মতো সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বলত জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

জোহরা ম্লান হাসিয়া বলিল, 'না মা, উনি ত আগের মতোই আমায় ভালবাসেন। বাড়িতে আমার দুটি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথামতো সেই সন্তান দুটিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে

ফিরিলেন কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল, গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোনো কথা বলে না। জোহরার পিতামাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশী ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ, খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবারে আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা ত একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। ওর কি কোনো রোগ-বেরামই হ'ল, তাও বুঝতে পারছিনে—দিন-দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই-একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই একদিনই তাহারা কী উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ির কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে। উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কী তাদের কাতরতা মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা, একবার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালায়।

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনোরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জান ত আমরা কত গরীব! মেয়ে ত শয্যা নিয়েছে। দেশে যা দুর্দিন পড়েছে,

তাতে আমরা খেতেই পারিনে, মেয়ের চিকিৎসা ত দূরের কথা। মেয়েটা এখানে বিনা-চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছুদিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো।' বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামী কল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

৩

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবার হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক—বোধ হয় স্ত্রীলোক, জোহরার বাক্স ভাঙিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল, স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বেই আর একটি কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টীলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনা-পত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা।

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনা-পত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে-কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে ত চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেউ নয়, সে তাহার শাশুড়ী—জোহরার মাতা।

দুদিন আগে ঝড়ে ঘরের কতকগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই আকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ী সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল: সে দেখিল, তাহার শাশুড়ীর পিছু-পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইল, ঐ ডাকাত আর কেহ নয়—তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ী তখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো চাহিয়া রহিল। আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ীর ক্রন্দন থামিয়া গেল। শ্বশুর-শাশুড়ী তুইজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, 'কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, 'জি হাঁ, দেখেছি। কলিকাল কিনা, তাই সবকিছু উল্টে গেছে। যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে, হয়ত এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে।

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মূর্ছা ভাঙিবার পর আরিফ বলিল, 'সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এ নরকপুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।'

শ্বশুর-শাশুড়ী যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমন কি, জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙাইল, পিতামাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি!'

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজী হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশমতো জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছু প্রশ্ন করিল না।

৪

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসীমুখে বাড়ি ছাড়িয়া

যাইতে পারে না। অন্ততঃ সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়।

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতি গন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজী হইল, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জলস্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল, 'রাক্ষুসী!'

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না, সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না। এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতামাতাকে বলিয়া যাইবে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌছিয়াই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাষ্টার চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে ছুটিতে লাগিলেন, সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক পরা বাঙালী চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্ষ্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও!"

আরিফ কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালী সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বলিল, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—'

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সার্ভেন্ট-কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে

আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেকশন দিলেন। দুই-তিনটা ইঞ্জেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল। ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতায় পঁহুছিতে দেরি হইলে হয়ত এ হতভাগাকে আর বাঁচানো যাইবে না। ট্রেন কলিকাতায় পঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব অ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য-সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মতো ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতামাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

৫

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতার হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা ত

মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে।

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত। সেই মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না।

সে তখনও জানে না যে, আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে। আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারই প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্তস্বরে বলিল, 'কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি, এই যথেষ্ট।'

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাটীতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমম সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি এসেছ—বেঁচে ফিরে এসেছ?'

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা

স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না-না, তুমি শাস্তি দাও! তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, 'এই নাও শাস্তি!'

৬

দুঃখ-বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে। কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা? এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে। সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে। সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি! আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে। একটু দুধ! মা, একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!' 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী, তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মতো সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ-শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই—গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার

তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়েছে বাবা! খোকা!'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না, ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখ্‌রো যুগল!

জোহরা উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস? তোদের মাকে মনে পড়ল?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মতো তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল, পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—'মা গো, বড় ক্ষিদে! তুমি তো ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!'

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মতো বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগ-যুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা।

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ী উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা, কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমন তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'যাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যই ওরা তোমার খোকা বৌমা! তুমি চলে যাবার পর আমরা দু-একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা, শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না। চলে গেল। সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!'

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপান বশতঃই নির্জীবের মতো বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িছিল।

৭

সেইদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরলে গো! জীনের বাদশা গো! জিন ভূত!' বলিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন 'হাঁরে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা ত বলিসনি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিল, 'কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে ত সাত মাস।'

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, 'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িয়ালা ভূত!'

বাড়ির চাকর-চাকরাণী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে—জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই ত কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে-পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে !'

জোহরা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা, তুমি !' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'বাবা, তুমি !' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ, বেয়াই !'

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, 'ও সত্যই ভূত, বাবা নয়, ও ভূত ! ওকে মার ! মেরে বের করে দাও !'

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে, 'ওরে বাপরে, সাপে খেয়ে ফেললে ! আমায় সাপে খেয়ে ফেললে !'

জোহরা উন্মাদিনীর মতো তাহার শাশুড়ীর হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল, 'ওগো, আমার খোকাদের মেরে ফেললে ! ওকে ধর ! ওকে ধর !'

জোহরার সাথে সাথে সকলে গিয়া আমগাছতলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরারই পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু-সাপ পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার "খোকা" এবং একবার "বাবা" বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার খোকারা কই ? আমার পদ্ম-গোখ্‌রো ? আমার বাবা ?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, 'জোহরা ! জোহরা !! কেউ নেই ! সব গেছে ! সকলে গেছে ! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখ্‌রোর কামড়ে ! তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে ! ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরাণী দেখতে পেয়ে "ভূত" বলে চিৎকার করে। ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখ্‌রো তাঁকে তাড়া করে !' জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বেশ

হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা ! যাক ! আমার পদ্ম-গোখ্‌রো—আমার খোকারা কোথায় বল।' আরিফ বলিল, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন !'

জোহরা, 'অ্যাঁ, খোকারা নাই !' বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে-না-হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

জিনের বাদশা

ফরিদপুর জেলায় "আরিয়ল খাঁ" নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম। নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্থ। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

তুর্কী ফেজের উপরের কালো ঝাণ্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপস করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি গ্রামের মুসমানেরা কায়স্থ-পাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থ পাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতোই ভয় করে।

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চুন্নু ব্যাপারী মাতব্বর লোক। কিন্তু মাতব্বর হলেও সে নিজের হাতে চাষ করে। সাহায্য করে তার সাতটি ছেলে ও তিনটি বউ। কেন যে সে আর একটি বউ এনে সুন্নত আদায় করেনি, তা সেই জানে। লোকে কিন্তু বলে, তার তৃতীয় পক্ষটি একেবারে 'খরে-দজ্জাল' মেয়ে। এরই শতমুখী অস্ত্রের ভয়ে চতুর্থ পক্ষ নাকি ও-বাড়িমুখো হতে পারেনি। এর জন্য চুন্নু ব্যাপারীর আফসোসের আর অন্ত ছিল না। সে প্রায়ই লোকের কাছে দুঃখ করে বলত, 'আরে, এরেই কয়—খোদায় দেয় ত জোলায় দেয় না! আল্লা মিঞা ত হুকুমই দিছেন চারড্যা বিবি আনবার, তা কপালে নাই ওইবো কোহন্থ্যা!' বলেই একটু ঢোক গিলে আবার বলে, 'ওই বিজাত্যার বেডীরে আন্যাই না এমনডা ওইলো!' বলেই আবার কিন্তু সাবধান করে দেয়, 'দেহিও বাপু, বারিত গিয়া কইয়্যা দিয়ো না। হে বেডী হুনল্যা এক্কেরে দুপুর্যা মানন লাগাইয়া দিবো!'

এই তৃতীয় পক্ষেরই সন্তান "আল্লারাখা" আমাদের গল্পের নায়ক। গল্পের নায়কের মতোই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে। গ্রামে কিন্তু এর নাম "কেশরঞ্জবাবু"। এই নাম এর প্রথম দেয় ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে। নাম তার "চানভানু" অর্থাৎ চাঁদবানু। সে কথা পরে বলছি।

চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লারাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হ'ল যে ছেলে, অন্ততঃ তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে— আর কেউ না হোক—মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। আল্লা হয়ত সেদিন প্রাণভরে হেসেছিলেন। অমন বহু "আল্লারাখা"কে আল্লা "গোরস্থানরাখা" করেছেন", কিন্তু এর বেলায় যেন রসিকতা করেই একে সত্যি-সত্যিই জ্যান্ত রাখলেন। মনে মনে বললেন, 'দাঁড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখব, কিন্তু তোদের জ্বালিয়ে মেরে ছাড়ব!' সে পরে মরবে কি না জানি না, কিন্তু এই বিশটে বছর যে সে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ গাঁয়ের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তার বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করার বহর দেখে গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, 'ও গুয়োটা আল্লারাখা না হয়ে যদি মামদোভূত হ'ত তাহলেও বরং ছিল ভাল। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না!'

ওকে মুসলমানরা বলত "ইলিশের পোলা", কায়েতরা বলত "অমাবস্যার জন্মিৎ", বাপ বলত "হালার পো", মা আদর করে বলত "আফলাতুন"।

এই যে মেয়েটির কল্যাণে ওর নাম কেশরঞ্জনবাবু হয়, সেই চানভানুর একটু পরিচয় দিই।

মেয়েটি ঐ গাঁয়েরই নারদআলি শেখের। নারদআলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নাম। নারদআলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বয়েস। বাম পায়ের হাঁটু আর বললাম না, ওটা অতিরঞ্জন হবে।

নারদআলি, শেখ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতি নাম এখনো গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায়। অবশ্য হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কি না জানিনে।

নারদআলি গাঁয়ের মাতব্বর না হলেও অবস্থা ওর মন্দ নয়। যা জমি-জায়গা আছে তার, তারি উৎপন্ন ফসলে দিব্যি বছর কেটে যায়, ও কারুর ধারও ধারে না, কাউকে ধার দেয়ও না।

দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি। কিন্তু ওর বউটি ঝগড়া-কাজিয়া না করলেও কাজিয়ার ভান করে যে মজা করে, তা অন্ততঃ নারদআলির কাছে একটু

অশান্তিকর বলেই মনে হয়। লোক ক্ষ্যাপানো বউটার স্বভাব, কিন্তু সে রসিকতা বুঝতে না পেরে অপর পক্ষ যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন সে বেশ কিছুক্ষণ কোঁদল করার ভান করে হঠাৎ মাঝ-উঠানে ধামা চাপা দিয়ে বলে ওঠে, 'আজ রইল কাজিয়া ধামা চাপা, খাইয়া লইয়া আয়, তারপর তোরে দেখাইবো মজাডা! এই ধামারে যে খুলবো, তার তল্লাটে আল্লা ভাসুরের সাথে নিকা লিখছে!' বলেই এমন ভঙ্গির সাথে সে ধামাটা চাপা দেয় এবং কথাগুলো বলে যে অন্য লোকের সাথে সাথে যে ঝগড়া করছিল সেও হেসে ফেলে। অবশ্য রাগ তাতে তার কমে না।

এদিকে একটি মাত্র সন্তান—চানভানু! পুঁথির কেস্‌সা শুনে মায়ের আদর করে রাখা নাম!

চানভানু যেন তার মায়েরই ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। চোখে মুখে কথা কয়, ঘাটে মাঠে ছুটোছুটি করে, আরিয়ল খাঁর জল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়!

চোদ্দ বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ বাপে বললেও মায়ে বিয়ের নাম করতে দেয় না। বলে, 'চান চলে গেলে থাকব কি করে আঁধার পুরীতে?' নারদআলি বেশী কিছু বললে বউ তার তাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার খ্যাচ্‌খ্যাচাইবার ওইবো না, আমার মাইয়্যা বিয়া বসব না—জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিফ যদ্দিন না আয়ে!'

মোহনপুরের জৈগুন বিবি—চানভানুর 'হানিফ' বীরের কিন্তু আসতে দেরি হ'ল না, এবং সে হানিফ আমাদের আল্লারাখা।

একদিন হঠাৎ আল্লারাখার 'সোনাভানের পুঁথি' পড়তে পড়তে মনে হ'ল, চানভানুই সে সোনাভান বিবি এবং সে গাজী হানিফা। তার কারণ, চানের মতো সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। সে সোনাভান বিজয়ের জন্য জয়যাত্রার চিন্তা করতে করতে পড়ে যেতে লাগল,—

> হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,
> নাশ্‌তা করিয়া নিল যোড় আশী মণ।
> লক্ষ মনের গোর্জ বিবির হাজার মনের ঢাল,
> বারো ঘোড়ায় চড়ে বলে তুলবো পিঠের খাল!

বাপ্‌পুরে! এ যে হানিফার বাবা! আবার আশী মণ নাশ্‌তা করে, বারোটা ঘোড়ায় এক সাথে চড়ে! চানভানুও ঐ রকম কিছু করবে নাকি? আল্লারাখা রীতিমত হকচকিয়ে গেল। কিন্তু হেরে হেরেও ত হানিফাই শেষে কেল্লা-ফতে করেছিলেন। যা থাকে কপালে! আল্লারাখা তার বাবরি চুলের মাঝে একটা এবং দুদিকে দুটো—এই তিন-তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, মায় জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চানভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

এইখানে বলে রাখি, আমাদের আল্লারাখা পুঁথি পড়ে যতদূর আধুনিক হবার—তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মতো থাকত না, পরিষ্কার ধুতি-জামা-জুতো পরে লম্বা চুলে তেড়ি কেটে, পান সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত এবং কার কি অনিষ্ট করবে, তারি মতলব আঁটত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস করলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনোদিন করেনি। তার টার্গেট ছিল বেশির ভাগ বুড়োবুড়ীর দল; বাড়ির মাঠের ফল-ফসল, গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেঁতুলগাছ, তালগাছ ইত্যাদি।

অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো বা তাদের দড়ি খুলে দিয়ে বাবাকে লোকের গাল খাওয়ানো ছাড়া বাবার চাষবাসে অন্য বিশেষ সহায়তা সে করেনি। দু-বার সে মাঠ তদারক করতে গেছিল, তাতে একবার মাঠের পাকাধানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সমস্ত ধান কেটে অন্যের ক্ষেতে রেখে এসেছিল। এর পর তার বাবা আর তাকে সাহায্য করতে ডাকেনি।

তার বিলাসিতার টাকা যখন তার মা বন্ধ করলে এবং বাবার কাছে চেয়েও তার বাবা যখন ওরই বদলে গড়পড়তা হিসেব করে তার পিঠে বেশ কিছু কষে দিলে পাঁচনি দিয়ে, তখন সে বাড়ি থেকে পালিয়েও গেল না, কাঁদলেও না, কারুর কাছে কোনো অনুযোগও করলে না। সেদিন রাত্রে চুন্নু ব্যাপারীর বাড়িতে আগুন লেগে গেল। আল্লারাখা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধূম্র উদ্‌গীরণ করতে করতে যা বলে উঠল, তার মানে—আজ দিয়াশলাই কিনবার পয়সা ছিল না, ভাগ্যিস ঘরে তাদের আগুন লেগেছিল, তাই সিগারেট ধরানো গেল।

তার বাবা যখন আল্লারাখাকে ধুর্মুশ-পেটা করে পিটোতে লাগল, সে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে খেতে বলতে লাগল যে, সকালে মার খেয়ে বড্ডো পিঠ ব্যথা করাতেই ত সে পিঠে সেঁক দেওয়ার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়েছে। আজ আবার যদি পিঠে বেশি ব্যথা করে, পাড়ায় কারুর ঘরে আগুন লাগিয়েও ব্যথায় সেঁক দিতে হবে।

এই কবুল জবাব শুনে ওর বাবার যে-টুকু মারবার হাত ছিল, তাও গেল ফুরিয়ে। সে ছেলের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলতে লাগল, 'তোর পায়ে পড়ি পোরা-কপ্যাল্যা, হালারপো, ও কম্মডা আর করিস না, হক্কলেরে জেলে যাইবার অইবো যে!' যাক, সেদিন গ্রামের লোকের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়ে গেল যে, অন্ততঃ গ্রামের কল্যাণের জন্য ওর বাবা ওর বাবুয়ানার খরচটা চালাবে। আল্লারখা গম্ভীর হয়ে সেদিন বলেছিল, 'আমি বাপকা বেটা, যা কইলাম, তা না কইর‍্যা ছারতাম না!' সকলে হেসে উঠল এবং যে বাপের বেটা সেই বাপ তখন ক্রোধে দুঃখে কেঁদে ফেলে ছেলেকে এক লাথিতে ভূমিসাৎ করে চিৎকার করে উঠল, 'হুনছ নি হালারপোর কতা! হালারপো কয়, বাপ্‌কা বেডা! তোর বাপের মুহে মুতি।' এবার আল্লরাখাও হেসে ফেললে।

যাক—যা বলছিলাম। ধোপ-দোরস্ত হয়ে আল্লারাখা অবলীলাক্রমে নারদ-আলির উঠোনে গিয়ে ঠেলে উঠে ডাকতে লাগল, 'নারদ ফুফা, বারিত আছনি গো!' এই চির-পরিচিত গলার আওয়াজে বাড়ির তিনটি প্রাণী এক-সঙ্গে চমকে উঠল। চানের মা বলে উঠলো, 'উই শয়তানের বাচ্চাডা আইছে!'

চানভানু তখন দাওয়ায় বসে একরাশ পাকা করমচা নিয়ে বেশ করে নুন আর কাঁচালঙ্কা ডলে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাকরায় টোকা দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল। সে তার টানা টানা চোখ দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লারাখার তিন তেরিকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ করে বলে উঠল, 'কেশরঞ্জনবাবু আইছেন গো, খাডুলিডা লইয়া আইও!' বলেই সুর করে বলে উঠল:

এসো কুড়ুম বইয়া খাটে,
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙলাম্ চেলা কাঠে !

বলেই হি-হি করে হেসে দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।
আল্লারাখা এ অভিনব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রণে ভঙ্গ দিল। মোহনপুরের হানিফার এই প্রথম পরাজয়।
এ কথাটা চানভানুর মায়ের মুখ হতে মুখান্তরে ফিরে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এর পর থেকেই আল্লারাখাকে দেখলে সকলে, বিশেষ করে মেয়েরা, বলে উঠত, 'উ-ই কেশরঞ্জনবাবু আইত্যাছেন !'
অপমান করলে চানভানু এবং আল্লারাখা তার শোধ তুললে সারা গাঁয়ের লোকের উপর। আল্লারাখা পান, সিগারেট খাইয়ে গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তালিম দিয়ে দিয়ে প্রায় তৈরি করে এনেছিল। তাদেরি সাহায্যে সে রাতে সে গ্রামের প্রায় সকল ঘরের দোরের সামনে যে সামগ্রী পরিবেশন করে এল, তা দেখলেই বমি আসে—শুঁকলে ত কথাই নেই !
গ্রামের লোক বহু গবেষণাতেও স্থির করতে পারলে না, অত কলেরার রুগী কোথেকে সে রাত্রে এসেছিল ! তাছাড়া তেঁতুলপাতা খেয়ে মানুষের যে বদহজম হয়, এও তাদের জানা ছিল না। গো-বর, নর-বর ও পচানী খাঁটার সাথে গাঁদালপাতার সংমিশ্রণের হেতু না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ও মিক্শচারের সাথে তেঁতুলপাতার সম্পর্ক কি ? কিন্তু এ রহস্য ভেদ করতে তাদের দেরি হ'ল না, যখন তারা দেখলে—আর সব দ্রব্য অল্প আয়াসে উঠে গেলেও তেঁতুলপাতা কিছুতেই দোর ছেড়ে উঠতে চাইল না ! বহু সাধ্য-সাধনায় বিফলকাম হয়ে দোরের মাটিসুদ্ধ কুপিয়ে তুলে যখন তিন্তিড়িপত্রের হাত এড়ানো গেল, তখন সকলে একবাক্যে বললে, 'না, ছেলের বুদ্ধি আছে বটে ! তেঁতুলপাতার যে এত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তা সেদিন প্রথমে গ্রামের লোক অবগত হ'ল !'
সারা গ্রামে মাত্র একটি বাড়ি সেদিন এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেল। সে চানভানুদের বাড়ি। নিজের বাড়িকেও সে রেহাই দেয়নি, সে যে কেন বিশেষ করে চানভানুরই বাড়িকে—যার ওপর আক্রোশে ওর এই

অপকর্ম—উপেক্ষা করলে, এর অর্থ বুঝতে অন্ততঃ চানভানুর আর তার মা'র বাকি রইল না।

সে যেন বলতে চায়—দেখলে ত আমার প্রতাপ! ইচ্ছে করলেই তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু নিলাম না। তোমাকে ক্ষমা করলাম।

এই কথা ভাবতে ভাবতে পরদিন সকালে চানভানু হঠাৎ কেঁদে ফেললে। ক্রোধে অপমানে তার শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো মুখ—কৃষ্ণপক্ষের উদয়-মুহূর্তের চাঁদের মতো রক্তাভ হয়ে উঠল। তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে উঠল, 'চান, কাঁদছিস কিসের ল্যাইগা রে? তোর বাপে বকছে?' চানভানু বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান বলে যেমন আদুরে, তেমন অভিমানী। তার মা মনে করলে ওর বাবা মাঠে যাবার আগে মেয়েকে কোনো কারণে বকে গেছে। চান আরো কেঁদে উঠে যা বলে উঠল তার মানে, আল্লারাখা তাদের এ অপমান করবে! সকলের বাড়িতে অপকর্মের কীর্তি রেখে ওদেরে দিয়েও গ্রামবাসীকে জানাতে চায় সে ওদের উপেক্ষা করে—ক্ষমার্হ ওরা। এর চেয়ে ওর অপমান যে ঢের ভালো ছিল।

মা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝালে। কাল অমন করে ওকে অভ্যর্থনা করার দরুনই যে সে এসব করেছে তাও বললে। চানভানুর মন কিন্তু কিছুতেই আর প্রসন্ন হয়ে উঠল না। আল্লারাখা কাঁটার মতো তার মনে এসে বিঁধতে লাগল।

আল্লারাখা হানিফার মতোই তীরন্দাজ। তার প্রথম তীর ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে।

সেদিন দুপুরে যখন চানভানু আরিয়ল খাঁতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লান মুখ দেখে আল্লারাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল, তেমনি তার বুকে কাঁটার মতো কি একটা ব্যথা যেন খচ্ করে উঠল। আহা! ওর মলিন মুখ। নাঃ, চানভানুও সোনাভানের মতোই তীর ছুঁড়তে জানে! তারও অলক্ষ্য লক্ষ্য ঠিক জায়গায় এসে বিঁধল!

আল্লারাখার চোখে চোখ পড়লেই ম্লানমুখী চানভানুর হঠাৎ হাসি পেয়ে

গেল। এ হাসির জন্য সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। এত বড় শয়তানের এমন চুনিবিল্লির মতো মুখ! এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়।

কিন্তু হেসেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এ হাসির যদি আল্লারাখা অন্য মানে করে বসে! ছি ছি ছি ছি!

কিন্তু চানভানুকে এ লজ্জার দায় বেশীক্ষণ পোহাতে হ'ল না। ওর হাসির ছুরি একটু চিকচিকিয়ে উঠতেই আল্লারাখা রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সে মনে করলে, এ হাসির বিজলীর পরেই বুঝি ভীষণ বজ্রপাত হবে। চান দেখতে পেল, অদূরে একটা বিরাট বহুকালের পুরানো অশ্বত্থগাছে আল্লারাখা তর-তর করে উঠে একেবারে আগডালে গিয়ে বসল। কী ভীষণ ছেলে বাবা! ও গাছে যে সাপ আছে সবাই বলে! যদি সাপে কামড়ে দেয়, যদি ডাল ভেঙে পড়ে যায়! চানভানু খানিক দাঁড়িয়ে ওর কীর্তিকলাপ দেখে এই ভাবতে-ভাবতে নদীর জলে স্নান করতে লাগল।

নদীতে নেমেই তার মনে হ'ল, ছি ছি, সে করেছে কি! কেন সে ঐ বাঁদরটাকে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলে? ও যে আস্কারা পেয়ে মাথায় চড়ে বসবে! না জানি সে এতক্ষণ কি মনে করছে।

তার আর সে-দিন সাঁতার কাটা হ'ল না। আরিয়ল খাঁর জল আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চানভানু চুপ করে গলা-জলে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ তার এই প্রশ্নই মনে বারে বারে উদয় হয়েছে —কেন আল্লারাখা ওদের বাড়ি অমন করে গিয়েছিল? ও ত কারুর বাড়ির ভিতরে সহজে যায় না। কেন সে ওকে দেখে অমন করে তাকিয়ে-ছিল? তারপর সারা গাঁয়ের লোকের উপর অত্যাচার করে কেনই বা তার অপমানের প্রতিশোধ নিলে, ওকেই বা কিছু বললে না কেন? ও শুধু বাঁদর নয়, ও বুঝি পাগলও।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তার মনে হ'ল, সে বুঝি অশ্বত্থগাছ থেকে তাকে দেখছে। অনেকটা দূরে অশ্বত্থগাছটা। তবু সে স্পষ্ট দেখতে পেল, অশ্বত্থ-গাছটার ওধারের ডাল থেকে কখন সে এ ধারের ডালে এসে ওরির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কী বালাই! চানভানুর মনে হতে লাগল, ও

বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠতে পারবে না। ওকে ত আরও কতবার দেখেছে, ওরই সামনে সাঁতরেওছে এই নদীতে; কিন্তু এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ ত ছিল না ওর। কী কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়িতে পা দিয়েছিল!

এ যে কালবৈশাখীর মেঘের মতো যত ভয় করে, তত দেখতেও ইচ্ছে করে!

এবারেও তাকে আল্লারাখা মুক্তি দিল। চানভানু দেখলে, আল্লারাখা গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে।

এইবার তার ভীষণ রাগ হ'ল ঐ হতচ্ছাড়ার উপর। সে মনে করে কি! সে কি মনে করে, সে গাছে বসে থাকলে ও স্নান করে উঠে যেতে পারে না? তাই সে দয়া করে নেমে গেল? ও কি মনে করেছিল, পথে দাঁড়িয়ে থাকলে চানভানু আর নদীতে যেতেই পারবে না ভয়ে লজ্জায়? তাই সে পথ ছেড়ে চলে গেছিল? চান নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল। আজ সে দেখিয়ে দেবে যে যত বড় শয়তান হোক সে, তাকে চানভানু থোড়াই কেয়ার করে! জলের মধ্যেও তার শরীর যেন জ্বলতে লাগল! তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে সে জোরে-জোরে পথ চলতে লাগল। এবার যদি পথে দেখা পায় তার, তাহলে দেখিয়ে দেবে কেমন করে ওর নাকের তলা দিয়ে চান হনহনিয়ে চলে যেতে পারে। ওকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না।

কিন্তু কোথাও কেশরঞ্জনবাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেল না। এবারেও সেই অপমান, সেই দয়া। ওকে চান ঘৃণা করে—সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। কিন্তু একি, ওকে একটু অপমান করতে পারল না বলেই কি মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল? ওকে পথে দেখতে পেলে না বলে মনটা ক্রমে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল কেন? যে জোরে সে নদী থেকে আসছিল, পায়ের সে জোর গেল কোথায়? এ কি হ'ল আজ চানের? ওর ঘাড়ে কি তবে ভূত চাপল?

পঞ্চশরের ঠাকুরটির শরে কেউটে সাপের মতোই হয়ত তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিঁধবামাত্র ও বিষ সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে

ওঠে। নইলে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠত না। ওকে ভুলতেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ প্রথম চানভানুর আহারে অরুচি হ'ল। মা প্রমাদ গুণলে। আইবুড়ো মেয়ে বেশী বড় হলে কেন যে ভূতগ্রস্ত হয়—মা যেন আজ তা বুঝতে পারল। গোপনে চোখ মুছে মনে-মনে বললে, ভূতে নজর দিয়েছে মা – আর তোকে রাখা যাবে না, এইবার তোর মায়া কাটাতে হবে।

নারদআলি আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তার বউ মেয়ের পাত্র-সন্ধানের জন্য বলল তাকে। কোনো কথা হ'ল না, দুই জনারই চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

২

চানভানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাস-খানেক মাত্র বাকি। পাশের গাঁয়ের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে বিয়ে।

মোহনপুরের হানিফা, আমাদের আল্লারাখা চানভানুর কেশরঞ্জনবাবু- এ সংবাদে একেবারে 'মরিয়া হইয়া' উঠল। ইস্‌পার কি উস্‌পার! তার চান-ভানুকে চাই-ই চাই! সে জানত, চানভানুর বাপ-মা কিছুতেই তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করা নিরর্থক। তার মাথায় তখন জৈগুন সোনানের কাহিনী হরদম ঘুরপাক খাচ্ছে। সে চানভানুকে হরণ করে দেশান্তরী হয়ে যাবে। কিন্তু ওপথের একটা মুশকিল এই যে, ওতে চানভানুর সম্মতি থাকা দরকার। কি করে ওর সম্মতি নেওয়া যায়?

দেখতে-দেখতে দশটা দিন কেটে গেল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটল না। এগারো দিনের দিন আল্লা আল্লারাখার পানে যেন মুখ তুলে চাইলেন।

এর মধ্যে কতদিন দেখা হয়েছে চানভানুর সাথে তার, কিন্তু কিছুতেই একবারের বেশী দু'বার ওর চোখের দিকে সে তাকাতে পারেনি। যার ভয়ে সারা গ্রাম থরহরি কম্পমান, তার কেন এত ভয় করে এইটুকু

মেয়েকে—আল্লারাখা ভেবে তার কূল-কিনারা পায় না। কিন্তু আর ত সময় নাই, আর ত লজ্জা করলে চলে না। কত মতলবই সে ঠাউরালে। কিন্তু কিছুতেই কোনোটা কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে না।

আজ বুঝি আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় চানভানু যখন জল নিতে গেল, নদীর ঘাট জনমানবশূন্য।

চানভানু নদীর জলে যেই ঘড়া ডুবিয়েছে - অমনি একটু দূরে ভুস করে একটা জল-দানোর মুখ মালসার মতো ভেসে উঠল এবং সেই মুখ থেকে অনুনাসিক স্বরে শব্দ বেরিয়ে এল—'তুই যদি আল্লারাখারে ছাইর‍্যা আর কারেও সাদি করিস, হেই রাত্রেই তোদের ঘাড় মটকাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আসমু!' চানভানু ঐ স্বর এবং ঐ ভীষণ মুখ দেখে একবার মাত্র 'মা গো' বলে জলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। এই শুভ অবসর মনে করে জল-দানো নদী হতে উঠে এল এবং মাথা থেকে নানা রঙের বিচিত্র মালসাটা খুলে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে চানভানুকে কোলে করে ডাঙায় তুলে আনলে। এ জল-দানো আর কেউ নয়, এ আমাদের বিচিত্র-বুদ্ধি আল্লারাখা ওরফে কেশরঞ্জনবাবু।

মিনিট-কয়েকের মধ্যে চানভানুর চৈতন্য হ'ল। চৈতন্য হতেই সে নিজেকে আল্লারাখার কোলে দেখে—লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'তুমি কোহন থ্যা আইলে?' ঝরবার সময় বাঁশ-পাতা যেমন করে কাঁপে, তেমনই করে সে কাঁপতে লাগল। আল্লারাখা বললে, 'এই দিক দিয়া যাইতে ছিলাম, দেহি কেডা জলে ভাসতে আছে, দেইহ্যা জলে ছুড্যা লাফ দিয়া পরলাম, তুইল্যা দেহি তুমি! আল্লারে-আল্লা, খোদায় আনছিল আমারে এই পথে, নইলে কি অইত! কি অইছিল তোমার?'

দু'চোখ ভরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে চানভানু আল্লারাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জল-দানোর বাণীগুলি বাদ দিয়ে বাকি সব ঘটনা বললে।..

আল্লারাখা যখন চানভানুকে নিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সব কথা বলল—তখন তাদের বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। চানভানুর বাপ-মা কাঁদতে-কাঁদতে প্রাণভরে আল্লারাখাকে আশীর্বাদ করল। আল্লারাখা তার

উত্তরে শুধু চানভানুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'কেমন! তোমার কেশরঞ্জনবাবুর পিঠ ভাঙবা নি চেলা কাঠ দিয়ে?'

আজ হঠাৎ যেন খুশীর তুফান উথলে উঠেছিল চানভানুর মনে। এই খুশীর মুখে হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'খোদায় যদি হেই দিন দেয়, ভাঙবাম পিঠ!' বলেই কিন্তু লজ্জায় তার মাটির ভিতরে মুখ লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করতে লাগল। ও-কথার অর্থ ত আল্লারাখার কাছে অবোধ্য নয়। কিন্তু সে-দিন ত খোদা দেবেন না। কুড়ি দিন পরে যে সে হালদার-বাড়ির বৌ হয়ে চলে যাচ্ছে। একি করল সে! সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। তার কেবলই ডুকরে-ডুকরে কান্না পেতে লাগল।

আল্লারাখাও সেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। চানভানুর বাপ-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একি হ'ল! কী এর মানে!

আল্লারাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে গেল। তখন চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো করে। আল্লারাখার মনে হ'ল—ও চাঁদ নয়, ও চানভানু, ওরই মনের আকাশ আলো করে উঠেছে আজ সে।

রাত্রি দশটা পর্যন্ত নদীর ধারে বসে-বসে তারস্বরে চিৎকার করে সে গান করলে। তারপর বাড়ি ফিরে সে ভাবতে লাগল, শুধু জল-দানোর কথা নয়, জল-দানো যা-যা বলেছে, সে কথাগুলোও চান নিশ্চয় তার বাপ-মাকে বলেছে। কালই হয়ত ও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে ওর বাপ-মা আমাদের বাড়িতে এসে বিয়ের কথা পাড়বে। আর তা যদি না করে, নদীতে যদি আর না যায়, ডাঙার ভূত ত বেঁচে আছে!

কিন্তু আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেলেও যখন সে-রকম কোনো কিছু ঘটল না, তখন আল্লারাখার বুঝতে বাকি রইল না যে, চানভানু লজ্জায় বা কোনো কারণে জল-দানোর উপদেশগুলো তার বাপ-মাকে জানায়নি। তা হলে ওর বাপ-মা অমন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠোনে বিয়ের ছানলা তুলতে পারত না। বিফলতার আক্রোশে ক্রোধে সে পাগলের মতো হয়ে উঠল। আর দেরি করলে সব হারাবে সে, এইবার ভূতেদের মুখ দিয়ে সোজা ওর বাপ-মাকেই সব কথা জানাতে হবে।

সে-দিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত রকম কান্নার শব্দে নারদআলিদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'ল—ওদেরই উঠোনে বসে কে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। নারদআলি মনে করলে, আজও বুঝি পাশের বাড়ির সোভান তার বৌকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সেই বৌটা ওদের বাড়ি এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'কেডা কাঁদে গো, বদনার মা নাকি?' কোনো উত্তর এল না। তেমনি কান্না।

কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে নারদআলি বাইরে বেরিয়েই 'আল্লা গো' বলে চিৎকার করে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল। চানের মা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি গো, কে আইল? কেডা?' নারদআলি আর উত্তর না দিয়ে, ১০৫ ডিগ্রী জ্বরের ম্যালেরিয়া রুগীর মতো ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে কেবল 'কুলহুআল্লাহ্' পড়ে বুকে ফুঁ দিতে লাগল। তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তখন ভয়ে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। যত হি-হি-হি-হি করে, তত 'তৌবা-আস্তগফা'র পড়ে তত সে আল্লার নাম নিতে যায়,—কিন্তু আল্লার 'ল' পর্যন্ত এসে ভয়ে জিভ জড়িয়ে যায়।

চানভানুর ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু ভূতের নাম শুনে সে বিছানা কামড়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদআলি বলতে লাগল—'আল্লারে আল্লা! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তগফারুল্লা। তৌবা তৌবা! আউজবিল্ল (নাউজবিল্লা নয়।) বিসমিল্লা! আরে আমি বারাইয়া দেহি তালগাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগ্‌লা বাইন্দ্যা খারাইয়া আছে। দশ হাত লম্বা তার দারি। আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত।'

শুনে চান এবং তার মা দুই জনেরই ভিরমি লাগবার মতো হ'ল। উক্ত তালগাছ-প্রমাণ লম্বা বৃদ্ধ জিনের বাদশা তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে কিনা, তা দেখবার সাহস হ'ল না কারুর। পাড়ার কাউকে চিৎকার করে ডাকবার মতো স্বরও কণ্ঠে অবশিষ্ট ছিল না। গলা যেন চেপে ধরেছে ওদের। তার ওপরে লোক ডাকলে যদি জিনের বাদশা চটে যায়! ওরে বাপরে,

তাহলে আর রক্ষে আছে? তিনজনে বাতি জ্বালিয়ে বসে-বসে কাঁপতে-কাঁপতে আল্লার নাম জপতে লাগল।

জিনের বাদশা সে-রাত্রে আর কোনো উপদ্রব করলে না। আস্তে-আস্তে জিনের বাদশা সামনের আমবাগানে ঢুকে ইশারা করতেই তিন-চারটি বিচিত্র আকৃতির ভূত বেরিয়ে এল। তারা জিনের বাদশার বেশবাস খুলে নিতে লাগল। সে বেশ এইরূপ ছিল ঃ

প্রকাণ্ড দীর্ঘ একটা বাঁশের সাথে স্বল্প-দীর্ঘ আর একটা বাঁশ আড়াআড়ি করে বাঁধা, দীর্ঘ বাঁশটার আগায় একটা মালসা বসিয়ে দেওয়া ; সে মালসায় নানা রকম কালি দিয়ে বীভৎস রকম একটা মুখ আঁকা, সেই মালসার ওপর একটা বিরাট পাগড়ি বাঁধা। মালসার মুখে পাট দিয়ে তৈরী য়্যা লম্বা দাড়ি ঝুলানো, আড়াআড়ি বাঁশটা যেন ওর হাত, সেই হাতে দুটো কাপড় পিরানের ঝোলা হাতার মতো করে দেওয়া ; লম্বা বাঁশটার দুই দিকে দুটো সাদা ধুতি ঝুলিয়ে দেওয়া ; সেই ধুতি দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশটা ধরে চলা। অত বড় লম্বা একটা লোককে রাত্রি বেলায় ঐরকমভাবে চলে দেতে দেখলে ভূতেরই ভয় পায়, মানুষের ত কথাই নাই।

জিনের বাদশার পোশাক খুলে নেবার পর দেখা গেল—সে আমাদের আল্লারাখা।

ভূতের সর্দার আল্লারাখা তার চেলাচামুণ্ডা ও আসবাবপত্র নিয়ে সরে পড়ল। যেতে-যেতে বললে, 'আজ আর না, আজ জিন দেখলো, কাল গায়েবী খবর শুনবো।'

সকালে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—কাল রাত্রে চানভানুর বাড়ি জিনের বাদশা এসেছিলেন। নারদআলি বলেছিল তালগাছের মতো লম্বা কিন্তু গাঁয়ের লোক সেটাকে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে আসমান-ঠেকা করে ছাড়লে। মেয়েরা বলতে লাগল, 'আইবো না, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?'

কেউ-কেউ বললে, 'চানভানুর অত রূপ দেখে ওর ওপর জিন আশক হয়েছে,

ওর ওপর নিজের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়ত বাসর-ঘরেই ঘাড় মটকে মারবে !'

সেদিন সারাদিন মোল্লাজী এসে চানভানুর বাড়িতে কোরাণ পড়লেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ হ'ল। বলা বাহুল্য, ভূতেরাও এসে মৌলুদ শরীফ হয়ে সিন্নি খেয়ে গেল। সেদিন রাত্রে সোভান এবং আরো দু-একজন ওদের বাড়িতে এসে শুয়ে থাকল।

গভীর রাত্রে বাড়ির পেছনের তালগাছটায় একটা বাঁশি বেজে উঠল। ঘুম কারুরই হয়নি ভয়ে। সকলে জানালা দিয়ে দেখতে পেল, তালগাছের ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত লম্বা কালো কুচকুচে একটা পা নীচের দিকে নামছে। খড়-খড়-খড়-খড় করে তালগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। সাথে সাথে ঝর-ঝর-ঝর-ঝর করে এক রাশ ধুলোবালি তালগাছ থেকে নারদআলির টিনের চালের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছয়-সাতটা সুপারিগাছ একসঙ্গে ভীষণভাবে দুলতে লাগল, যেন ভেঙে পড়বে, অথচ গাছে কিছু নেই। এর পর কি হয়েছিল, তার পরদিন সকালে আর কেউ বলতে পারল না, তার কারণ—ঐটুকু পর্যন্ত দেখার পর ওরা ভয়ে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে গেছিল।

এর পরেও যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তা লোপ পেয়ে গেল—যখন একটা কৃষ্ণকায় বেড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের জানালার কাছে এসে পড়ল।

সেইদিন রাত্রে ভূতেদের সর্দার কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'ল যে, আর ওদের ভয় দেখানো হবে না দু-চারদিন, তাহলে ওরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তালগাছ থেকে নামা ভূতের পা বা কালো কাপড় মোড়া বংশদণ্ডটা নাড়তে-নাড়তে ভূতেদের সর্দার আল্লারাখা বললে, 'আমি এক বুদ্ধি ঠাওরাইছি।' ভূতের দল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল শুনবার জন্য।

আল্লারাখা যা বলল তার মানে—সে ঠিক করেছে কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাপিয়ে আনবে। আর সেই চিঠিটা আর একদিন স্বয়ং জিনের বাদশা নারদআলির বাড়িতে দিয়ে আসবে। ব্যস, তাহলেই কেল্লা ফতে।

এই সব ব্যাপারে চানভানুর বিয়ের দিন গেল আরও মাস-খানেক পিছিয়ে। নানান গ্রামের পিচাশ-সিদ্ধ মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীনরা এসে নারদআলির বাড়ির ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। চারপাশের গ্রামে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সাত-আটদিন ধরে যখন আর কোনো উপদ্রব হ'ল না, তখন সবাই বললে, এই সব তন্ত্রমন্ত্রের চোটেই ভূতের পোলারা ল্যাজ তুলে পালিয়েছে। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

এদিকে দ্বিতীয় দিনের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন সকালে, আল্লারাখা কলকাতার পুঁথি-ছাপা এক প্রেসের ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে বই মুসাবিদার পর নিম্নলিখিত চিঠি ও তার যা ছাপা হবে তার কপি পাঠিয়ে দিল। প্রেসের ম্যানেজারকে লিখিত চিঠিটি এই :

শ্রীশ্রীহকনাম ভরসা

মহাশয়

আমার ছালাম জানিবেন। আমার এই লেখাখানা ভাল ও উত্তমরূপে ছাপাইয়া দিবেন।' আর যদি গরীবের পত্রখানা পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে ছাপাইয়া না দেন আর যদি গবিলতি করেন তবে ঈশ্বরের কাছে ঢেকা থাকিবেন। আর ছাপিবার কত খরচ হয় তাহা লিখিয়া দিবেন। হুজুর ও মহাশয় গবিলতি করিবেন না। আর এমন করিয়া দিবেন চারিদিক দিয়া ফেসেং ও অতি উত্তম কাগজে ছাপিবেন।

ইতি। সন ১৩৩৭ সাল ১০ বৈশাখ।

আমাদের ঠিকানা

আল্লারাখা ব্যাপারী

উর্ফে কেশরঞ্জনবাবু। তাহার হাতে পঁহচে।

সাং নহনপুর,

পোং ড্যামুড্যা

জিং ফরিদপুর। (যেখানে আরিয়ল খাঁ নদী

সেইখানে পঁহচে।)

চিঠির সাথে জিনের বাদশার যে গৈবী বাণী ছাপতে দিল তা এই :

বিসমিল্লা আল্লাহো আকবর
লা এলাহা এল্লেল্লা

গায়েব

হে নারদআলি শেখ,

তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।

তোর ম্যায়্যা চানভানুরে,

চুন্নু ব্যাপারীর পোলা আল্লারাখার কাছে বিবাহ দে। তারপর তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি, তোরা যদি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া চুন্নু ব্যাপারীর কাছে তোরা যদি প্রথম কছ তবে সে বলিবে কি এরে এই খানে বিবাহ দিবি। তোরা তবু ছারিছ না। তোরা একদিন আল্লারাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুন্সী আনিয়া কলেমা পরাইয়া দিবি।

খবরদার খবরদার

মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চানভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার! খবরদার! খোদাতাল্লার হুকুম হইয়াছে আল্লারাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হুকুম অমান্য করেছ তবে শেষে তোর মাইয়্যা ছেমরি দুস্কু ও জালার মধ্যে পরিবে।

খবরদার– হুসিয়ার—সাবধান আমার এই পেত্রের উপর ইমান না আনিলে কাফের হইয়া যাইবি।

তোরা আল্লার কাছে বিবাহ দেছ বিবাহের শেষে স্বপনে আমার দেখা পাইবি। চানভানু আমার ভইনের লাহান। আমি উহারে মালমাত্তা দিব। দেখ তোরে আমি বার-বার বলিতেছি—তোর ম্যায়ার আল্লারাখা ছেমরার কাছে সাদি বহিবার একান্ত ইচ্ছা। তবে যদি এ বিবাহ না দেছ, তবে শেষে আলামত দেখিবি। ইতি

জিনের বাদছা
গায়েবুল্লা।

এই কপির কোণাতেও বিশেষ করে সে অনুরোধ করে দিল যেন ছাপার চারি কিনারায় 'ফেসং' হয়। .....

কলকাতা শহর, টাকা দিলে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায়! এই দৈববাণীও আট-দশদিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল। আল্লারাখার আর আনন্দ ধরে না।

আবার ভূতের কমিটি বসল। ঠিক হ'ল সেই রাত্রেই ছাপানো দৈববাণী নারদআলির বাড়িতে রেখে আসতে হবে। জিনের বাদশার সেই পোশাক পরে আল্লারাখা যাবে ওদের বাড়িতে। যদি কেউ জেগে উঠে ঐ চেহারা দেখে, তার দাঁতে দাঁত লাগতে দেরি হবে না। সেদিন রাত্রে জিনের বাদশার দৈববাণী বিনা-বাধায় চালের মটকা ভেদ করে চানভানুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ল। সকাল হতে-না-হতেই আবার গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

নারদআলি ভীষণ ফাঁপরে পড়ল। জিনের বাদশার হুকুমমতে বিয়ে না দিলেই নয় আল্লারাখার সাথে, ওদিকে কিন্তু ছেরাজ হালদারও ছাড়বার পাত্র নয়। ভূত, জিন, পীর এত রটনা সত্ত্বেও ছেরাজ তার ছেলেকে এই মেয়ের সাথেই বিয়ে দেবে দৃঢ় পণ করে বসেছিল। মাজগাঁ এবং মোহনপুরের কোনো লোকই তাকে টলাতে পারেনি। সে বলে, 'খোদায় যদি হায়াত দেয় আমার পোলারে কোনো হালার ভূতের পো মারবার পারব না। একদিন ত ওরে মরবারই অইবো অর কপালে যদি ভূতের হাতেই মরণ লেহা থায়ে, তারে খণ্ডাইব কেডা?'

আসল কথা, ছেরাজ অতি মাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চানভানু বাপ-মার একমাত্র সন্তান, তার ওপর সুন্দরী বলে কোনো বদমায়েশ লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, তাকে ভয় করত না—এমন নয়। তবে সে মনে করেছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে—সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীনকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না। এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোনো মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

ছেরাজের পুত্রও পিতার মতোই সাহসী, চতুর এবং সেয়ানা। সে মনে করেছিল, বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর ভূতটুতগুলো ভাল করে গুণীন দিয়ে ছাড়িয়ে পরে বৌ-এর কাছ ঘেঁষবে।

তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ করে ঠিক করলে—শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভদৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভদৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়িতে আনবে। 'রুয়ৎ' না হওয়া পর্যন্ত চানভানু বাপের বাড়িতেই থাকবে।

নারদআলি ছেরাজ হালদারকে একবার ডেকে পাঠাল তার কাছে। পাশেই গ্রাম। খবর শুনে তখনই ছেরাজ হালদার এসে হাজির হ'ল। ছাপানো 'দৈববাণী' পড়ে সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। তারপর স্থিরকণ্ঠে সে বলে উঠল. 'তুমি যাই ভাব বেয়াই, আমি কইতাছি—এ গায়েবের খবর না, এ ঐ হালার পোলা আল্লারাখার কাজ। হালায় কোনো ছাপাখানা থেইয়া ছাপাইয়া আনছে। জিনের বাদশা তোমারে ছাপাইয়া চিঠি দিব ক্যান্? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ঐ হালার পো হালার কাম যদি না হয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু!'

সত্যই ত এ দিকটা ভেবে দেখেনি ওরা; কিন্তু জিনের বাদশাকে যে সে নিজে চোখে দেখেছে! ওরে বাপরে, ঘর-সমান উঁচু মাথা, এক-কোমর দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। সে অনেক অনুরোধ করলে ছেরাজ হালদারকে—হাতে-পায়ে পর্যন্ত পড়ল তার, তবু তাকে নিরস্ত করতে পারল না। ছেরাজ বললে, 'মরে যদি তারই ছেলে মরবে, এতে নারদআলির ক্ষতিটা কি?'

শেষে যখন ছেরাজ ক্ষতিপূরণের দাবি করে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করবে বলে ভয় দেখালে, তখন নারদআলি হাড় ছেড়ে দিলে।

চানভানুর মা এতদিন কোনো কথা বলেনি। তার মুখে আর পূর্বের হাসি-রসিকতা ছিল না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় এবং এই সব উৎপাতে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। মা-মেয়ে ঘর ছেড়ে আর কোথাও বেরোত না। জল-দানো দেখার পর থেকে মেয়েকে জল তুলে এনে দিত মা, তাতেই চানভানু নাইত। আর সে নদীমুখো হয়নি। তাবিজে-কবচে চানের হাতে

কোমরে গলায় আর জায়গা ছিল না, সোলা বেঁধে যেন ডুবন্ত জাহাজকে ধরে রাখার চেষ্টা।

চানও দিন-দিন শুকিয়ে ম্লান হয়ে উঠছিল। সকলের কাছে শুনে-শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল, তার উপর জিন বা "আসেবের" ভর হয়েছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার চোখের ঘুম গেল উড়ে, মুখের হাসি গেল মুছে, খাওয়া-পরা কোনো-কিছুতে তার কোনো মন রইল না। কিন্তু এ ত বড় মজার ভূত! ভূতই যদি তার ওপর ভর করবে—তবে সে ভূত আল্লারাখার কথা বলে কেন? ভূত ত এমনটি করে না কখনো। সে নিজেই আগলে থাকে তাকে —যার ওপর ভর করে। তবে কি এ ভূত আল্লারাখার পোষা? না, সে নিজেই এই ভূত?

এত অশান্তি-দুশ্চিন্তার মাঝেও সে আল্লারাখাকে কেন যেন ভুলতে পারে না। ওর অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি সর্বদা জোর করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যত মন্দই হোক, চানদের কোনো অনিষ্টই করেনি সে। অথচ কী দুর্ব্যবহারই না চান করেছে ওর সাথে! ওর মনে পড়ে গেল, এর মাঝে একদিন পাড়ার অন্য একটা বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি আসবার সময় আল্লারাখাকে সে পথে পড়ে ছটফট করতে দেখেছিল। রাস্তায় আর কেউ ছিল না তখন। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লারাখা বলেছিল, তাকে সাপে কামড়েছে। কোনখানে কামড়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লারাখা তার বক্ষঃস্থল দেখিয়ে দিয়েছিল। সত্যই তার বুকে রক্ত পড়ছিল। চানভানুর তখন লজ্জার অবসর ছিল না। একদিন ত এই আল্লারাখাই তার প্রাণদান করেছিল নদী থেকে তুলে। সে আল্লারাখার বুকের ক্ষতস্থান চুষে খানিকটা রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে, আবার ক্ষতস্থানে মুখ দেবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কি সাপ কামড়েছে?' আল্লারাখা নীরবে চানভানুর চোখ দুটো দেখিয়ে দিয়েছিল। তার পর কেমন করে টলতে-টলতে চানভানু বাড়ি এসে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল—আজ আর চানের সে-কথা মনে নাই। কিন্তু একথা চানভানু আর আল্লারাখা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না।

চানভানু বুঝেছিল—প্রতারণা করে আল্লারাখা তার বুকে চানের মুখের

ছোঁওয়া পেতে ছুরি বা কিছু দিয়ে বুক কেটে রক্ত বের করেছিল, সাপের কথা একেবারেই মিথ্যা, তবু সে কিছুতেই আল্লারাখার উপর রাগ করতে পারল না। যে ওর একটু ছোঁওয়া পাবার জন্য—হোক তা মুখের ছোঁওয়া—অমন করে বুক চিরে রক্ত বহাতে পারে, তার চেয়ে ওকে কে বেশী ভালবাসে বা বাসবে? হয়ত তার হবু শ্বশুর ছেরাজ যা বলে গেল—তার সবই সত্য, তবু ঐ গ্রামের লোকের চক্ষুশূল ছোঁড়াটার জন্য ওর কেন এমন করে মন কাঁদে? কেন ওকে দিনে একবার দেখতে না পেলে, ওর পৃথিবী শূন্য বলে মনে হয়?

সত্যি-সত্যিই তাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে—হোক সে ভূত, হোক সে জিন, তবু ত তাকে ভালবাসে, তার জন্যই ত সে একবার হয় জিনের বাদশা, একবার হয় তালগাছের একানোড়ে ভূত। চানের মনে হতে লাগল, সাপে আল্লারাখাকে কামড়ায়নি, কামড়েছে তাকে, বিষে ওর মন জর্জরিত হয়ে উঠল।

মার মন অন্তর্যামী। সেই শুধু বুঝল মেয়ের যন্ত্রণা, তার এমন দিনে-দিনে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা। সেও এতদিনে সত্যকার ভূতকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আর ফেরবার উপায় নেই। মেয়েকে নিজে হাতে জবাই করতে হবে। দুর্দান্ত লোক ছেরাজ হালদার, এ সম্বন্ধ ভাঙলে সে কেলেঙ্কারির আর শেষ রাখবে না।

বাপ মা মেয়ে তিনজনেই অসহায় হয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

৩

কিছুতেই কিছু হ'ল না। জীবনে যে পরাজয় দেখেনি, সে আজ পরাজিত হ'ল। জিনের বাদশা, তার দৈববাণী যত রকম ভূত ছিল—একানোড়ে, মামদো, সতর চোখীর মা, বেহ্মদোত্তি, কন্ধকাটা—সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না। তা ছাড়া আল্লারাখার আর পূর্বের মতো সে উৎসাহ ছিল না। যেদিন চানভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেদিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ—সমস্ত হিংসা দ্বেষ লোভ ক্ষুধা—সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল! তার মনের দুষ্ট শয়তান

সেই একদিনের সোনার ছোঁওয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশমণির ছোঁওয়া লেগে ওর অন্তর্লোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল। তার মনের ভূত সেইদিনই মরে গেল।

চানভানুর বিয়ে হয়ে গেল। বর তার কেমন হ'ল, তা সে দেখতে পেল না। দেখবার তার ইচ্ছাও ছিল না। বরও কনেকে দেখলে না ভয়ে—যদি তার ঘাড়ের জিন এসে তার ঘাড় মটকে দেয়! ভাল ভাল গুণীনের সন্ধানে বর সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল।

চানভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লারাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লারাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট-ছোট করে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনি, কাঁধে লাঙ্গল। তার মা সব বুঝলে। তার ছেলে আর চানভানুকে নিয়ে গ্রামে যা সব রটেছে সে তার সব জানে। মা নীরবে চোখ মুছে ঘরে চলে গেল। তার বাপ আর ভাইরা খোদার কাছে আল্লারাখার এই সুমতির জন্য হাজার শোকর ভেজল।....

দূরে হিজলগাছের তলায় আরো দুটি চোখ আল্লারাখার কিষাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে-দিনকার প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতোই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল—সে চোখ চানভানুর! সে দৌড়ে গিয়ে আল্লারাখার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করল?' আল্লারাখা শান্ত হাসি হেসে বলে উঠল, 'জিনের বাদশা।'

বীররামপুর গ্রামের আলি নসীব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলি নসীব। বাড়ি, গাড়ি ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য। ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারী তিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মতো টকটকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

তাঁকে একমাত্র দুঃখ দিয়াছে—নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা পড়ে, দ্বিতীয়টার কতক গেছে উঠে আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভোগের জন্য তাঁর আফসোসের আর অন্ত নেই। মাথার চুলগুলোর অধঃ-পতন রক্ষা করবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেননি, কিন্তু কিছুতেই যখন তা রুখতে পারলেন না, তখন এই বলে সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডেরও টাক ছিল। তাঁর টাকের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন যে, টাক বড়লোকদের মাথাতেই পড়ে—কুলি-মজুরের মাথায় টাক পড়ে না। তা ছাড়া হিসেব-নিকেশ করবার জন্য নি-কেশ মাথারই প্রয়োজন বেশী। কিন্তু টাকের এত সুপারিশ করলেও তিনি মাথা থেকে সহজে টুপি নামাতে চাইতেন না। এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি বলতেন—টাক আর টাকা দুটোকেই লুকিয়ে রাখতে হয়, নইলে লোকে বড় নজর দেয়। টাকা না হয় লুকোলেন, সাদা চুল-দাড়িকে ত লুকোবার আর উপায় নেই। আর, উপায় থাকলেও তিনি আর তাতে রাজী নন। একবার কলপ লাগিয়ে তাঁর মুখ এত ভীষণ ফুলে গেছিল, এবং তার সাথে ডাক্তাররা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে তিনি তৌবা করে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাদা চুল-দাড়িতে তাঁর এতটুকু সৌন্দর্যহানি হয়নি। তাঁর গায়ের রংএর সঙ্গে মিশে তাতে বরং তাঁর চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে; এক বুক শ্বেত শ্মশ্রু—যেন শ্বেত বালুচরে শ্বেত মরালী ডানা বিছিয়ে আছে।

এঁরই বাড়িতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসায় পড়ে—সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর। শান্ত-শিষ্ট গো-বেচারা মানুষটি। উনিশ-কুড়ির বেশী বয়স হবে না, গরীব-শরীফ ঘরের ছেলে দেখে আলি নসীব মিঞা তাকে বাড়িতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান। ছেলেটি অতি মাত্রায় বিনয়াবনত। যাকে বলে -সাত চড়ে রা বেরোবে না। তার হাব-ভাব যেন সর্বদাই বলছে—'আই হ্যাভ্ দি অনার টু বি, সার, ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।'

আলি নসীব মিঞার পাড়ার ছেলেগুলি অতি মাত্রায় দুরন্ত। বেচারা সবুরকে নিয়ে দিনরাত তারা প্যাঁচা খাঁচরা করে। পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে তারা সবুরকে সমানে হাসি-ঠাট্টা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জল ছিঁচে উত্যক্ত করে। ছেঁচা জল আর মিছে কথা নাকি গায়ে বড় লাগে—কিন্তু সবুর নীরবে এসব নির্যাতন সয়ে যায়, একদিনের তরেও বে-সবুর হয়নি।

পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার রুস্তম। সে-ই নিত্য নূতন ফন্দি বের করে সবুরকে ক্ষ্যাপানোর। ছেলে-মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিঞা। তার কারণ, সবুর স্বভাবতই ভীরু নিরীহ ছেলে; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারতপক্ষে তার এঁদো কুঠরি থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন করে কাক লাগে, তেমনি করে ছেলেরা লেগে যায়।

সবুর রাগে না বলে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয় না। তাদের এই ক্ষ্যাপানোর নিত্য-নূতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার 'তালবলিম' (তালেবেএলম্ বা ছাত্র) জায়গীর থাকত না পাড়ার ছেলেগুলির ভয়ে। সবুরের অসীম ধৈর্য। সে এমনি করে তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আর একটা বছর কাটিয়ে দিলেই তার মাদ্রাসার পড়া শেষ হয়ে যায়।

সবুর বেরোলেই ছেলেরা আরম্ভ করে—'প্যাচারে তুমি ডাহ! দুই প্যাচা

মিঞাগো, একডিবার খ্যাচ-খ্যাচাও গো।' রুস্তম রুস্তমী কণ্ঠে গান ধরে—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাচা যায়—
যাইতে যাইতে খ্যাচ্ খ্যাচায়।
কাওওয়ারা সব লইল পাছ,
প্যাচা গিয়া উঠল গাছ।
প্যাচার ভাইশতা কোলা ব্যাং
কইল চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাচা কয়, বাপ বারিত যাও,
পাগ লইছে সল হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়,
বোচা নাকে ফ্যাচ্ফ্যাচায়।

ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বেচারী সবুর তাড়াতাড়ি তার কুঠরিতে ঢুকে দোর লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে রুস্তম গায়—

প্যাচা, একবার খ্যাচ্খ্যাচাও!
গর্ত থাইকা ফুচকি দাও।
মুচকি হাইস্যা কও কথা,
প্যাচারে মোর খাও মাথা!

সবুর কথা কয় না। নীরবে বই নিয়ে পড়তে বসে। যেন কিছুই হয়নি। রুস্তমী দলও নাছোড়বান্দা। আবার গায়—

মেকুরের ছাও মক্কা যায়,
প্যাচায় পড়ে, দেইখ্যা আয়।

হঠাৎ আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। আলি নসীব মিঞা রসিক লোক। তিনি ছেলেদের হাত থেকে সবুরকে বাঁচালেও না হেসে থাকতে পারলেন না। হাসতে-হাসতে বাড়ি ঢুকে দেখেন তাঁর একমাত্র সন্তান নূরজাহান কাঁদতে-কাঁদতে তার মায়ের কাছে নালিশ করছে—কেন পাড়ার ছেলেরা রোজ-রোজ সবুরকে এমন করে জ্বালিয়ে মারবে? তাদের কেউ ত সবুরকে খেতে দেয় না!

তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রুস্তমী দল গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছিল—

প্যাচা মিঞা কেতাব পড়ে
হাঁড়ি নড়ে দাড়ি নড়ে।

নূরজাহান রাগে তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার যত রাগ পড়ল গিয়ে তার বাবার উপর। তার বাবা ত ইচ্ছা করলেই ওদের ধমকে দিতে পারেন। বেচারা সবুর গরীব, স্কুলে পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়ে—এই ত তার অপরাধ। মাদ্রাসায় না পড়ে সে যদি খানায় পড়ত ডোবায় পড়ত —তাতেই বা কার কি ক্ষতি হ'ত? কেন ওরা আদা-জল খেয়ে ওর পিছনে এমন করে লাগবে?

আলি নসীব মিঞা বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি হয়েছে রে বেডী? ছেমরাডা প্যাচার লাহান বারিত বইয়া রইব, একডা কথা কইব না, তাইনাসেন উয়ারে প্যাচা কয়।' নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডায় ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এইদুন্ একচট্‌কনা দিতাম রুস্তাম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে ঐ হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎকা মাইরা আর দামাপানি খাইবার অইত না!' বলেই কেঁদে ফেললে।

আলি নসীব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'চুপ দে বেডী, এইবারে ইবলিশের পোজারা আইলে দাবার পইর‍্যা লইয়া যাইব। মুনসী বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ঐ রুস্তম্যারে ধইরা তার কান ছুডা এক্কেরে মুত্যা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবে!'

নূরজাহান অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, 'আব্বাজান, চা খাইবেন নি?'

আলি নসীব মিঞা হেসে ফেলে বললেন, 'বেডীর বুঝি য়্যাহন চায়ের কথা মনে পরল?'

নূরজাহান আলি নসীব মিঞার একমাত্র সন্তান বলে অতি মাত্রায় আদুরে মেয়ে। বয়স পনরো পেরিয়ে গেছে, অথচ মেয়ের বিয়ে দেবার নাম নেই বাপ-মায়ের। কথা উঠলে বলেন, 'মনের মতো জামাই না পেলে বিয়ে

দেওয়া যায় কি করে ! মেয়েকে ত হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া যায় না।' আসল কথা তা নয়। নূরজাহানের বাপ-মা ভাবতেই পারেন না, ওঁদের ঘরের আলো নূরজাহান অন্য ঘরে চলে গেলে তাঁরা এই আঁধার পুরীতে থাকবেন কি করে ! নইলে এত ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর বরের অভাব হয় না। সম্বন্ধও যে আসে না এমনও নয় ; কিন্তু আলি নসীব মিঞা এমন উদাসীনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তারা আর বেশী দূর না এগিয়ে সরে পড়ে।

নূরজাহান বাড়িতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এখন সবুরের কাছে উর্দু পড়ে। শরীফ ঘরের এত বড় মেয়েকে অনাত্মীয় যুবকের কাছে পড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাছেই আসতে দেয় না বাপ-মা ; কিন্তু এদিক দিয়ে সবুরের এতই সুনাম ছিল যে, সে নূরজাহানকে পড়ায় জেনেও লোক এতটুকু কথা উত্থাপন করেনি।

সবুর যতক্ষণ নূরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে, একটিবারও নূরজাহানের মুখের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ি ঢোকে মাথা নীচু করে, বেরিয়ে যায় মাথা নীচু করে। নূরজাহান, তার বাবা-মা সকলে প্রথম-প্রথম হাসত- এখন সয়ে গেছে !

সত্য-সত্যই এই তিন বছর সবুর এই বাড়িতে আছে, এর মধ্যে সে একদিনের জন্যও নূরজাহানের হাত আর পা ছাড়া মুখ দেখেনি।

এ নূরজাহান জাহানের জ্যোতি না হলেও বীররামপুরের জ্যোতি—জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই। নূরজাহানের নিজেরও যথেষ্ট গর্ব আছে মনে-মনে তার রূপের সম্বন্ধে।

আগে হ'ত না—এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহঙ্কারে আঘাত লাগে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তা হলে কোনো আকর্ষণই নেই ? আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়ছে—এত কাছে, তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখল না ? সবুর তাকে ভালোবাসুক—এমন কথা সে ভাবতেই পারে না, কিন্তু ভালো না বাসলেও, যার রূপের এত খ্যাতি এ অঞ্চলে — যাকে একটু দেখতে পেলে অন্য যে কোনো যুবক জন্মের জন্য ধন্য হয়ে যায়

—তাকে একটি বার একটুক্ষণের জন্যেও সে চেয়েও দেখল না ? তার সতীত্ব কি নারীর সতীত্বের চেয়েও ঠুনকো ?

ভাবতে-ভাবতে সবুরের উপর তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে, মন বিষিয়ে যায়, ভাবে আর তার কাছে পড়বে না। কিন্তু যখন দেখে—নির্দোষী নির্বিরোধী নিরীহ সবুরের উপর রুস্তমী দল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাকতে পারে না। আহা, বেচারার হয়ে কথা কইবার যে কেউ নেই! সে নিজেও যে একটিবার মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না। এ কি পুরুষ মানুষ বাবা! মার, কাট, মুখ দিয়ে কথাটি নেই! এমন মানুষও থাকে দুনিয়াতে!

যত সে এই সব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটির ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে।

সবুর পুরুষ বলতে যে মর্দ-মিনসে বোঝায়—তা ত নয়ই, সুপুরুষও নয়। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারা। রূপের মধ্যে তার চোখ দুটি। যেন দুটি ভীরু পাখি। একবার চেয়েই অমনি নত হয়ে পড়ে। সে চোখ, তার চাউনি—যেমন ভীরু, তেমনি করুণ, তেমনি অপূর্ব সুন্দর। পুরুষের অত বড় অত সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না। এই তিন বছর সে এই বাড়িতে আছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসা না করলে—সে অন্য লোক তো দূরের কথা, এই বাড়িরই কারুর সাথে কথা কয়নি। নামাজ পড়ে, কোরাণ তেলাওত করে, মাদ্রাসা যায় আসে, পড়ে কিম্বা ঘুমায়—এই তার কাজ। কোনো দিন যদি ভুলক্রমে ভিতর থেকে খাবার না আসে, সে না খেয়েই মাদ্রাসা চলে যায়—চেয়ে খায় না। পেট না ভরলেও দ্বিতীয় বার খাবার চেয়ে নেয় না। তেষ্টা পেলে পুকুরঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আসে, বাড়ির লোকের কাছে চায় না!

সবুর এত অসহায় বলেই নূরজাহানের অন্তরের সমস্ত মমতা, সমস্ত করুণা ওকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে। সে না থাকলে, বোধ হয় সবুরের খাওয়াই হ'ত না সময়ে। কিন্তু নূরজাহানের এত যে যত্ন, এত যে মমতা এর বিনিময়ে সবুর এতটুকু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে দেখেনি, কিছু বলা ত দূরের কথা, মারলে-কাটলেও অভিযোগ করে না, সোনা-দানা দিলেও কথা কয় না।

সেদিন আলি নসীব মিঞার বাড়িতে একজন জবরদস্ত পশ্চিমে মৌলবী সাহেব এসেছেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ ও ওয়াজনসীহৎ হবে। মৌলবী সাহেবের সেবা-যত্নের ভার পড়েছে সবুরের উপর। বেচারা জীবনে এত বেশী বিব্রত হয়নি। কি করে, সে তার সাধ্যমতো মৌলবী সাহেবের খেদমত করতে লাগল।

সবুরকে বাইরে বেরুতে দেখে রুস্তমী দলের একটি দুটি করে ছেলে এসে জুটতে লাগল। তাদের দেখে সবুর বেচারার, ভাসুরকে দেখে ভাদ্রবউর যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হ'ল।

মৌলবী সাহেবের পাগড়ির ওজন কত, দাড়ির ওজন কত, শরীরটাই বা কয়টা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তাঁর গোঁফ উই-এ না ইঁদুরে খেয়েছে,—এই সব গবেষণা নিয়েই রুস্তমী দল মত্ত ছিল, রুস্তম তখনো এসে পৌঁছেনি বলে সবুরকে জ্বালাতন করা শুরু করে'ন।

হঠাৎ মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দুতে সবুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি করে? সবুর বিনীতভাবে বললে, সে তালেবেএলম বা ছাত্র। আর যায় কোথা! ইউসোফ বলে উঠল, প্যাঁচা মিঞা কি কইল, রে ফজল্যা? ফজল হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, প্যাঁচা মিঞা কইল, মুই তালবিলিম! ততক্ষণে রুস্তম এসে পড়েছে। সে ফজলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, কেডা তালবিল্লি? প্যাঁচা মিঞা? ছেলেরা হাসতে-হাসতে শুয়ে পড়ে রোলারের মতো গড়াতে লাগল। হায়! রুস্তম্যা জোর কইছে রে! তালবিল্লি —উরে বাপ্‌পুরে ইল্লারে বিল্লা! তালবিল্লি—হি-হি-হি হা-হা-হা! বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। কস্তা-পেড়ে হাসি।

বেচারা সবুর ততক্ষণে মৌলবী সাহেবের সেবা-টেবা ফেলে তার কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে। রুস্তম সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে গাইতে লাগল—

প্যাঁচা আইল তালবিল্লি,
দেওবন্দ যাইয়া যাইব দিল্লি!
আইয়া করব চিল্লাচিল্লি—
কুত্তার ছাও আর ইল্লিবিল্লি!

মৌলবী সাহেব আর থাকতে পারলেন না। আস্তিন গুটিয়ে ছেলেদের তাড়া করে এলেন। ছেলেরা তাঁর বিশিষ্টরূপে শালের মতো বিশাল দেহ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে গেয়ে গেল—

উলু আয়া লাহোর সে
আজ পড়েগা আলেফ বে!

মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দু ছেড়ে দিয়ে ঠেট হিন্দিতে ছেলেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলেন।

আলি নসীব মিঞা সব শুনে ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। আজ মৌলবী সাহেবের সামনে তাদের বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবেন। কিন্তু ছেলেদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছেলেরা ততক্ষণে তিন-চার মাইল দূরে এক বিলের ধারে ব্যাং সংগ্রহের চেষ্টায় বেড়াচ্ছে। মৌলবী সাহেব তাদের তাড়া করায়, তারা বেজায় চটে গিয়ে ঠিক করেছে—আজ মৌলবী সাহেবের ওয়াজ পণ্ড করতে হবে। স্থির হয়েছে, যখন বেশ জমে আসবে ওয়াজ, তখন একজন ছেলে একটা ব্যাং-এর পেট এমন করে টিপবে যে, ব্যাংটা ঠিক সাপে ধরা ব্যাং-এর মতো চ্যাঁচাবে; ততক্ষণে আর একজন আর একটা ব্যাং মজলিসের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, সেটা যখন লাফাতে থাকবে—তখন অন্য একজন ছেলে চিৎকার করে উঠবে—সাপ! সাপ!

ব্যস! তাহলেই ওয়াজের দফা ঐখানেই ইতি।

বহু চেষ্টার পর গোটাকতক ব্যাং ধরে নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরল। আলি নসীব মিঞার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বারী বলে উঠল, 'রুস্তম্যারে, হালার তালবিল্লি, পায়খানায় গিয়াছে। বদনাটা উড়াইয়া লইয়া আইমু?'

রুস্তম খুশী হয়ে তখনি হুকুম দিল। বারী আস্তে-আস্তে বদনাটি উঠিয়ে এনে পুকুরঘাটে রেখে দিয়ে এল।

এক ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, সবুর যেমন অবস্থায় গিয়ে বসেছিল তেমনি অবস্থায় বসে রইল পায়খানায়। বেরও হয় না, কাউকে দিয়ে বদনাও চায় না। দূরে আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।

আলি নসীব মিঞা ভাবলেন, নিশ্চয়ই সবুরের কিছু একটা করেছে পাজী ছেলের দল। কিন্তু এসে সবুরকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তারাও কিছু জানে না বললে। ছেলের দল হল্লা করছিল "তালবিল্লি" বলে—এইটুকুই তারা জানে।

আরো দুই ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর সবুরের সন্ধান পাওয়া গেল। সবুর সব বললে। কিন্তু তাতে উলটো ফল হ'ল। আলি নসীব মিঞা তাকেই বকতে লাগলেন—সে কেন বেরিয়ে এসে কারুর কাছে বদনা চাইলে না। এ ব্যাপার শুনে নূরজাহান রাগ করার চেয়ে হাসলেই বেশী। এমন সোজা মানুষ হয়!

আর একদিন সে হেসেছিল সবুরের দুর্দশায়। সবুর একদিন চুল কাটাচ্ছিল। রুস্তম তা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে নাপিতকে ইশারায় একটা লোভ দেখিয়ে মাঝখানে টিকি রেখে দিতে বলে। সুশীল নাপিতও তা পালন করে। চুল কেটে স্নান করে সবুর যখন বাড়িতে খেতে গেছে, তখন নূরজাহানেরই চোখে পড়ে প্রথম তার দৃশ্য। নূরজাহানের হাসিতে যে ব্যথা পেয়েছিল সবুর, তা সেদিন নূরজাহানের চোখ এড়ায়নি।

আজ আবার হেসে ফেলেই নূরজাহানের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। সবুরের সে-দিনের মুখ স্মরণ করে। কি জানি কেন, তার চোখ জলে ভরে উঠল।

সন্ধ্যায় যখন মৌলবী সাহেব ওয়াজ করছেন, এবং ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝতে না পারছে, তত ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠছে—তখন সহসা মজলিসের এক কোণায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল। শ্রোতৃবৃন্দ চকিত হয়ে উঠল। একটু পরে দেখা গেল, রক্তাক্ত-কলেবর বুঝিবা সেই ভেকপ্রবরই উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথার উপর দিয়া হাউণ্ড রেস আরম্ভ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল—সাপ! সাপ!

আর বলতে হ'ল না। নিমেষে যে যেখানে পারল—পালিয়ে গেল। মৌলবী সাহেব তক্তাপোষে উঠে পড়ে জাব্বা-জোব্বা ঝাড়তে লাগলেন। আর ওয়াজ হ'ল না সেদিন।

মৌলবী সাহেব যখন খেতে বসেছেন, তখন অদূরে গান শোনা গেল—

'উলু! বোলো' কহে সাপ
উলু বোলে—'বাপরে বাপ!'
'কাল নসীহত হোগা ফের!'
উলু বোলে—'ফের ফের ফের!'
লে উঠা লোটা কম্বল
উলু! আপনা গুতন চল!

সহসা মৌলবী সাহেবের গলায় মুর্গীর ঠ্যাং আটকে গেল। আলি নসীব মিঞা নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

৩

সেদিন রাস্তা দিয়ে গফরগাঁও-এর জমিদারদের হাতী যাচ্ছিল। নূরজাহান বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারা সবুরও হাতী দেখার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতীটার দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এরিও তালবিল্লি মিঞা গো হুই তোমাগ বাছুরডা আইতাছে, ধইরা লইয়াও।' রাস্তার সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। রাস্তার একটা মেয়ে বলে উঠল, 'বিজাত্যার পোলাডা। হাতীটা বাছুর না, বাছুর তুই!' ভাগ্যিস রুস্তম শুনতে পায়নি।

নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে যত না রাগল ছেলেগুলোর উপর, তার অধিক রেগে উঠল সবুরের উপর। সে প্রতিজ্ঞা করলে মনে-মনে, আজ তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। এই কি পুরুষ! মেয়েছেলেরও অধম যে!

সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না করে নূরজাহান বলে উঠল, 'আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবশিলা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইল্যা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না?'

সবুর আজ যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটি নূরজাহানের মুখের উপর তুলে ধরল। কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে, তাতে তার ব্যথা লজ্জা

অপমান ভুলে গেল সে। দুই চোখে তার অসীম বিস্ময় অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। এই তুমি! সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'নূরজাহান!'

নূরজাহানও বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোনো বনের ভীরু হরিণ? অমন হরিণচোখ যার, সে কি ভীরু না হয়ে পারে? নূরজাহান কখনো সবুরকে চোখ তুলে চাইতে দেখেনি। সে রাস্তা চলতে কথা কইতে—সব সময় চোখ নীচু করে। মানুষের চোখ যে মানুষকে এত সুন্দর করে তুলতে পারে—তা আজ সে প্রথম দেখল।

সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল।

আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্তমহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সেদিন কথা কয়, যেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নি-গিরি।

সবুরের চোখ-মুখে পৌরুষের প্রখর দীপ্তি ফুটে উঠল। সে নূরজাহানের দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'ঐ পোলাপানেরে যদি জওয়াব দিই, তুমি খুশী হও?' নূরজাহানও চকচকে চোখ তুলে বলে উঠল, 'কে জওয়াব দিব? আপনি?'

এ মৃদু বিদ্রূপের উত্তর না দিয়ে সবুর তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটির জ্বলন্ত ছাপ নূরজাহানের বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। নূরজাহান আত্ম-বিস্মৃতির মতো সেইখানেই বসে রইল। তার দুটি সুন্দর চোখ আর ততোধিক সুন্দর চাউনি ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রইল না। সবুরকে কেউ কখনো চোখ তুলে চাইতে দেখেনি, আজ সে উজ্জ্বল চোখে দৃপ্তপদে রাস্তায় পায়চারি করছে দেখে সকলে অবাক হয়ে উঠল।

রুস্তমী দল গাঙের পার থেকে বেরিয়ে সেই পথে ফিরছিল। হঠাৎ ফজল চিৎকার করে উঠল, 'উইরি তালবিল্লি!'

সবুর ভাল করে আস্তিন গুটিয়ে নিল।

বারী পিছু দিক থেকে সবুরের মাথায় ঠোকর দিয়ে বলে উঠল, 'প্যাচারে, তুমি ডাহ!'

সবুর কিছু না বলে এমন জোরে বারীর গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল যে, সে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। সবুরের এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দলের সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সবুর কথাটি না বলে গম্ভীরভাবে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। বারী ততক্ষণে উঠে বসেছে। উঠেই সে চীৎকার করে উঠল, 'সে হালায় গেল কোই?' বলতেই সকলের যেন হুঁস ফিরে এল। মার মার করে সকলে গিয়ে সবুরকে আক্রমণ করলে। সবুরও অসীম সাহসে তাদের প্রতি-আক্রমণ করলে। সবুরের গায়ে যে এত শক্তি তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সে রুস্তমী দলের এক-একজনের টুঁটি ধরে পাশে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

আলি নসীব মিঞার এই পুকুরটা নতুন কাটানো হয়েছিল, আর তার মাটিও ছিল অস্ত্যন্ত পিছল। কাজেই যারা পুকুরে পড়তে লাগল গড়িয়ে তারা বহু চেষ্টাতেও পুকুরের অত্যুচ্চ পাড় বেয়ে সহজে উঠতে পাবল না, পা পিছলে বারে-বারে জলে পড়তে লাগল গিয়ে। এইরূপে যখন দলের পাঁচ-ছয়জন মায় রুস্তম সর্দার, জলে গিয়ে পড়েছে—তখন রুস্তমী দলের আমীর তার পকেট থেকে দু-ফলা ছুরিটা বের করে সবুরকে আক্রমণ করল। ভাগ্যক্রমে প্রথম ছুরির আঘাত সবুরের বুকে না লেগে হাতে গিয়ে লাগল। সবুর প্রাণপণে আমীরের হাতের ছুরি সমেত উলটে পড়ে গেল এবং আমীরের হাতের ছুরি আমীরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। আমীর একবার মাত্র 'উঃ' বলেই অচৈতন্য হয়ে গেল। বাকি যারা যুদ্ধ করেছিল তারা পাড়ায় গিয়ে খবর দিতেই পাড়ার লোক ছুটে এল। আলি নসীব মিঞাও এলেন।

সবুর ততক্ষণে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমীরকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকের ছরিটা তুলে ফেলে সেই ক্ষতমুখে হাত চেপে ধরেছে। আর তার হাত বেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্তধারা ছুটে চলেছে।

আলি নসীব মিঞা তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর চক্ষু ঢেকে ফেললেন।···

একটু পরে ডাক্তার এবং পুলিশ দু-ই এল। আমীরকে নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়, সবুরকে নিয়ে গেল থানায়।

সবুরকে থানায় নিয়ে যাবার আগে দারোগাবাবু আলি নসীব মিঞার অনুরোধে তাঁকে একবার তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে দারোগাবাবুর কাছে একটুও অতিরঞ্জিত না করে সমস্ত কথা খুলে বললে। তার কথা অবিশ্বাস করতে কারুরই প্রবৃত্তি হ'ল না। দারোবাবু বললেন, 'কেস খুব সিরিয়াস নয়, ছেলেটা বেঁচে যাবে। এ কেস আপনারা আপসে মিটিয়ে ফেলুন সাহেব।'

আলি নসীব মিঞা বললেন, 'আমার কোনো আপত্তি নাই দারোগা সাহেব, আমীরের বাপ কি কেস মিটাইব? তারে ত আপনি জানেন। যারে কয় এক্কেরে বাঙাল!'

দারোগাবাবু বললেন, 'দেখা যাক, এখন ত ওকে থানায় নিয়ে যাই। কি করি, আমাদের কর্তব্য করতেই হবে।'

ততক্ষণে আলি নসীব মিঞার বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এই খবর শুনেই নূরজাহান মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। আলি নসীব মিঞা যখন সবুরকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন নূরজাহান একেবারে প্রায় সবুরের পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমাকে এমনডা করবার কইছিল? কেন এমনডা করলে?'

নূরজাহানের মা সবুরকে তাঁর গুণের জন্য ছেলের মতোই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সবুরের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরে কেঁদে কেঁদে আলি নসীব মিঞাকে বললেন, 'আমার পোলা এ, আমি দশ হাজার দিবাম, দারোগাব্যাডারে কন, হে এরে ছাইয়া দিয়া যাক!'

সবুর তার রক্তমাখা হাত দিয়ে নূরজাহানকে তুলে বলে উঠল, 'আমি যাইতেছি ভাই! যাইবার আগে দেহাইয়া গেলাম—আমিও মানষের পোলা। এ যদি না দেহাইতাম, তুমি আমায় ঘৃণা করত্যা। খোদায় তোমায় সুখে রাখুন! বলেই তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললে, 'আম্মাগো! এই তিনডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের শোক ভুলাইছিলেন।' আর সে বলতে পারল না কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আলি নসীব মিঞার পদধূলি নিয়ে সে নির্বিকারচিত্তে থানায় চলে গেল। দারোগাবাবু কিছুতেই জামিন দিতে রাজী হলেন না। দশ হাজার টাকার বিনিময়েও না, খুনী আসামীকে ছোড় দিলে তাঁর চাকরি যাবে। নূর-জাহানের কানে কেবল ধ্বনিত হতে লাগল, 'তুমি আমায় ঘৃণা করত্যা!' তার ঘৃণায় সবুরের কি আসত যেত? কেন সে তাকে খুশী করবার জন্যে এমন করে মরিয়া হয়ে উঠল? সে যদি আজ এমন করে না বলত সবুরকে, তা হলে কখনই সে এমন কাজ করত না। এমন নির্যাতন ত সে তিন বছর ধরে সয়ে আসছে। তারই জন্য আজ সে থানায় গেল। দুদিন পরে হয়ত তার জেল, দীপান্তর—হয়ত বা তার চেয়েও বেশী - ফাঁসি হয়ে যাবে! 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

আলি নসীব মিঞা যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। আজ সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকি দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। একবার মনে হ'ল, বুঝি বা দুধ-কলা দিয়ে তিনি সাপ পুষেছিলেন। পরক্ষণেই মনে হ'ল, সে সাপ নয়—সাপ নয়, ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। আর যদি সাপই হয় তা হলেও ওর মাথায় মণি আছে। ও জাত-সাপ।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁর অনুকম্পায় প্রতিপালিত হলেও বংশ-মর্যাদায় সবুর তাঁদের চেয়েও অনেক উচ্চে। আজ সে দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন, নিঃসহায়—কিন্তু একদিন এদেরই বাড়িতে আলি নসীব মিঞার পূর্বপুরুষেরা নওকরী করেছেন। তা ছাড়া এই তিন বছর তিনি সবুরকে যে অন্নবস্ত্র দিয়েছেন, তার বিনিময়ে সে তাঁর কন্যাকে উর্দু ও ফার্সিতে যে কোনো মাদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী করে দিয়ে গেছে। আলি নসীব মিঞা নিজে মাদ্রাসাপাস্ হলেও মেয়ের কাছে তাঁর উর্দু ফার্সি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভয় হয়। সে ত এতটুকু ঋণ রেখে যায়নি। শ্রদ্ধায় প্রীতিতে পুত্রস্নেহে তাঁর বুক ভরে উঠল।....যেমন করে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে।

নিজের জন্য নয়, নিজের চেয়েও প্রিয় ঐ কন্যার জন্য। আজ ত আর তাঁর মেয়ের মন বুঝতে বাকি নেই। অন্যের ঘরে পাঠাবার ভয়ে মেয়ের বিয়ের নামে শিউরে উঠেছেন এতদিন ; আজ যদি এই ছেলের হাতে মেয়েকে দেওয়া

যায়—মেয়ে সুখী হবে, তাকে পাঠাতেও হবে না অন্য ঘরে। সে-ই ত ঘরের ছেলে হয়ে থাকবে। উচ্চশিক্ষা? মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা ত সে দিয়েইছে—পাসও করবে সে, হয়ত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে। তারপর কলেজে ভর্তি করে দিলেই হবে।

এই ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করে—আলি নসীব মিঞা অনেকটা শান্ত হলেন এবং মেয়েকেও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সে রাত্রে নূরজাহানের আর মূর্ছা হ'ল না, সে ঘুমাতেও পারল না। সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল—সেই দুটি চোখ, দুটি তারার মতো। প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যাতারা।

৪

আমীরকে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে—সবুরকে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে।

ময়মনসিংহের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই তার মৃত্যু হ'ল। আমীরের পিতা কিছুতেই মিটমিট করতে রাজী হলেন না তিনি এই বলে নালিশ করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমীরের বিয়ে দেন, আর তা জানতে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ, সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন—যারা ঐ দুর্ঘটনার দিন নূরজাহানকে সবুরের পা ধরে কাঁদতে দেখেছে। তা ছাড়া সবুর পড়াবার নাম করে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত। নূরজাহান আর আলি নসীব মিঞা একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। দেশময় টি-টি পড়ে গেল। অধিকাংশ লোকেই একথা বিশ্বাস করল।

আলি নসীব মিঞা শত চেষ্টা করেও সবুরকে উকিল দেওয়াবার জন্য রাজী করাতে পারলেন না। সে কোর্টে বললে, সে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্পণ করবে —উকিল বা সাক্ষী কিছুই দিতে চায় না সে। আলি নসীব মিঞার টাকার লোভে বহু উকিল সাধ্য-সাধনা করেও সবুরকে টলাতে পারলে না। আলি নসীব মিঞা তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তাকে জেলে দেখা করে শেষ চেষ্টা

করেছিলেন। তাতেও সফলকাম হননি। নূরজাহানের অনুরোধে সে বলেছিল, অনেক ক্ষতিই তোমাদের করে গেলাম—তার উপরে তোমাদের আরো আর্থিক ক্ষতি করে আমার বোঝা ভারী করে তুলতে চাইনে। আমায় ক্ষমা করো নূরজাহান, আমি তোমাদের আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে বলেই এই দয়াটুকু চাই।

সে সেশনে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক অকপটে বলে। জজ সব কথা বিশ্বাস করলেন। জুরিরা বিশ্বাস করলেন না। সবুর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। আপীল করল না। সকলে বললে, আপীল করলে সে মুক্তি পাবেই। তার উত্তরে সবুর হেসে বলেছিল যে, সে মুক্তি চায় না—আমীরের যেটুকু রক্ত তার হাতে লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেলতে সাতটা বছরে যদি সে পারে—সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

জজ তাঁর রায়ে লিখেছিলেন, আর কাউকে দণ্ড দিতে এত ব্যথা তিনি পাননি জীবনে।

যেদিন বিচার শেষ হয়ে গেল, সেদিন সপরিবারে আলি নসীব মিঞা ময়মনসিংহে ছিলেন।

নূরজাহান তার বাবাকে সেই দিনই ধরে বসলে—তারা সদলে মক্কা যাবে। আলি নসীব মিঞা বহুদিন থেকে হজ করতে যাবেন বলে মনে করে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতেনও সে-কথা। নানান কাজে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, মেয়ের কথায় তিনি যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক কইছস বেডী, চল আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাকবাম না। আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তালবিল্লিরে কইয়া যাইবাম, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে!' 'বেডা তালবিল্লি' বলেই হো-হো করে পাগলের মতো হেসে উঠেই—আলি নসীব মিঞা পরক্ষণে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

নূরজাহানের মা প্রতিবাদ করলেন না। তিনি জানতেন, মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে, তাতে তার বিয়ে আর এ দেশে দেওয়া চলবে না। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এদেশে থাকাও চলে না।

ঠিক হ'ল, একবারে সব ঠিকঠাক করে জমি-জায়গা বিক্রি করে শুধু নগদ টাকা নিয়ে চলে যাবেন। আলি মিঞা সেই স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে দেখা করে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এলেন। কথা হ'ল ব্যাঙ্কই এখন টাকা দিয়ে দেবে, পরে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবে।

তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুনল। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। জেলের জামার হাতায় তা মুছে বললে, 'আব্বা, আম্মা, আমি সাত বছর পরে যাইবাম আপনাদের কাছে কথা দিতাছি।'

তারপর নূরজাহানের দিকে ফিরে বললে, 'আমার যদি এই তুনিয়ায় দেখবার না দেয়, যে তুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।' অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বলতে পারলে না। নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে সবুরের পায়ের ধুলা নিতে গিয়ে তার তু-ফোঁটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'তাই দোওয়া কর!'

কারাগারের তুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে নূর-জাহানের মনে হ'ল তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল।

শিউলি-মালা

মিষ্টার আজহার কলকাতার নামকরা তরুণ ব্যারিষ্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরাণীতে বাড়ি তার হর্দম সরগরম।

নামকরা ব্যারিষ্টার হলেও আজহার সহজে বেশী কেস নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও এক রকম চাল।

কিন্তু কলকাতার দাবাড়েরা জানে যে মিষ্টার আজহারের চাল যদি থাকে ত সে দাবার চাল।

দাবা-খেলায় তাকে আজো কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতেই মিষ্টার আজহারকে বড় ব্যারিষ্টার হতে দেয়নি, কিন্তু বড় মানুষ করে রেখেছে।

বড় ব্যারিষ্টার যখন 'উইকলি নোট্‌স' পড়েন, আজহার তখন অ্যালেখিন ক্যাপাব্লাঙ্কা কিম্বা রুবিনষ্টা[illegible]ন, রেটী, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিম্বা চেন-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে আর হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কলকাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবাড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজহারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মতো খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল! অথচ এই অ্যালেখিনই বেগোল-জুবোর মতো খেলোয়াড়ের কাছে অন্ততঃ পাঁচ-পাঁচবার হেরে যায়! মিষ্টার মুখার্জী অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিষ্টার আজহার নিত্যকার মতো একবার ঐ কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিষ্টার মুখার্জী বলে উঠলো, 'কিন্তু তুই যাই বল আজহার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স—ওর বুঝি জগতে

তুলনা নেই। আর বেগোল-জুবো? ও যে অ্যালিখিনের কাছে তিন-পাঁচে পনের বার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু-চার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন। চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তা ছাড়া, বেগোল-জুবোও ত যে সে খেলোয়াড় নয়।'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'আরে রাখ তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দশা! আর বেগোল-জুবোকে ত সেদিনও ইটালিয়ান মন্টিসেলি বগল-দাবা করে দিলে। হ্যাঁ, খেলে বটে গ্রানফেলড।'

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, 'তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ডু, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম—জ্বালালে বাবা!'

মুখার্জী হেসে বললে, 'তুমি ত বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চলে যাওনা স্ত্রীর-বোনেদের বাড়িতে। এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

তরুণ উকিল নাজিম হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে উঠল, 'ও জিনিস মাথায় না ঢুকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজহার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বস।'

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না। আজহারকে গাইতে হ'ল। আজহার চমৎকার ঠুংরী গায়। বিশুদ্ধ লক্ষ্ণৌ ঢং-এর অজস্র ঠুংরী গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুনত, সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলি গজল গাইতে লাগল।

আজহার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জী হেসে বলে উঠল, 'আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবল গজল গাচ্ছ, মানে কি? রংটং ধরেছে নাকি কোথাও?'

আজহারও হেসে বলল, 'বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।'

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়ল। একটু আগের

বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ, যেন একটি বিরাট নীলপদ্ম। তারি মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক ভ্রমর।
লেক-রোডের পাশে ছবির মতো বাড়িটি।
শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে-মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির করে তুলেছিল।
সকলেরি চোখ মন দু-ই যেন জুড়িয়ে গেল।
নাজিম সোজা হয়ে বসে বলল, 'ওই দাবার গুটি নিয়ে বসলে কি আর এসব চোখে পড়ত?'
আজহার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'সত্যিই তাই।'
মুখার্জী বলে উঠল, 'নাঃ, এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেলতে দেবে না দেখছি!'
আজহার বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তোমারও শিউলি ফুলের সঙ্গে কোনো কিছু জড়িত আছে নাকি হে?'
তার কিছু বলবার আগেই অজিত বলে উঠল, 'আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে। নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়া। রাম বল! তাও—সে স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি—ঐ দাবার জ্বালায়। ওর আবার শিউলি ফুল!'
সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। মুখার্জী চটে গিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম অজিত! পাগলের মতো যা তা বকলেই তাকে রসিকতা বলে না।'
অজিত মুখ চুন করার ভান করে বলে উঠল, 'আমি ত রসিকতা করিনি দাদা। তুমি সত্যসত্যই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ—দশজনে বদনাম দেয়, তাই আমিও বললাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কি দোষ হ'ল?'
আজহার হেসে বলে উঠল, 'একি তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না, এ তুমি কি করে জানলে?'
অজিত বললে, 'প্রথম মিষ্টার মুখার্জী, তারপর তোমাকে দেখে।'
আজহার বলে উঠল, 'আরে আমি যে বিয়েই করিনি।'

অজিত বলে উঠল, 'তার মানে, তোমার অবস্থা আরো শোচনীয়। ও বেচারা তবু অন্ততঃ স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুটল না।'

নাজিম টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ব্রাভো! বেঁচে থাকুন অজিত-বাবু! এইবার জোর বলেছেন।'

এমন সময় মালি শিউলি ফুলের একজোড়া চমৎকার গোড়ে-মালা টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। অজিত গম্ভীরভাবে মালা দুটি ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই সকলে হেসে উঠল। অজিত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে বলে উঠল, 'হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী! আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশিথে এই সেঁউতি মালার—'

আজহার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বলল, 'দোহাই অজিত, ও মালা নিয়ে বিদ্রূপ করিসনে ভাই। ও মালা আমার নয়।'

অজিত না-ছোড়বান্দা। তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে বলে উঠল, 'তবে এ মালা কার বন্ধু? থুড়ি কার উদ্দেশ্যে বন্ধু?'

নাজিম বলে উঠল, 'দেখ, দাবাড়ের নাকি রোমান্স নেই?'

আজহার বলে উঠল, 'আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলি ফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ-মালা জলের—অন্য কারুর নয়। মুখে বিষাদ-মাখা হাসি।'

মায় দাবাড়ের দল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলে ভাল করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসে আজহারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তারপর, বলত বন্ধু, ব্যাপারটা কি! সঙীন নিশ্চয়! পয়লা আশ্বিন—প্রতি বছর—শিউলিমালা—জলে ভাসিয়ে দেওয়া! চমৎকার গল্প হবে! বলে ফেল। নইলে এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবো।' সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজহার হেসে বলে উঠল, 'কিন্তু তারও আরম্ভ যে দাবা খেলা দিয়ে।'

অজিত লাফিয়ে বলে উঠল, 'তা হোক। ও পলতার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব।'

মুখার্জী বলে উঠল, 'এ দাবা খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশী থাকবে হে! গজ ঘোড়া সব কাটাকাটি হয়ে যাবে। ভয় নেই।'

২

সকালের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হলে পর সিগারেট ধরিয়ে মিনিট খানেক ধূম্র উদ্গীরণ করে আজহার বলতে লাগল ঃ

'তখন সবে মাত্র ব্যারিষ্টারী পাস করে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনো পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু-একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশী ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরো বেশী করে চাপল। সেখানে ইয়েটম, মিচেল, উইণ্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু-একজন দাবা-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড় খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারত। একদিন ওরির মধ্যে একজন বলে উঠল, 'একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড় দাবাড়ে, শোনা যায়—তাঁকে কেউ হারাতে পারে না - যাবেন খেলতে তাঁর সাথে?'

আমি তখনি উঠে পড়ে বললাম, 'এখনই যাব, চলুন। কোথায় তিনি?'

সে ভদ্রলোকটি বললেন, 'চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো খেলোয়াড় পেলে তিনি বড় খুশী হবেন। তাঁরও আপনার মতোই দাবাখেলার নেশা। অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!' আমি ইউরোপে অনেকেরই 'ব্লাইণ্ড্ ফোল্ডেড' খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্ল-পঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদা মেঘের তরুণীর বাইচ্-খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাসছে, একবার উঠছে।

ইউকালিপটাস আর দেওদারু তরু ঘেরা একটি রঙিন বাংলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্য মূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে পড়ে বললে, 'বাবা, দেখ কারা এসেছেন।'

খেলাটা শেষ না হতেই মেয়ে উঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উঠে বললেন, 'আরে, বিনয়বাবু যে! এঁরা কারা? এস, বস। এঁদের পরিচয়—'

বিনয়বাবু—যিনি আমায় নিয়ে গেছলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি—এই তুমিই আজহার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড় খেলোয়াড়! ইয়েট্সের সঙ্গে বাজী চটিয়েছ, একি কম কথা! এইত তোমার বয়েস! বড় খুশী হলুম! ওমা শিউলি, একজন মস্ত বড় দাবাড়ে এসেছেন! দেখে যাও! বাঃ, বড় আনন্দে কাটবে তাহলে! এই বয়সেও আমার বড্ডো দাবাখেলার ঝোঁক, কি করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেলছিলুম!' বলেই হো-হো করে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুললেন।

শিউলি নমস্কার করে নীরবে তার বাবার পাশে এসে বসল। তাকে দেখে আমার মনে হ'ল, এ-যেন সত্যই শরতের শিউলি।

গায় গোধূলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়ত একটু বেশীই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরি করতে-করতে হেসে বলে উঠল, 'বাবার বুঝি আর দেরি সইছে না?' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না। বাবা বড্ডো দাবা খেলতে ভালবাসেন। দাবা খেলতে

না পেলেই ওঁর অসুখ হয়।' বলেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার চা খেতে-খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।'

বিনয় হেসে বলল, 'তা, এইবার সমানে সমানে লড়াই! বুঝলে মিস চৌধুরী, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত করে দেন।'

খেলা আরম্ভ হ'ল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল। কেউ-কেউ উপর-চালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরী ওরফে শিউলি তার বাবার যা দু-একটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম—এও এর বাবার মতোই ভাল খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাদের সঙ্গে খেলেছি—তাঁদের অনেকের চেয়েই বড় খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরী। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে জানতাম বড় কেমিষ্ট বলে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভাল দাবা খেলতে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশী বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করে ডিফেন্সিভ্ খেলা খেলতে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারে-বারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভাল খেলতে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র করে দিলাম। বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে-করতে বললেন, 'দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মতো খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কি খেললে! বড় ভাল খেল বাবা তুমি। আমি হারি কিম্বা হারাই, ড্র সহজে হয় না।'

শিউলি হেসে বললে, 'কিন্তু তুমি হারনি কত বৎসর বল ত বাবা?' প্রফেসর চৌধুরী হেসে বললেন, 'না মা, হেরেছি। সে আজ প্রায় পনরো বছর হ'ল, একজন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক—আধুনিক শিক্ষিত নন—আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি।'

আবার খেলা আরম্ভ হতেই বিনয় হেসে বলে উঠল, 'এইবার মিস চৌধুরী, খেলুন না মিষ্টার আজহারের সাথে।'

বৃদ্ধ খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ ত! তুই-ই খেল মা, আমি একবার দেখি।'

শিউলি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে খেলতে পারি?' কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেলতে বসল। মাঝে চেস-বোর্ড, একধারে চেয়ারে শিউলি একধারে আমি। তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির করে তুলছিল। আমার দেহে-মনে যেন নেশা ধরে আসছিল। আমি দু-একটা ভুল চাল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নত করে ফেললে। মনে হ'ল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় পড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয়বাবুর দল হেসে বলে উঠলেন, 'এইবার মিষ্টার আজহার মাত্ হবেন।' মনে হ'ল, এ হাসিতে বিদ্রূপ লুকানো ছিল।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেলতে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বোড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরীও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল। সে হেরে গেলেও এত ভাল খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম, 'দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান মিস মেনচিকের সাথেও খেলছি, কিন্তু এত বেশী বেগ পেতে হয়নি আমাকে। আমি ত প্রায় হেরেই গেছিলাম।'

দেখলাম, আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি—এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে আবার খেলা হ'ল, এবার ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বললেন, 'হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেলতে হলে অন্ততঃ আট চাল ভেবে খেলতে হয়।'

কথা হ'ল এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় দাবার আড্ডা বসবে। উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিষ্টার আজহারের নিশ্চয়ই বড্ডো কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না।'

আমি ততক্ষণে বসে পড়ে বললাম, বাঃ, এ খবর ত জানতাম না!'

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে বলে উঠল, 'এই শিখছি কিছুদিন থেকে, এখনো ভাল গাইতে জানিনে।'

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিকল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক—আমার মনে হতে লাগল—এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা—তারই বেদনা নিবেদন।

এক-একজনের কণ্ঠ আছে—যা শুনে এ কণ্ঠ ভাল কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ করে দেয়। সে কণ্ঠ এমন দরদে-ভরা এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভাল-মন্দ বিচারের বহু উর্ধ্বে সে কণ্ঠ, কোনো কর্তব্য নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এর প্রশংসাবাণী উথলে ওঠে মুখে নয়—চোখে।

এ সেই কণ্ঠ। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বলতে গেলাম 'অপূর্ব'!' গলায় স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল—আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না।

সেদিন আমায় নিয়ে কে কি ভেবেছিল—তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি আজও ভাবি না। ভাবি—শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এমনি করেই গাইত। গলায় তার এমনি দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ।

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরী ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয়—গলার ও-কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে—এও যেন তেমনি।

গানের শেষে বলে উঠলাম, 'আপনি যদি ঠুংরী শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন। কী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর!'

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম করে বলে উঠল, 'না-না, আমার গলা

একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। গান না একটা গান।'

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। ভাবলাম, 'না' বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে। বললাম, 'আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র। আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।' প্রফেসর চৌধুরী খুশী হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা-হা-হা! বলতে হয় আগে থেকে। তা হলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখ ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।' আমি বললাম, 'আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।' গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরী ত ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কাল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয়বাবুর দলও ওস্তাদী গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দু-চারখানা খেয়াল ও টপ্‌পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরীর সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরীই গাইলাম বেশী।

গানের শেষে দেখি, আমাদের পিছন দিকে আরো কয়েকটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় করে দিল—'ইনি আমার মা—ইনি মামীমা—এরা আমার ছোট বোন।'

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হ'ল চোখে এক কণা বালি পড়তেই যদি চোখ এতো জ্বালা করে—চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

৩

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তা-খানেকের পরেই আমাকে হোটেল

ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ি থাকতে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মতো বয়ে যেতে লাগলো। কাজের মধ্যে দাবা খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবাখেলা ত আছেই—তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠলো আমার পক্ষে সবচেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হ'ল, আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হ'ল না—হবেও না এ জীবনে কোনোদিন—কিন্তু কণ্ঠবদল হয়ে গেল। আর মনের কথা—সে শুধু মনই জানে। অজিত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কণ্ঠবদল না কণ্ঠিবদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ির প্রেম? ছোঃ!'

আজহার কিছু না বলে আবার সিগার ধরিয়ে বলে যেতে লাগল, 'একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল,—

'এখন আমার সময় হ'ল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো!'

গান শুনতে-শুনতে মনে হ'ল—আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এল। আশাবরী সুরের কোমল-গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়েছিল। আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠং করে কিসের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটি কর-পল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিণীর মতো আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কালই যাচ্ছেন?'

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে

হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে বললাম, 'হ্যাঁ ভাই!' আরো যেন কি বলতে চাইলাম। কিন্তু কি বলতে চাই ভুলে গেলাম।
শিউলি, শিউলিফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বললে, 'আবার কবে আসবেন?'
আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, 'তা ত জানিনে ভাই! হয়ত আসব।'
শিউলি ফুলগুলি রেখে চলে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল, 'ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি, জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না।'
এক মাস ওদের বাড়িতে ছিলাম। কত স্নেহ, কত যত্ন, কত আদর! অবাধ মেলা-মেশা—সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন, কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এসব ছিল না বলেই বুঝি এতদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে করস্পর্শটুকুও লাগেনি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ—একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই—প্রশ্ন নেই, শুধু ও এর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।
কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না। সেও যেন জানে—আমাকে চলে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি—আমাকে যেতেই হবে।
নদীর স্রোতই যেন সত্য—অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নেই—আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা। সে চলে গেলে টেবিলের শিউলিফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হ'ল, এ ফুল পূজারিণীর—প্রিয়ার নয়। ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।
চোখ খুলেই দেখি, নিত্যকার মতোই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বলছে, 'আজ আর গান শেখাবেন না?'

আমি বললাম, 'চল, আজই ত শেষ নয়।'

শিউলি তার হরিণ-চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হ'ল বলে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনীফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া—যত ভালবাসা, তত ভয়। ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝরে পড়বে।

এ যেন পরীর দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে।

এ যেন মায়া-মৃগ—ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে।

গান শেখালাম—বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সবকিছুর গান। বিদায় বেলা ত আসবেই—তবে ওর কথা বলে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক—নির্মেঘ—নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে বললাম, 'আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভাল মানুষ সেজেছে ত। কোনো বেশভূষা নেই।'

বলতেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরী বলে উঠলেন, 'সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে।'

এই একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কি ঝড় উঠছে, বুঝলাম। মনে মনে বললাম, 'তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়। তোমাকে ত ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!'

বৃদ্ধ বুঝি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আমি অতি ক্ষুদ্র, বাবা। পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ। তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হতেই ইচ্ছা করে।'

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'এই যে সন্ধ্যা দেবী।' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রংএর শাড়ি। ওকে লাল শাড়ি পরতে আর কোনোদিন দেখিনি। মনে হ'ল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে

রক্ত-ধারা রংএর শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা—মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া। চোখ যেমন পুড়ে গেল, তেমনি পুরবী বাঁশী বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা গান শিখেছিলাম। আমি বললাম, 'একটা গান গাইব?' শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল, 'গান।'

আমি গাইলাম,—

বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল
সোনার গগন রে!

প্রফেসর চৌধুরী উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বাবাজী, আজ একবার শেষবার দাবা খেলতে হবে।'

চৌধুরী সাহেব উঠে যেতে আমি বললাম, 'আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এমনি আশ্বিন মাস—এমনি সন্ধ্যা আসবে—তখন কি করব বলতে পার?'

শিউলি তার দু-চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'শিউলিফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও!'

আমি নীরবে সায় দিলাম, 'তাই হবে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি করবে?' সে হেসে বললে, 'আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে!' আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল।

রাত্রে দাবা খেলার আড্ডা বসল। প্রফেসর চৌধুরী আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার। আর সেই হারাই আমার গলার হার হয়ে রইল।

সকালে যখন বিদায় নিলাম—তখন তাদের বাংলোর চারপাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে।

আর তার সাথে দেখা হয়নি—হবেও না। একটু হাত বাড়ালেই হয়ত তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল—বড় মৃদু, বড় ভীরু, গলায় পরলে দু'দণ্ডে আঁউরে যায়। তাই শিউলিফুলের আশ্বিন যখন আসে—তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই।